A-PDF PageMaster Demo. Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

কিশোর থ্রিলার

তিন গোয়েন্দা

ভলিউম ১০৩

শামসুদ্দীন নওয়াব

সাতচল্লিশ টাকা

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ২০০৮

রচনা: বিদেশি কাহিনি অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
ভিক্টর নীল

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
e-mail: sebaprok@citechco.net
Website: www.Boi-Mela.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

Volume-103
TIN GOYENDA SERIES
By: Shamsuddin Nawab

মাদক-রহস্য/শামসুদ্দীন নওয়াব : ৭-৮০
গুপ্তধনের নকশা/শামসুদ্দীন নওয়াব : ৮১-১৬৬
ভয়ের মুখোশ/শামসুদ্দীন নওয়াব : ১৬৭-১৮৬

তিন গোয়েন্দার আরও বই:

তি. গো. ভ. ১/১ (তিন গোয়েন্দা, কঙ্কাল দ্বীপ, রূপালী মাকড়সা)	৫৯/-
তি. গো. ভ. ১/২ (ছায়াশ্বাপদ, মমি, রত্নদানো)	৫৯/-
তি. গো. ভ. ২/১ (প্রেতসাধনা, রক্তচক্ষু, সাগর সৈকত)	৫০/-
তি. গো. ভ. ২/২ (জলদস্যুর দ্বীপ-১,২, সবুজ ভূত)	৪৬/-
তি. গো. ভ. ৩/১ (হারানো তিমি, মুক্তোশিকারী, মৃত্যুখনি)	৫৩/-
তি. গো. ভ. ৩/২ (কাকাতুয়া রহস্য, ছুটি, ভূতের হাসি)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ৪/১ (ছিনতাই, ভীষণ অরণ্য ১,২)	৫০/-
তি. গো. ভ. ৪/২ (ড্রাগন, হারানো উপত্যকা, গুহামানব)	৪৮/-
তি. গো. ভ. ৫ (ভীতু সিংহ, মহাকাশের আগন্তুক, ইন্দ্রজাল)	৫৬/-
তি. গো. ভ. ৬ (মহাবিপদ, খেপা শয়তান, রত্নচোর)	৪৬/-
তি. গো. ভ. ৭ (পুরনো শত্রু, বোম্বেটে, ভূতুড়ে সুড়ঙ্গ)	৫৬/-
তি. গো. ভ. ৮ (আবার সম্মেলন, ভয়ালগিরি, কালো জাহাজ)	৫২/-
তি. গো. ভ. ৯ (পোচার, ঘড়ির গোলমাল, কানা বেড়াল)	৫২/-
তি. গো. ভ. ১০ (বাক্সটা প্রয়োজন, খোঁড়া গোয়েন্দা, অথৈ সাগর ১)	৫৪/-
তি. গো. ভ. ১১ (অথৈ সাগর ২, বুদ্ধির ঝিলিক, গোলাপী মুক্তো)	৪৯/-
তি. গো. ভ. ১২ (প্রজাপতির খামার, পাগল সংঘ, ভাঙা ঘোড়া)	৫৪/-
তি. গো. ভ. ১৩ (ঢাকায় তিন গোয়েন্দা, জলকন্যা, বেগুনী জলদস্যু)	৪৮/-
তি. গো. ভ. ১৪ (পায়ের ছাপ, তেপান্তর, সিংহের গর্জন)	৫৪/-
তি. গো. ভ. ১৫ (পুরনো ভূত, জাদুচক্র, গাড়ির জাদুকর)	৫১/-
তি. গো. ভ. ১৬ (প্রাচীন মূর্তি, নিশাচর, দক্ষিণের দ্বীপ)	৫৭/-
তি. গো. ভ. ১৭ (ঈশ্বরের অশ্রু, নকল কিশোর, তিন পিশাচ)	৫০/-
তি. গো. ভ. ১৮ (খাবারে বিষ, ওয়ার্নিং বেল, অবাক কাণ্ড)	৫২/-
তি. গো. ভ. ১৯ (বিমান দুর্ঘটনা, গোরস্তানে আতঙ্ক, রেসের ঘোড়া)	৫৬/-
তি. গো. ভ. ২০ (খুন, স্পেনের জাদুকর, বানরের মুখোশ)	৫০/-
তি. গো. ভ. ২১ (ধূসর মেরু, কালো হাত, মূর্তির হুঙ্কার)	৫০/-
তি. গো. ভ. ২২ (চিতা নিরুদ্দেশ, অভিনয়, আলোর সংকেত)	৪৭/-
তি. গো. ভ. ২৩ (পুরানো কামান, গেল কোথায়, ওকিমুরো কর্পোরেশন)	৪৮/-
তি. গো. ভ. ২৪ (অপারেশন কক্সবাজার, মায়া নেকড়ে, প্রেতাত্মার প্রতিশোধ)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ২৫ (জিনার সেই দ্বীপ, কুকুরখেকো ডাইনী, গুপ্তচর শিকারী)	৪৭/-
তি. গো. ভ. ২৬ (ঝামেলা, বিষাক্ত অর্কিড, সোনার খোঁজে)	৪৯/-
তি. গো. ভ. ২৭ (ঐতিহাসিক দুর্গ, রাতের আঁধারে, তুষার বন্দি)	৪৭/-
তি. গো. ভ. ২৮ (ডাকাতের পিছে, বিপজ্জনক খেলা, ভ্যাম্পায়ারের দ্বীপ)	৫৪/-
তি. গো. ভ. ২৯ (আরেক ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন, মায়াজাল, সৈকতে সাবধান)	৪২/-

ভলিউম-১০৩

তিন গোয়েন্দা

শামসুদ্দীন নওয়াব

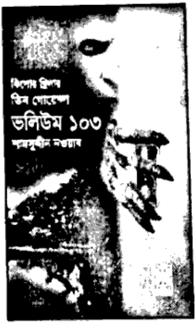

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-1617-3

কাজী শাহনূর হোসেনের লেখা 'মাকড়সার জাল' রহস্য উপন্যাসটিকে 'মাদক-রহস্য' নামে তিন গোয়েন্দায় রূপান্তর করেছেন শামসুদ্দীন নওয়াব।

মাদক-রহস্য

কাহিনি রচনা: কাজী শাহনূর হোসেন

তিন গোয়েন্দায় রূপান্তর: শামসুদ্দীন নওয়াব

প্রথম প্রকাশ: ২০০৮

এক

কফিনের ঢাকনা খোলা। চারদিকে ঘন, কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী।

দুরুদুরু বুকে কাছে এগোল মুসা আমান। দেখতে পেল শুয়ে রয়েছে রক্তপিপাসু কাউন্ট ড্রাকুলা, সাটিনের বালিশে মাথা রেখে। অন্ধকার। খানিকটা সময় লাগল চোখ সইয়ে নিতে। ড্রাকুলার দাঁত দুটো রক্তমাখা। শিউরে উঠল মুসা।

হঠাৎ নড়ে উঠল পিশাচটা।

প্রথমে কাঁপতে দেখা গেল সামান্য। পরক্ষণেই অবিশ্বাস্য দ্রুততার সঙ্গে উঠে বসল। রক্তাক্ত, তীক্ষ্ণ নখরগুলো ধেয়ে এল মুসার গলা লক্ষ্য করে।

'বাপরে!' বলে লাফিয়ে পিছাল ও। তক্ষুণি আবার বালিশে মাথা রাখল ড্রাকুলা। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল মুসা।

কাঁপ ধরে গিয়েছিল ওর শরীরে। এবার রাজনের দিকে ফিরল।

'খাইছে, ভয় খেয়েছিলাম!' ফিসফিসিয়ে বলল ও, 'চলো, পালাই এখান থেকে।'

সায় জানাল রাজন। এক ছুটে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল ওরা চারজন। মামাতো-ফুফাতো ভাই কিশোর আর রাজন। কিশোর বছর দুয়েকের বড়। অবশ্য হাইট দুজনের সমানই।

ঝলমলে রোদ তখন বাইরে। ওদের মাথার ওপরে একটা সাইনবোর্ড। তাতে লেখা: গ্যাসটাউন ওয়্যাক্স মিউজিয়াম...ভিজিট দ্য চেম্বার অভ হররস!!

প্রাণ খুলে হাসল রাজন।

'খুব দেখালে, মুসা,' বলল সে। 'আরেকটু হলে হার্টফেলই করতে।'

'মুসার কী দোষ,' বলল কিশোর। লাল দেখাচ্ছে তার মুখ। 'প্রথমবার

দেখলে যে কেউ ভয় পাবে। তা ছাড়া পিশাচটা সম্পর্কে এমন সব গল্প পড়েছি আমরা!'

'আবার যাই চল্,' তাল তুলল রাজন। 'ভিনগ্রহের একটা প্রাণী রয়েছে। ওটা দেখা হয়নি।'

'বাদ দে,' বলল কিশোর। 'খিদে পেয়েছে খুব। ওই যে মামা-মামী।'

মাঝবয়সী এক দম্পতির দিকে এগোল ওরা। এঁরা রাজনের বাবা-মা। কানাডায় পনেরো বছর ধরে বাস করছেন। কিশোরের মায়ের মামাতো ভাই। তিন গোয়েন্দা ভ্যাঙ্কুভারে এঁর বাসায় বেড়াতে এসেছে।

'চেম্বার অভ হররস সত্যিই দারুণ,' বলল কিশোর। 'বিশেষ করে রাজন যখন মুসার গলা চেপে ধরতে এল।'

হাসলেন মামী, 'তোমাদের জন্যে আরও একটা চমক আছে।'

'সত্যি?' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল রবিন।

মামার চোখ তখন ট্যুরিস্টদের দিকে। ম্যাপল ট্রি স্কয়্যারে ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা, কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে। মামা হাঁটা ধরলেন ওয়াটার স্ট্রিটের দিকে। পিছু নিল অন্যরা।

'কিছুদিন আগেও,' বললেন মামা। আঙুল দেখালেন ইঁটের বাড়িগুলোর দিকে, 'এ জায়গাটার খুব করুণ হাল ছিল। এখন অবশ্য সে অবস্থা আর নেই। উন্নত হয়েছে। আগের স্কিড রোড নাম পাল্টে এখন গ্যাসটাউন রাখা হয়েছে।'

'স্কিড রোড মানে কী, মামা?' জানতে চাইল কিশোর।

'এসব রাস্তা দিয়ে কাঠের গুঁড়ি গড়িয়ে স মিলে নিয়ে যাওয়া হত। সে থেকেই লোকের মুখে মুখে নাম হয়ে গেছে স্কিড রোড। এসব রাস্তার পাশে সস্তার হোটেলও ছিল। ভ্যাঙ্কুভার আর সিটল শহরের ঘিঞ্জি এলাকা স্কিড রোড নামেই পরিচিত হয়ে গিয়েছিল।'

'গ্যাসটাউনকে ঘিঞ্জি এলাকা বলে কার সাধ্য!' বলল কিশোর।

'এখন অবশ্য বোঝার উপায় নেই। তবে ভ্যাঙ্কুভারে কিন্তু এখনও একটা স্কিড রোড আছে। এই দালানগুলোর ঠিক পেছনে।'

'একবার ওখানে যেতে পারলে হত,' বলল কিশোর।

'কোন দরকার নেই,' মাথা নেড়ে বললেন হায়দার সাহেব।

'কেন, মামা?'

'গুণ্ডা বদমাশদের আখড়া।'

'তবে তো আরও মজা!' খুশি হয়ে উঠল কিশোর। 'হয়তো একটা

রহস্য পেয়ে যেতে পারি।'

স্বামীর দিকে চেয়ে হাসলেন মিসেস হায়দার।

'তোমার ভুল হয়ে গেছে। জানো না, গোয়েন্দাগিরির প্রতি কিশোরের কী রকম ঝোঁক?'

'হুঁ, মনে পড়েছে। যাকগে, চলো, ওদের দ্বিতীয় চমকটা দিয়ে দিই। ব্রেডলাইন রেস্টুরেন্টে খাব আমরা।'

'শেষপর্যন্ত পাঁউরুটি?' হতাশ দেখাল কিশোরকে। 'কয়েদীদের খাবার। দূর!' সামান্য থামল ও। এক নজর দেখে নিল স্কিড রোডে যাওয়ার রাস্তাটা। তারপর মামা-মামীর পিছু পিছু ঢুকল রেস্টুরেন্টে। সদ্য তৈরি পাঁউরুটির গন্ধে মৌ মৌ করছে চারদিক। ভেসে এল পিয়ানোর সুর। দেয়াল থেকে ঝুলছে বহু প্রাচীন টোস্টার, পট, প্যান। এমনকী জরাজীর্ণ একটা সেলাই মেশিনও ঝুলতে দেখা গেল।

বেয়ারা ওদের এগিয়ে নিয়ে গিয়ে বসাল কোণের দিকের একটি টেবিলে। ছোট ছোট কাগজ ধরিয়ে দিল সকলের হাতে। মেনু।

'আজব জায়গা!' এতক্ষণ পরে মুখ খুলল রাজন। 'কোথায় এলাম রে, বাবা!'

মেনুতে নজর বোলাল কিশোর।

'আমি চিকেন নুডল সুপ খাব।'

'আমি নেব স্ট্রবেরি শর্টকেক,' ঘোষণা করল মুসা। 'এরপর ওটমিল রেইসিন কুকিস, সসেজ আর ভেজিটেবল রোলস।'

মামা-মামীর দিকে চেয়ে হাসল সোহেল। তাঁরাও হাসছেন। খাওয়ার ব্যাপারে মুসার কোন কার্পণ্য নেই।

অর্ডার দেয়া হয়ে গেলে ধাঁধা জিজ্ঞেস করলেন মামা। 'বল্ তো, শার্লক হোমস কীভাবে বুঝেছিলেন যে ওয়াটসন সাদা গেঞ্জি পরেছেন?'

'জানি না,' মাথা চুলকে বলল কিশোর। 'তুমিই বলে দাও।'

'ওয়াটসন আসলে গেঞ্জির ওপরে শার্ট পরতে ভুলে গিয়েছিলেন।'

হেসে উঠল সবাই। ছুটি কাটাতে রকি বীচ থেকে কানাডায় মামার বাড়িতে এসেছে কিশোর। চমৎকার লাগছে তার। তবে একটা কোন রহস্য পেয়ে গেলে সোনায় সোহাগা হত!

স্কিড রোডে ওঁৎ পাততে হবে।

চিন্তাটা মাথায় আসতেই উত্তেজিত হয়ে উঠল কিশোর। খাওয়ার কথা বেমালুম ভুলে গেল। কিন্তু খানিক বাদে সুপ আর পাঁউরুটি নিয়ে বেয়ারা

হাজির হতেই জিভে জল এল ওর।

'খারাপ হবে না মনে হচ্ছে,' বলল ও। 'কয়েদীরা বোধহয় জেলখানায় সুখেই থাকে।'

মাথা নাড়লেন মামা।

'জেলখানায় কেউ সুখে থাকে না রে,' বললেন তিনি। 'বড্ড একঘেয়ে লাগে ওদের। বড় কষ্টের জীবন।'

এসময় দু'জন লোক রেস্টুরেন্টে ঢুকল।

দরজার দিকে ঘুরে গেছে সবকটা চোখ। পিয়ানো বাদকের সঙ্গে কথা বলছে লোক দুজন। বিজনেস সুট পরা লোকটি জাপানী। অন্য লোকটির পরনেও সুট, তবে কুঁচকানো। বিশাল ভুঁড়িটা বেল্টের ওপর দিয়ে ঝোলায়মান। পাতলা চুলগুলো মাঝখানে আঁচড়েছে।

'লোকটার থুতনিটা কী বিশাল!' বলল কিশোর। 'আমার চারটের সমান।'

কিশোর যখন এসব বলছে তখন সরু হলো ভুঁড়িওয়ালার চোখ। সোজা ওদের দিকে হেঁটে আসতে লাগল সে।

'তোর কথা শুনে ফেলেছে,' ফিসফিসিয়ে বলল রাজন। 'গুলিই করে বসে কিনা কে জানে। ছাই, লুকানোর জায়গাও তো নেই।'

'বোকার মত কথা বলিস না,' ধমক দিতে গিয়ে কেঁপে উঠল কিশোরের গলা। 'সিনেমা পেয়েছিস নাকি?'

ততক্ষণে ভুঁড়িওয়ালা পৌঁছে গেছে ওদের টেবিলে। সে হাত বাড়িয়ে দিল। হ্যান্ডশেক করল মামার সঙ্গে।

'আপনাকে চিনতে ভুল হয়নি, মিস্টার হায়দার,' বলল লোকটি।

'কেমন আছেন, ইন্সপেক্টর?' জিজ্ঞেস করলেন মামা। 'আমার স্ত্রীকে চিনেছেন নিশ্চয়ই? এ হচ্ছে আমার ছেলে রাজন। আর ও আমার ভাগ্নে—কিশোর। আর ওরা কিশোরের বন্ধু, মুসা আর রবিন। রকি বীচ থেকে এসেছে।'

'ইন্সপেক্টর?' দুর্বল কণ্ঠে বলে উঠল রবিন।

'হুঁ। ইন্সপেক্টর বব। ভ্যাঙ্কুভার সিটি পুলিসের ইন্সপেক্টর।'

'আমার ভাগ্নে কিন্তু গোয়েন্দা। শার্লক হোমসও নেংটি ইঁদুর ওর কাছে।' বললেন মামা।

'গোয়েন্দা?' ইন্সপেক্টরের কণ্ঠে বিস্ময়।

'হ্যাঁ,' হেসে জবাব দিলেন মামা। 'মস্ত গোয়েন্দা। ইন্সপেক্টর, আপনার

বন্ধুকে নিয়ে আমাদের এখানে চলে আসুন না।'

'বেশ,' হাতছানি দিয়ে দ্বিতীয় লোকটিকে ডাকলেন ইন্সপেক্টর বব। 'ইনি ক্যাপ্টেন তানিমোটো। ওঁর জাহাজের নাম "এস.আর. গারু"। ওঁর জাহাজ এখন ভ্যাঙ্কুভারে নোঙর করেছে। একটা কেসের ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করছেন উনি।'

ক্যাপ্টেনের মসৃণ মুখটার দিকে চেয়ে হতাশ হয়েছে কিশোর। ও আশা করেছিল নানারকম ট্যাটু, নিদেনপক্ষে কানে একটা মাকড়ি দেখতে পাবে। লোকটি সত্যিই কি ক্যাপ্টেন?

'কোন কেসের তদন্ত করছেন আপনারা?' ইন্সপেক্টরকে প্রশ্ন করে বসল কিশোর।

বিরক্ত মুখটা ওর দিকে ফেরালেন ইন্সপেক্টর।

'বলা যাবে না,' ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিলেন উনি।

কান গরম হয়ে গেল কিশোরের। শুনতে পেল খিলখিল করে হাসছে রাজন।

কিশোরের দিকে চেয়ে মৃদু হাসলেন মামা। সান্ত্বনা দিতে চাইলেন।

'আসলে, ইন্সপেক্টর, পুলিসী কাজের ব্যাপারে কিশোরের খুব আগ্রহ।'

'সরি,' গম্ভীর কণ্ঠে বললেন ইন্সপেক্টর। 'তুমি কিছু মনে কোরো না। এশিয়া থেকে অবৈধভাবে লোকজন ঢুকে পড়ছে কানাডায়। গোলমালটা সেজন্যেই। তবে আরও ব্যাপার আছে—তোমাকে বলার উপায় নেই।'

হাসলেন মামা।

'সত্যি কথাটা বলে ফেলুন, ইন্সপেক্টর। এশিয়া থেকে ফ্রেইটারে করে ড্রাগ আসছে ভ্যাঙ্কুভারে, তারই তদন্ত করছেন আপনি; তাই না?'

দীর্ঘক্ষণ নীরবতা। হায়দার সাহেবের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন ইন্সপেক্টর।

'পুলিসদের কথা আজকাল কেউই বিশ্বাস করে না।'

অপ্রস্তুত দেখাল মামাকে। 'কিছু মনে করবেন না।' বেয়ারাকে ডাকলেন তিনি, সুপ দেয়ার জন্যে। তারপর আবার ফিরলেন ইন্সপেক্টরের দিকে।

'খানিক আগেই আমরা জেলখানার জীবন নিয়ে আলাপ করছিলাম। কিশোর, মুসা, রবিন আর রাজন কি একবার সেলগুলো দেখে আসতে পারে? কৌতূহল মিটত ওদের। সম্ভব?'

আবার দীর্ঘ নীরবতা। রবিনের মনে হলো, ব্রেডলাইন রেস্টুরেন্টে ঢুকে এখন অনুতাপ করছেন ইন্সপেক্টর। কিন্তু ওর ভুল ভাঙল ইন্সপেক্টরের

হাসিতে। বড় বড় দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়ল তাঁর।

'বেশ, আমি তোমাদের ঘুরিয়ে দেখাব।'

'আমি বাবা জেলখানায় যেতে চাই না,' সাফ বলে দিল রাজন।

'ভয় পাচ্ছিস কেন? তোকে তো আর জেলে পুরে দেবে না,' সাহস যোগাতে চাইল কিশোর।

'অতশত জানি না। আমি যাচ্ছি না,' রাজনের এক কথা।

ওকে কেউ চাপাচাপি করল না। ইন্সপেক্টরকে ধন্যবাদ জানাল কিশোর। মন দিতে চাইল সুপের বাটিতে। কিন্তু মন কি এখন বসে ওখানে? মাথায় গিজগিজ করছে রাজ্যের প্রশ্ন। ড্রাগ চোরাচালানের ব্যাপারে আরও জানতে হবে ওকে। কিন্তু কীভাবে? যা হোক, সুপ শেষ করে মামা-মামীর দিকে চাইল ও।

'আমরা চারজন একবার গ্যাসটাউনটা ঘুরে আসি? বেশি দেরি করব না।'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করলেন মামী। তবে সম্মতিও দিলেন পরক্ষণেই। ইন্সপেক্টর ববের সঙ্গে জেলখানা ভ্রমণের সময়সূচী ঠিক করে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ওরা। অনেকক্ষণ বাদে রোদের ছোঁয়াচ লাগল ওদের শরীরে। চনমন করে উঠল ভেতরটা।

'একটা হবি শপ দেখেছিলাম,' বলল রাজন। 'চল্, ঢুঁ মেরে আসি।'

'তারচেয়ে বরং,' পকেট থেকে গ্যাসটাউনের ম্যাপ বার করে বলল কিশোর, 'কটা বদমাশকে জেলে পোরার ব্যবস্থা করি আয়।'

'মরতে?'

'শোন্, ইন্সপেক্টর ড্রাগ স্মাগলারদের জন্যে গ্যাসটাউনে তল্লাশি চালাচ্ছেন। তার আগে যদি আমরাই ওদের খুঁজে বার করতে পারি তবে আমরা হিরো বনে যাব রে!'

মাথা নাড়ল রাজন। 'আমার এখনও মরার বয়স হয়নি।'

'কাপুরুষের মত কথা বলিস না তো,' ধমকাল কিশোর। আঙুল রাখল ম্যাপের বিশেষ একটি স্থানে। 'এ জায়গাটার নাম ব্লাড অ্যালি স্কয়্যার। দারুণ নাম না? নির্ঘাত খুনোখুনি হয় ওখানে।'

দ্বিধা করতে লাগল রাজন। ওর হাত চেপে ধরে হাঁটতে শুরু করল কিশোর। 'আরে ভয় পাচ্ছিস কেন? আমি তো আছি।'

দু বছরের বড় ফুফাতো ভাইয়ের ওপর খুব একটা ভরসা রাখতে পারল না রাজন।

'তোর সবতেই বাড়াবাড়ি,' বিড়বিড় করে বলল ও। 'চল্, ফিরে গিয়ে ক্যান্ডি খাই। আমার কাছে টাকা আছে।'

একটা দরজার দিকে রাজনকে টেনে নিয়ে গেল কিশোর। মুসা আর রবিন ওদেরকে অনুসরণ করল।

ঘোরানো প্যাঁচানো কয়েকটা প্যাসেজ পেরিয়ে একটা খোয়া বিছানো কোর্টইয়ার্ডে পৌঁছল ওরা। অনেকগুলো ম্যাপল ট্রি রয়েছে এখানে।

'দূর, এখানে রহস্য টহস্য নেই,' হতাশ কণ্ঠে বলল কিশোর। 'আয়, ওই বেঞ্চটায় বসি। চোখ কান খোলা রাখবি। কী ঘটে শুধু দেখে যাবি।'

বসে রইল ওরা। বসে বসে ট্যুরিস্টদের দেখছে। হঠাৎ সোজা হয়ে বসল মুসা। আঁকড়ে ধরল রাজনের বাহু।

'দেখো, দেখো!'

'কী?'

'ওই যে ওখানে,' ভ্রূ নাচিয়ে একটা প্যাসেজের দিকে রাজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করল মুসা। মাঝবয়সী এক লোক, মুখে দাড়ি গোঁফের জঙ্গল, চেয়ে রয়েছে আকাশের দিকে।

'আরি, একেই তো খুঁজছি,' বলল কিশোর।

'কেন? একে কেন?'

'দেখছিস না সোজা সূর্যের দিকে চেয়ে রয়েছে? নেশাখোর ছাড়া এ কাজ আর কেউ করবে?'

'তুই ঠিক জানিস?' দ্বিধাভরে জানতে চাইল রাজন।

'একশো ভাগ,' দৃঢ় গলায় বলল কিশোর। জরিপ করছে সতর্ক চোখে। ওর সন্দেহ বদ্ধমূল হতে সময় লাগল না। লোকটা তখন খুব করে চুল-দাড়ি চুলকাচ্ছে।

'ব্যাটার উকুন আছে,' বলল কিশোর। 'দিনরাত পড়ে থাকে ড্রাগের আড্ডায়, উকুন হবে না?'

লোকটা পরনের নোংরা জিন্সের পকেট থেকে তুলো বার করে ছড়িয়ে দিল বাতাসে। দাঁত বার হয়ে পড়ল খুশিতে। মুখ বিকৃত করে দাড়ি চুলকাল আবার। সূর্যের দিকে চেয়ে ঠোঁট চাটছে।

'আস্ত পাগল একটা,' মৃদু গলায় বলল রবিন।

'হুঁ,' সম্মতি দিল রাজন। 'আমার এসব ভাল লাগছে না। আব্বা আম্মা রেস্টুরেন্টে বসে অপেক্ষা করছেন। চল্, ফিরি।' এমন সময় লোকটা উঠে হাঁটতে শুরু করল।

'বলিস কী!' প্রায় আঁতকে উঠল কিশোর। 'এখনই তো মোক্ষম সময়। ওকে ফলো করতে হবে। সোজা স্মাগলারদের ডেরায় চলে যাব ওর পিছু নিয়ে।'

লোকটা তখন সরু একটা গলির ভেতর ঢুকে পড়েছে।

'শিগগির পা চালা,' তাড়া দিল কিশোর। 'ওকে কিছুতেই চোখের আড়াল করা চলবে না।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও কিশোরের সঙ্গ নিল রাজন। দূর প্রান্তে প্রচুর গাড়ি-মোটর সাইকেল। কিন্তু লোকটা নেই।

'জলদি!'

রাস্তার শেষ প্রান্তে ছুটল ওরা। তারপর আচমকাই থমকে দাঁড়াল।

'স্কিড রোড!' বলে উঠল কিশোর। রোমাঞ্চ অনুভব করছে।

বেশ কতগুলো ভাঙাচোরা দালান, ধূলি মলিন দেয়াল চোখে পড়ল ওদের। একটার দরজার ওপরে সাইনবোর্ড টাঙানো: ওয়েস্টার্ন পুল হল অ্যান্ড বিয়ার পার্লার। দ্রুতগতিতে পাশ কাটাচ্ছে গাড়ি আর ট্রাকের সারি।

'ওই দেখ, দেড়েলটা,' বলল কিশোর।

রাস্তার এক পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই লোকটি। কথা বলছে এক মহিলার সঙ্গে। মহিলার পরনে লাল ব্লাউজ, লাল স্কার্ট আর পায়ে হাইহিল। খানিক বাদেই হাওয়া হয়ে গেল দেড়েল। ওরা ফলো করতে যেতেই শুনতে পেল কার যেন গলা: 'এই, ছেলেরা!'

মাথার ওপরের খোলা জানালাটা দিয়ে গলা বাড়িয়েছে এক বৃদ্ধা। ফোকলা দাঁতে হেসে জিজ্ঞেস করল, 'আমার বিড়ালটা দেখেছ?'

মাথা নাড়ল কিশোর। রওনা দিল।

একটা পরিত্যক্ত বাড়ির মেঝেতে ভাঙা বোতল ছড়িয়ে রয়েছে। এসময় একটা লোককে আসতে দেখা গেল ওদের দিকে। কোমরে বেল্টের বদলে চেইন পরেছে।

'সব ব্যাটাকেই আমার ক্রিমিনাল মনে হচ্ছে,' নিচু গলায় জানান দিল রাজন।

দেড়েল লোকটি তখন ট্রাফিক লাইটের জন্যে অপেক্ষা করছে। নোটবই বার করে লোকটির বর্ণনা টুকে নিল কিশোর।

'কেউ যদি দেখে ফেলে তুই নোট নিচ্ছিস, তবে আর জ্যান্ত ফিরতে হবে না,' সাবধান করতে চাইল রাজন।

'ভড়কাস না,' এক কথায় জবাব দিল কিশোর।

'এবার ফিরি চল।'

'পাখি হাঁটতে শুরু করেছে। ফলো হিম!'

দেড়েল দ্রুত হেঁটে হেস্টিংস স্ট্রীটে চলে এল, তারপর পশ্চিমে হাঁটতে লাগল। এক ব্লক পরে অন্ধকার মত একটা প্যাসেজে ঢুকে গায়েব হয়ে গেল খানিক ইতস্তত করল কিশোর, তারপর ঢুকে পড়ল প্যাসেজটিতে। একাই। একটা দরজার সামনে এসে থামল। বন্ধ।

হঠাৎ কোথেকে গর্জে উঠল একটা পুরুষ কণ্ঠ: 'কিছু খুঁজছ?'

চমকে বাঁয়ে তাকাল কিশোর। খোলা জানালা। লাল গোঁফওয়ালা এক লোক খবরের কাগজ পড়ছে। ঠোঁটে চুরুট, চোখে রাজ্যের বিরক্তি।

'উ...' ভাবছে কিশোর, 'আব্বা এখানে দেখা করতে বলেছিলেন।'

চুরুটে লম্বা টান মারল লোকটি। নাক মুখ দিয়ে বার করে দিল ধোঁয়ার কুণ্ডলী। চুরুটটা তাক করে দেখাল রাস্তার দিকে।

'এটা প্রাইভেট ক্লাব,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল। 'ভাগো এখান থেকে।'

'কিন্তু...'

'গেলি?'

'যাচ্ছি।' সময় নিয়ে রাস্তায় ফিরল ও। মুসা, রবিন আর রাজন দাঁড়িয়ে ছিল ওর জন্য।

কিশোর নোট নিল। এবার চারজনে হাঁটা ধরল গ্যাসটাউনের দিকে। মনে মনে একটা ব্যাপার ঠিক করে ফেলেছে কিশোর। স্কিড রোডে আবার হানা দেবে ও।

দুই

দুদিন পর। গাড়ি চালাচ্ছেন ইন্সপেক্টর বব। পাশে বসে রয়েছে কিশোর।

গাড়িটা বহু পুরানো। প্রায় ছ্যাকরাই বলা চলে। সাইডের একটা জানালার কাঁচ ফাটা। স্কচ টেপ দিয়ে জোড়া লাগানো হয়েছে। ভেঙে পড়তে পারে যে কোন মুহূর্তে। বাদামি সীট কভারগুলো ছিঁড়ে গেছে জায়গায় জায়গায়। ধুলো উড়ছে মেঝে থেকে। ইন্সপেক্টরের জন্যে মায়াই হলো কিশোরের। একাই এসেছে ও। অনেক বলে কয়েও আসতে রাজি করাতে পারেনি রাজনকে। মুসা আর রবিনকে নিয়ে সিনেমা দেখতে যাবে ও।

গাড়ি পার্ক করলেন ইন্সপেক্টর। হাই তুললেন, চুলকাচ্ছেন বিশাল ভুঁড়িটা।

'চলো,' বললেন তিনি। বেরিয়ে এলেন গাড়ি থেকে। এগোলেন একটা দালানের দিকে। বাড়িটার বাইরে বেশ কয়েকটা স্কোয়াড কার আর পুলিস মোটর সাইকেল পার্ক করা।

'তোমাকে অ্যারেস্ট করা হলে এখানে আনা হবে,' জলদ-গম্ভীর কণ্ঠে বললেন ইন্সপেক্টর।

'আমাকে অ্যারেস্ট করা হবে কেন?'

কাঁধ ঝাঁকালেন মোটা মানুষটি।

'ভ্যাঙ্কুভারের অনেক ছেলেই আজকাল ঘর পালাচ্ছে। যত্তসব ঝামেলা।' এলিভেটরের দিকে পা বাড়ালেন উনি। কিশোর অনুসরণ করল তাঁকে।

এলিভেটর থেকে মেঝেতে পা রাখতেই বেশ কতকগুলো ধাতব দরজা দেখতে পেল কিশোর। লম্বা একটা করিডরের দু পাশে রয়েছে দরজাগুলো। করিডরে ব্লিচিং পাউডরের গন্ধ। ইউনিফর্ম পরিহিত এক লোক বাঘা সাইজের চাবির গোছা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ইন্সপেক্টরকে দেখে স্যালুট ঠুকল।

'ওকে সব ঘুরিয়ে দেখাও,' আদেশ করলেন ইন্সপেক্টর।

'ইয়েস, সার।'

ইন্সপেক্টর চলে গেলেন তাঁর অফিসে। কফি ঢাললেন কাপে। ওয়ার্ডারকে অনুসরণ করল কিশোর। এসময় কানে এল কে যেন তীক্ষ্ণ কণ্ঠে শিস দিচ্ছে।

'চ্যাপম্যানের কাণ্ড,' মৃদু হেসে বলল ওয়ার্ডার। 'পাগলা গারদে পাঠানো হবে ওকে। নিজেকে ইদানীং কানাডার প্রেসিডেন্ট ভাবছে ও।'

শিসের শব্দ করিডরে প্রতিধ্বনি তুলল আবারও।

'দেখো,' ছোট্ট জানালাওয়ালা একটা ইস্পাতের দরজার দিকে ইঙ্গিত করল ওয়ার্ডার, 'এর নাম লিও।'

কিশোর দেখল এক যুবক ত্রস্তপায়ে পায়চারি করছে। উস্কো খুস্কো চুল। শার্টের বোতাম খুলে রেখেছে। লম্বা মত একটা কাটা দাগ চোখে পড়ল কিশোরের। থমকে দাঁড়িয়েছে যুবক। ক্রুদ্ধ চোখে দেখছে কিশোরকে। পিছিয়ে গেল কিশোর। আবার পায়চারি করতে লাগল লোকটি।

'চোখ তো নয় যেন আগুনের গোলা,' কোনমতে বলল কিশোর।

'লোকটা ভয়ঙ্কর,' ওয়ার্ডার বলল। 'খুনী। তা ছাড়া নেশাও করে।'

কেঁপে উঠল কিশোর। এখান থেকে এ মুহূর্তে বেরিয়ে যেতে মন চাইছে। করিডরের দিকে নজর গেল ওর। পায়ের শব্দ পেয়েছে। এদিকে আসছেন ইন্সপেক্টর বব।

'চাবিগুলো দাও,' ওয়ার্ডারকে বললেন ইন্সপেক্টর। বড়সড় দেখে চাবি বাছাই করে খুলে ফেললেন একটা খালি সেল।

'যাও, ভেতরে গিয়ে দেখোগে কেমন লাগে,' কিশোরকে বললেন তিনি।

ধীরপায়ে সেলে প্রবেশ করল কিশোর। দেয়ালে কয়েদীদের আঁকা হিজিবিজি দাগ দেখছে নিবিষ্টমনে। এসময় হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল লোহার দরজাটা। চাবি মেরে দেয়া হয়েছে। পাঁই করে ঘুরল কিশোর। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখ। দেখতে পেল চলে যাচ্ছেন ইন্সপেক্টর বব।

'শুনুন,' চিৎকার করে ডাকল কিশোর। 'কোথায় যাচ্ছেন? দরজাটা খুলে দিন।'

বৃথাই চেঁচাল ও। ফিরলেন না ইন্সপেক্টর। রীতিমত ঘামতে শুরু করেছে কিশোর। শুকিয়ে এসেছে গলা। দরজা খোলার জন্যে টানাটানি করল ও। তারপর পিছিয়ে গেল আতঙ্কে। ওকে বোকা বানিয়ে ফাঁদে ফেলা হয়েছে। কিন্তু কেন?

কানে এল শিসের তীক্ষ্ণ শব্দ। চ্যাপম্যান। ঘামে ভেজা হাতদুটো কানে চেপে ধরল ও। এখন কী করবে? বেরুনোর পথ খুঁজতে লাগল কিশোর। নেই। কাঁপা পায়ে ইস্পাতের বাঙ্কটার কাছে পৌঁছল ও। বসল ওটাতে। কী করা উচিত ভাবছে।

খানিকবাদে ইন্সপেক্টর ফিরে এলেন। সেলের দরজা খুলে দিলেন তিনি।

'জেলখানায় কেমন লাগল?' চাবির গোছাটা নেড়ে জানতে চাইলেন ইন্সপেক্টর।

তাঁর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল কিশোর। কথা জোগাল না মুখে।

'বাইরে এসো,' বললেন ইন্সপেক্টর। 'রাগ করেছ? আজকের অভিজ্ঞতাটা সারাজীবন কাজে লাগবে তোমার। জেলে ঢোকার মত কাজ তোমার দ্বারা কখনোই হবে না, কী বলো?'

করিডর ধরে হাঁটতে লাগল কিশোর, লোকটাকে অসহ্য লাগছে তার। ইন্সপেক্টর ওকে নিয়ে নিজের অফিস রুমে ঢুকলেন। অল্পবয়সী সুদর্শন এক অফিসার বসে রয়েছেন ওখানে; হাতে কফির কাপ।

অফিসারের দিকে চাইলেন ইন্সপেক্টর।

'ছেলেটাকে খানিকক্ষণ লক আপে রেখেছিলাম। ওর মন ভাল করে দেয়া দরকার। কোক খাওয়ালে কেমন হয়, শার্প?'

'খুব ভাল হয়,' মিষ্টি হেসে বললেন শার্প। কিশোরের পিঠ চাপড়ে দিলেন। ওরা যখন এলিভেটরের দিকে এগোচ্ছে তখন দড়াম করে দরজা বন্ধ করলেন ইন্সপেক্টর বব।

হাসলেন শার্প।

'নাম কী তোমার?'

'কিশোর।'

'রাগ কোরো না, কিশোর। ঘর পালানো ছেলেদের ধরে আনতে হয় বলে ইন্সপেক্টর অমন হয়ে গেছেন। তাঁর ধারণা, দুনিয়ায় ভাল ছেলে নেই। তবে উনি কিন্তু লোক খারাপ নন।'

'তাই হবে,' বলল কিশোর। ইন্সপেক্টর অনুরুদ্ধ হয়ে ওকে জেলখানায় আনতে রাজি হয়েছিলেন। ওকে জেলের জুজু দেখানোই কি তাঁর উদ্দেশ্য ছিল? ইন্সপেক্টরের অমন অদ্ভুত আচরণের আর কোন কারণ খুঁজে পেল না কিশোর। অস্বস্তি বোধ করছে সে। বাইরে বেরিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

'কোক চলবে তো?' জানতে চাইলেন শার্প। হাসলেন। 'ইন্সপেক্টর কিন্তু বিল মেটাবেন না, তাঁর সব সময়ই টাকা-পয়সার টানাটানি।'

'কোকের দাম আমিই দেব,' প্রস্তাব দিল কিশোর। মাথা নাড়লেন শার্প। রাজি নন। বড় রাস্তা পেরিয়ে একটা পুরানো বাড়ির সামনে চলে এলেন। দরজায় সাইনবোর্ড: মেম্বারস অ্যান্ড গেস্টস ওনলি।

ভেতরটা অন্ধকার, ঠাণ্ডা মত। টেবিলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে রয়েছে লোকজন। দেয়ালে ছবি টাঙানো। ছোট একটা বারও রয়েছে।

'এটা পুলিস ক্লাব,' বললেন শার্প। 'ডিউটি না থাকলে এখানে এসে আড্ডা দেয় অফিসাররা।'

দুটো কোকের অর্ডার দিতে গেলেন তিনি।

কোণের টেবিলে একাকী বসে রয়েছে একজন। কিশোরের দিকে চেয়ে হাসল। হাতের ইশারায় টেবিলের খালি চেয়ারগুলো দেখাল। লোকটার চুল-দাড়ি সোনালী, কিশোর এগোতেই উঠে দাঁড়াল। বাড়িয়ে দিল বড়সড় একটা হাত।

'আমি ইয়ান রাশ,' বলল সে। চাপ দিল কিশোরের ডান হাতে।

পরিচয় দিয়ে বসে পড়ল কিশোর। হাতে ব্যথা পেলেও লোকটিকে

পছন্দ হয়ে গেল ওর। জিন্সের প্যান্টে চমৎকার মানিয়েছে লোকটিকে। শার্টের বোতামগুলো খোলা, গলায় রূপোর একটা লকেট ঝুলছে।

দুটো কোক নিয়ে ফিরলেন শার্প।

'কীহে, রাশ,' বললেন তিনি। বসে পড়ে শার্টের হাতা গুটালেন। বেরিয়ে পড়ল নীল ট্যাটু। 'কেমন চলছে?'

'ব্যস্ততা বেড়ে গেছে।'

'রাশ আর আমি মোটর সাইকেল স্কোয়াডে ছিলাম,' কিশোরকে জানালেন শার্প। 'তারপর ওর মাথায় ভূত চাপল—প্রচুর টাকা বানাতে হবে। ছেড়ে দিল পুলিসের চাকরি। নেমে পড়ল ব্যবসায়। অবশ্য সমাজ সেবাও করছে।'

'কী রকম?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'টিন এজারদের নিয়ে আমার কারবার। ড্রাগসেবীদের নেশা ছোটাতে সাহায্য করি।'

'কাজটা সহজ নয়,' যোগ করলেন শার্প।

'শার্প ঠিকই বলেছেন। বিশেষ করে ড্রাগের টাকা জোগাড় করতে গিয়ে ছেলেমেয়েরা যখন বেপরোয়া হয়ে অপরাধ শুরু করে তখন রীতিমত ঝামেলায় পড়ে যাই।'

গম্ভীর দেখাচ্ছে শার্পের মুখ। কঠিন হয়ে উঠেছে পেশীগুলো।

'নেশাখোরেরা টাকার জন্যে মানুষ খুন করতেও দ্বিধা করে না।'

'বলেন কী?' আঁতকে উঠল কিশোর।

মাথা ঝাঁকালেন শার্প।

'হ্যাঁ, আজ সকালেই একজন পুলিস এজেন্টের লাশ পেয়েছি আমরা। তিন নম্বর জেটিতে ভাসছিল। খুব সম্ভব, কোন ক্লু পেয়েছিল সে। ড্রাগ ব্যবসায়ীদের কাউকে হয়তো চিনেও ফেলেছিল। সেজন্যেই খুন হয়ে গেছে।'

রাশ চাইল শার্পের দিকে, 'কোন এজেন্ট?'

'নতুন লোক। স্কিড রোডে গোপন তল্লাশি চালাচ্ছিল। জন বার্নস নাম।'

'আশ্চর্য!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল রাশ। 'গত সপ্তাহে এখানে বসে কথা বলেছি আমরা। ওর তদন্ত সম্পর্কে আলাপ করেছি। আর এরমধ্যেই মারা গেল?'

'হ্যাঁ,' দীর্ঘশ্বাস পড়ল শার্পের।

'হয়তো লিও খুন করেছে তাকে,' বলল কিশোর।

'জেলখানার ওই লোকটা?' মাথা নাড়লেন শার্প। 'উঁহুঁ। দু মাস ধরে জেলে রয়েছে ও।'

কিশোরের দিকে চাইল রাশ। 'জেলখানাটা ঘুরে এসেছ নাকি?'

'হ্যাঁ, ইন্সপেক্টর বব নিয়ে গিয়েছিলেন।'

'তবে তো বলতে হবে তোমার কপাল ভাল,' বলল রাশ। 'ছাড়া পেয়ে বেরিয়ে আসতে পেরেছ।'

'তবু মজাটা টের পাইয়ে ছেড়েছেন,' বলল কিশোর। ওর কথা শুনে হেসে ফেললেন শার্প। রাশকে জানালেন কিশোরের জেলখানা-অ্যাডভেঞ্চারের কথা। হাসল রাশও। খুশি হয়ে উঠল কিশোর। কেটে গেছে তার অস্বস্তি। এদের সঙ্গে বসে পুলিসী তৎপরতার কথা শুনতে চমৎকার লাগছে।

'টহল দিতে কেমন লাগে আপনার?' শার্পকে প্রশ্ন করল কিশোর। মোটর সাইকেল নিয়ে সারা শহর চষে বেড়ান শার্প।

'ভালই লাগে,' জবাব দিলেন শার্প। 'তবে ধরা পড়লে অনেক গাড়ির মালিকই খুব খেপে যান, অপমানিত বোধ করেন। তাঁদের বোঝানোটাও অনেক ক্ষেত্রে বিরক্তিকর।'

'অনেকের স্ক্রু ঢিলেও থাকে আবার,' বলল রাশ। 'একবার এক লোকের সঙ্গে গোলাগুলি পর্যন্ত করতে হয়েছিল। অল্পের জন্যে প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলাম।'

'হাসির ঘটনাও ঘটে,' বললেন শার্প। 'গত সপ্তাহে বাস ডিপোতে ডাক পড়েছিল আমার। গিয়ে দেখি এক লোক খালি গায়ে দাঁড়ানো, পরনে কেবল আন্ডারওয়্যার। ছিনতাইকারীরা সব নিয়ে ছেড়ে দিয়েছে।'

কোকের ক্যানে চুমুক দিল কিশোর। 'আমাদের দেশেও অহরহ এরকম ঘটছে।'

'কোথায় তোমাদের দেশ?' কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইল রাশ। শার্পও চেয়ে রয়েছেন উৎসুক দৃষ্টিতে।

'বাংলাদেশ। এখন অবশ্য আমরা রকি বীচে থাকি।'

'বাংলাদেশটা কোথায়?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন শার্প।

কিশোর মুখ খোলার আগেই জবাব দিল রাশ। 'এশিয়ায়। ইন্ডিয়ার পাশে। একাত্তর সালে মুক্তিযুদ্ধ করেছ তোমরা, তাই না?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিতে গিয়ে গর্বে বুকটা ফুলে উঠল কিশোরের।

প্রশংসার দৃষ্টিতে ওর দিকে চাইলেন শার্প। 'তোমাকে মোটর সাইকেলে চাপিয়ে ঘোরাতে পারলে ভাল লাগত। কিন্তু কী করব বলো–নিয়ম নেই যে,' তারপর ফিরলেন রাশের দিকে। 'তোমারটা এনেছ?'

'হুঁ,' বলল রাশ। কিশোরের দিকে চেয়ে চোখ টিপল। পকেট থেকে চুরুট বার করে ধরাল।

'এটা খেয়েই বেরোব, কী বলো?'

'দারুণ হবে!' চোখ চকচক করছে কিশোরের। ভুলে গেছে জেলখানায় হেনস্তা হওয়ার কথা।

কোক শেষ করলেন শার্প। বরফের ছোট হয়ে আসা টুকরোগুলো দাঁতে পিষলেন।

'একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখবে?'

ঝুঁকে এল কিশোর। পকেট থেকে ইস্পাতের একটা গোলমত জিনিস বার করলেন শার্প। ধারাল দাঁত আছে ওটার। খাঁজকাটা।

'দেখতে তারার মত,' বলল কিশোর। 'কী করে এটা দিয়ে?'

'খুন,' ছোট্ট উত্তর দিলেন শার্প। 'এশিয়ান অস্ত্র। শারিকেন বলে একে। কব্জির মোচড়ে ছুঁড়ে দেয়া হয়। ভয়ঙ্কর!'

অস্ত্রটা মনোযোগ দিয়ে দেখল কিশোর। এ জিনিস কোথায় পেলেন শার্প? প্রশ্নটা চেপে রাখতে পারল না ও।

'ইনভেস্টিগেট করতে গিয়ে পেয়েছি,' বললেন শার্প, 'ভাল কথা, আমার ফেরার সময় হলো। ডিউটি আছে। আবার হয়তো দেখা হবে, কিশোর।'

'কবে?'

'তা তো ঠিক বলতে পারছি না,' বললেন শার্প। ম্যাচের বাক্স ছিঁড়ে ভেতর দিকে একটা ফোন নম্বর লিখলেন। 'আমার নম্বর। ফোন কোরো।'

'থ্যাংকস,' উজ্জ্বল হাসল কিশোর।

শার্প বেরিয়ে গেলে হেলমেট তুলে নিল রাশ। পেছনের লেনে চলে এল ওরা। প্রকাণ্ড একটা হার্লে ডেভিডসন পার্ক করা রয়েছে।

রূপালী ফ্রেমের সানগ্লাস চোখে চড়াল রাশ। ওটার লেন্স দুটোয় ফুটে উঠল কিশোরের উত্তেজিত মুখের ছবি।

'একটা বাড়তি হেলমেট এখানে রাখি আমি,' বলল রাশ। স্যাডল ব্যাগ খুলল। 'তোমাকে সুন্দর ফিট করবে।'

হেলমেটটায় চামড়া আর ঘামের গন্ধ। ওটা মাথায় বসিয়ে স্ট্র্যাপ এঁটে

দিল কিশোর, ফুর্তি ধরছে না তার। রাশের পেছনে চাপল ও।

গর্জে উঠল ইঞ্জিন। সবেগে ছুটল রাস্তা ধরে। ছিটকে সরে গেল এক লোক। পায়রাগুলো খাওয়া ছেড়ে ঝটপট উড়ল আকাশে।

ওয়াটার স্ট্রিটের দিকে যাচ্ছে ওরা। বাঁয়ে ঘুরল রাশ। রাস্তার সঙ্গে প্রায় মিশে গেল মোটর সাইকেল। শক্ত করে রাশকে আঁকড়ে ধরেছে কিশোর।

মোড় ঘুরে ওর দিকে মুখ ফেরাল রাশ, 'কেমন?' জানতে চাইল চিৎকার করে।

'দারুণ!' পাল্টা চেঁচাল কিশোর। নাকে মুখে বাতাসের প্রচণ্ড ঝাপটা লাগছে।

দ্রুত গতিতে অন্যদের পেছনে ফেলল রাশ। ওরা বড় রাস্তায় ফিরে এল আবার। সামনেই পুলিস স্টেশন। এসময় লাল বাতি জ্বলে উঠল।

'চল, আমরা ডকের দিকে ছুটি,' বলল রাশ।

হেসে সায় জানাল কিশোর। ইঞ্জিনের গর্জন বাড়ছে আবার। ওরা ছুটে চলেছে ডকের দিকে।

সামুদ্রিক বাতাসের নোনা গন্ধ নাকে এসে লাগছে। কাছেই বন্দর। নীল পানিতে ঝলমল করছে সূর্যের লাল। আকাশে উড়ছে সিগালের দল। সত্যিই সুন্দর! ইঞ্জিন বন্ধ করল রাশ। কানে আসছে পাখিদের কিচিরমিচির।

'সুন্দর না?' জিজ্ঞেস করল রাশ।

'খুব!' বলল কিশোর। কক্সবাজারের সমুদ্র সৈকতের কথা মনে পড়ে গেছে ওর। তিন বছর আগে বাসার সবাই মিলে গিয়েছিল একবার। ট্রেনে চেপে। স্মৃতি দোলা দিয়ে যায়। মনে আছে ট্রেন তখন পুরোদমে ছুটছে। আর কিশোর প্রাণভরে দেখছে দুপাশে ধানের খেত, মাঠ, নদী, খালবিল—সত্যিকারের বাংলাদেশ। অপূর্ব! বৃষ্টি হচ্ছিল সেদিন। দীর্ঘশ্বাস ফেলল কিশোর। এবার রকি বীচে ফিরে গিয়ে রাশেদ চাচাকে বলতে হবে দেশে বেড়াতে যাওয়ার কথা।

উত্তর ভ্যাঙ্কুভারের দিকে চোখ গেল কিশোরের। বাড়িগুলোকে দূর থেকে পাহাড়ের সারির মত দেখাচ্ছে। একটা সি প্লেন শোঁ করে নেমে এল নীচে, পানিতে।

'তিন নম্বর জেটিটা কোথায়?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'এদিকে,' সামনের দিকে আঙুল দেখাল রাশ। 'কেন?'

'এমনি,' লজ্জা লাগছে কিশোরের। সত্যি কথাটা বলতে চাইল না। আসলে, সেই পুলিস এজেন্টের মৃত্যুরহস্যের ক্লু খুঁজতে চায় ও।

ইঞ্জিন স্টার্ট দিল রাশ। কিশোর চেপে বসতেই ছুটল তীরবেগে। বড় রাস্তায় পৌঁছে পেট্রল পাম্পে ঢুকল মোটর সাইকেল। তেলের ট্যাঙ্কের ঢাকনা খুলল রাশ। নেমে পড়ে হাত পা টানটান করে নিল কিশোর।

'অনেক ধন্যবাদ,' বলল ও, 'আমি হেঁটে ফিরতে পারব।'

'আবার দেখা হতেও পারে,' মৃদু হেসে বলল রাশ।

'দেখা হলে মোটর সাইকেলে ঘোরাবেন?'

'ঘোরাব। শার্পের ফোন নম্বরের কাগজটা দাও।'

পকেট থেকে ম্যাচের ছেঁড়া বাক্সটা বার করল কিশোর। ওতে নিজের নম্বরটা লিখে দিল রাশ।

'কোথায় থাকেন আপনি?'

'হাউস বোটে, বে শোর ইন-এর কাছে।'

'ইস্, দেখতে পারলে দারুণ হত।'

শব্দ করে হাসল রাশ। 'দেখার মত তেমন কিছুই না। ছোট্ট একটা শ্যাক। ফোন করে চলে এসো একদিন।'

'থ্যাঙ্কস,' বলল কিশোর। তেল ভরা হয়ে গেছে। চলে যাবে রাশ। দাঁড়িয়ে রইল কিশোর। মন খারাপ করছে। সময়টুকু ফুরিয়ে গেল বড্ড দ্রুত। এসময় পেট্রল পাম্পের ওয়াশরুম থেকে বেরিয়ে এল এক টিন এজ তরুণী। ওদের দিকেই আসছে। কিশোরের বাহুতে চাপ দিল রাশ।

'আমার এক মক্কেল,' নিচু স্বরে বলল। 'তুমি বরং যাও, কিশোর।'

'ঠিক আছে।' মেয়েটির দিকে চাইল কিশোর। মলিন মুখটার দু পাশে ছড়িয়ে রয়েছে রুক্ষ চুলগুলো। দুঃখী দুঃখী চেহারা। আঙুলের ফাঁকে সিগারেট গোঁজা। টলমল পায়ে রাশের মোটর সাইকেলের দিকে হাঁটছে। এদের নিয়েই রাশের কারবার। 'কঠিন কাজ,' আপন মনেই বলল কিশোর।

বিদায় নিয়ে পুলিস স্টেশনের দিকে পা বাড়াল কিশোর। মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে মৃত পুলিস এজেন্টটির কথা। তিন নম্বর জেটিটা খুঁজে দেখতে হবে ভালমত। হয়তো এমন কিছু পাওয়া যেতেও পারে, খুন-রহস্যের কিনারা করতে যা কাজে দেবে। আর খুনের সঙ্গেই জড়িয়ে রয়েছে অবৈধ ড্রাগ ব্যবসা। এক ঢিলে দুই পাখি মারার সুযোগ! ঝুঁকি নিতে হবে কিশোরকে। নেবে ও।

তিন

রবিবার স্ট্যানলি পার্কে বেড়াতে গেল কিশোররা। মুসা আর রবিন টিভিতে রেসলিং দেখবে বলে আসেনি। পার্কের চারপাশে দেয়াল। ওপাশে সমুদ্র।

বিরক্ত বোধ করছে রাজন। হাঁটতে ভাল লাগছে না তার।

'মনে হচ্ছে বহুদিন ধরে হাঁটছি,' কপালের ঘাম মুছে বলল রাজন। 'পা ব্যথা হয়ে গেছে।'

হাসলেন মামী। 'বেশি হাঁটলে বেশি খিদে পাবে। খেতেও পারবি বেশি।'

খাওয়ার কথা শুনে উৎসাহ ফিরে পেল রাজন। চাইল ওভার ব্রিজটার দিকে। ওদের মাথার ওপর দিয়ে লম্বালম্বি চলে গেছে।

'ব্রিজের ওপর ওটা কী? রেস্টুরেন্ট নাকি?' জানতে চাইল রাজন।

'না,' বললেন মামী, 'ওটা লুক আউট বুদ। জাহাজগুলোকে বন্দরে আসতে যেতে সাহায্য করার জন্যে।'

বাঁক ঘুরে ছোট একটা লাইটহাউজের কাছে চলে এল ওরা। দেয়ালের পাশে একটা রিপেয়ার ট্রাক। 'ট্র্যান্সপোর্ট কানাডা'র ছাপ রয়েছে। বেশ কজন লোককে লাঞ্চ খেতে দেখল কিশোর। অবাক ব্যাপার, ইন্সপেক্টর ববও রয়েছেন তাদের সঙ্গে।

মামাও কম আশ্চর্য হননি।

'হ্যাল্লো, ইন্সপেক্টর!' ডাকলেন তিনি। 'এখানে যে?'

'হাঁটছিলাম,' বললেন ইন্সপেক্টর। 'এই এদের দেখে গল্প করতে বসে পড়েছি।'

ট্রাকের এক লোক হাসল।

'গল্প না বলে জেরা বলাই ভাল,' বলল সে।

হেসে ফেললেন মামা।

'রবিবার কাজ করছেন কেন?'

লাইটহাউজের দিকে ভ্রূ তুলল লোকটি। 'ফগহর্ন নষ্ট। তাই জরুরী তলব পড়েছে। কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে, কোথায় যে গোলমাল সেটাই বুঝছি না।'

'ও,' বললেন মামা। 'আচ্ছা আসি।'

হাঁটতে শুরু করল ওরা। কিশোর লক্ষ করল, ইন্সপেক্টর এবং অন্যান্য লোকগুলো ওরা দূরে চলে না যাওয়া পর্যন্ত একদম চুপ। তারপর আবার কথাবার্তা বলতে লাগল। লায়ন্স গেট ব্রিজের দিকে চাইল ও।

'মামা, ওখান থেকে ডাইভ দেয়া যাবে?'

'কেন, দিবি নাকি তুই?'

'না, না, আমার কথা বলছি না,' সভয়ে বলে উঠল কিশোর। 'ধরো, কেউ যদি দেয় আরকী।'

'ডাইভ দিতে পারবে,' বললেন মামা। 'তবে পানিতে মাথা লাগলেই মজাটা বুঝবে। পাথরে বাড়ি খেলে যেমন লাগে ঠিক তেমনি লাগবে।'

দাঁত বার করে হাসল রাজন।

'তুই একবার চেষ্টা করে দেখ,' বলল ও। 'পারবি। তুই তো গোয়েন্দা সম্রাট।'

রাজনের দিকে চোখ পাকিয়ে তাকাল কিশোর। ব্রিজটার স্তম্ভগুলো লক্ষ করল।

'কলামের মই বেয়ে যে কেউ উঠে আসতে পারবে ব্রিজে। তাই না, মামা?'

'পারবে হয়তো,' বললেন মামা। 'তবে পড়লে স্পট ডেড।'

'তোমরা আর সাবজেক্ট পেলে না?' বিরক্ত হয়ে বললেন মামী। 'খালি মরার কথা। চলো, চিড়িয়াখানায় যাই, দেরি করলে বানরগুলো দেখতে পাব না।'

'বানর তো রয়েছেই সঙ্গে,' রাজনের দিকে ভ্রূ দেখিয়ে হাসল কিশোর। এসময় ওর নজরে এল বিশাল একটা সাদা জাহাজ। বেরিয়ে আসছে বন্দর ছেড়ে। ব্রিজের দিকে হুইসেল দিল ওটা। তারপর এগিয়ে চলল তরতরিয়ে।

'মোনার্ক অভ ভ্যাঙ্কুভার,' বললেন মামী। 'এইমাত্র তিন নম্বর জেটি ছেড়েছে। নানাইমো যাবে।'

'তিন নম্বর জেটি?' বলল কিশোর। 'ওটা তো...'

'ওটা কী?'

'কিছু না,' মামা-মামীকে ওই জেটিতে তার তদন্তের পরিকল্পনার কথা জানাতে চাইল না সে।

'চিড়িয়াখানাটা কোন দিকে, মামী?' জিজ্ঞেস করল ও।

'লামবারম্যান্স আর্চ পেরোলেই পড়বে ওটা,' বললেন মামী। সিডার

কাঠের তৈরি একটা কাঠামোর দিকে আঙুল দেখালেন। আর্চের কাছে দাঁড়িয়ে জনাকয়েক লোক। পকেটে দু হাত ঢোকানো এক লোকের দিকে চোখ তাদের।

বাদামী একটা কাঠবেড়ালীও দেখতে পেল ওরা। লোকটিকে দেখছে। সতর্ক পায়ে লোকটার দিকে এগোল ওটা, তারপর হঠাৎই গতি বাড়িয়ে উঠে পড়ল লোকটার পা বেয়ে। পকেট থেকে বাদাম কেড়ে নিয়ে ছুটে পালাল।

উৎফুল্ল দর্শকরা হাততালিতে ফেটে পড়ল। বাউ করল লোকটি। কটা বাদাম থাকলে কিশোরও কাঠবেড়ালীটাকে বশ করার চেষ্টা করত একবার। ওর বিশ্বাস, পারত। যা-হোক, মামা-মামীর সঙ্গে পোলার বিয়ার দেখতে চলল ও।

কিশোর আশা করেছিল হিংস্র আচরণ করবে জন্তুগুলো। কিন্তু কীসের কী? রোদে ঘুমিয়ে কাদা ওরা। সবকটার গোলাপী জিভ বেরিয়ে পড়েছে। কয়েকজন দর্শক ডেকে ডুকে ঘুম ভাঙানোর চেষ্টা করল। কাজ হলো না কোন। একটা কেবল পেল্লায় মাথাটা জাগাল, অলস চোখে চাইল চারপাশ। তারপর আবার যে কে সেই। কুম্ভকর্ণের ঘুম।

'এটা ছদ্মবেশী ইন্সপেক্টর বব নয় তো?' হেসে বলল কিশোর। 'ওই লেখাটা পড়লে কিন্তু তাই মনে হয়।' একটা সতর্কীকরণ নোটিশ দেখাল ও। 'পোলার বিয়াররা যে কোন মুহূর্তে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে।'

'তোর রাগ এখনও পড়েনি দেখছি,' বললেন মামা। 'ইন্সপেক্টরের ওপর রেগে বোম হয়ে আছিস।'

পার্স খুললেন মামী। 'এই টাকা দিয়ে স্ন্যাক খেয়ে নিয়ো। ডাইনিং প্যাভিলিয়নে দেখা হবে। আমরা ওখানেই থাকব।'

'ঠিক আছে, মামী,' খুশি মনে বলল কিশোর।

গাছপালার ভেতর দিয়ে রাস্তা গেছে একটা। ওটাই ধরল ওরা।

'কোন জিনিসের চারটে চাকা আর দুটো পাখা আছে বলতে পারিস?' জানতে চাইল কিশোর।

'উঁহুঁ। নতুন মডেলের কোন প্লেন?'

'একটা গারবেজ ট্রাক,' হাসল কিশোর। ডাইনিং প্যাভিলিয়নের পাশে পার্কিং-এর ব্যবস্থা। সেদিকেই দেখাল ও। 'ওই দেখ!'

'কী?' অবাক হয়ে জানতে চাইল রাজন।

কিশোর ইঙ্গিত করল একটা ফোক্সওয়াগন গাড়ির দিকে। খোলা দরজা দিয়ে দুটো পা বেরিয়ে রয়েছে। হঠাৎ নড়ে উঠল পা দুটো, উঠে বসল এক

লোক। চোখ ঘষছে।

সশব্দে হেসে উঠল রাজন।

ডাইনিং প্যাভিলিয়নের দিকে এগোল ওরা। বসে পড়ল পছন্দসই এক টেবিলে। অর্ডার দিল বেয়ারাকে। এর খানিক পরেই রাশের সঙ্গে কজন তরুণ-তরুণীকে ঢুকতে দেখা গেল রেস্টুরেন্টে।

কিশোরকে হাত দেখাল রাশ। খেয়াল করল না রাজন। রাশ সদলবলে বসল কোণের একটা টেবিলে। টিন এজারদের পোশাক নজর কাড়ল কিশোরের। প্রত্যেকের পরনেই নোংরা কাপড় চোপড়। এসময় বেয়ারা দুটো অরেঞ্জ জুস আর বিল রাখল টেবিলে।

বিল মিটিয়ে দিল কিশোর।

স্ট্র দিয়ে জুস টানার সময় একবার ভাবল রাজনকে রাশের কথা জানাবে কিনা। পুলিসদের গোপন ব্যাপার জানানোটা ঠিক হবে না।

'একটা গোপন কথা তোকে জানাতে পারি। কাউকে বলতে পারবি না কিন্তু।' শেষমেশ বলেই ফেলল।

'খুব গোপনীয়?' বাঁকা হাসল রাজন।

'খুব।'

'তবে বলে ফেল,' বলল রাজন। 'কথা দিচ্ছি, কাউকে বলব না।'

'ওই সোনালী চুলওয়ালা লোকটাকে দেখেছিস?'

'কোনটা?'

'আরে, ওই যে অনেকগুলো ছেলে মেয়ের সঙ্গে বসে রয়েছে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ।'

'ওর সঙ্গে ক'দিন আগে পরিচয় হয়েছে আমার,' বলল কিশোর। গলাটাকে যতদূর সম্ভব রহস্যময় করতে চেষ্টা করল। 'আমাকে বলেছে, টিন এজারদের নিয়ে ওর কারবার। আমি জানি, কথাটা মিথ্যে।'

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল রাজন।

'এই তোর গোপন কথা?'

মুখে একটা হাত ঠেকাল কিশোর। 'ও আসলে,' বিড়বিড় করে বলল, 'সাদা পোশাকের পুলিস।'

মুহূর্তের জন্যে উৎসাহ দেখা গেল রাজনের মধ্যে। তারপরই আবার দপ করে নিভে গেল।

'লোকটা যে পুলিস তোকে কে বলল?'

'বলতে হয় নাকি?' পাল্টা প্রশ্ন করল কিশোর। 'বুঝে নিতে হয়। পুলিস'

ক্লাবে দেখা হয়েছে ওর সঙ্গে। পুলিস না হলে ক্লাবে ঢুকতে দিত ওকে?'

'তোকে তো ঢুকতে দিয়েছিল।'

'তা দিয়েছিল,' বলল ও। 'তবে আমি জেনেছি, টাকার জন্যে পুলিসের চাকরি ছেড়েছে ও। বেশি রোজগার করতে চায়। সবাই জানে পুলিসরা অনেক বেশি টাকা বেতন পায়। কাজেই মিথ্যে বলেছে না?'

'খোঁড়া যুক্তি। আর কোন প্রমাণ আছে?' খালি গ্লাসে স্ট্র দিয়ে টান মারল রাজন। বিশ্রী রকমের ঘরঘর শব্দ উঠল। বিরক্ত চোখে ওদের দিকে চাইল সেই বেয়ারাটি। রাজন ইশারায় কিশোরকে দেখাল। 'ও করেছে!'

কনুইয়ের গুঁতো খেতে হলো রাজনকে, মিথ্যে বলার জন্যে। বেয়ারা অন্য দিকে চলে যেতেই আবার যুক্তি প্রমাণ নিয়ে বসল কিশোর।

'লোকটা টিন এজারদের সাহায্য করার ভান করছে। আসল ব্যাপার হচ্ছে, ও ড্রাগ ব্যবসায়ীদের সম্পর্কে খবর জোগাড় করছে। ছেলেমেয়েদের নেশার রাস্তা থেকে ফেরানোটা ওর আসল উদ্দেশ্য নয়।'

কিশোরের কথায় আর আগ্রহ পাচ্ছে না রাজন। ইতি উতি চাইল সে। বেয়ারাটা খানিকটা দূরে রয়েছে। সেই সুযোগে গ্লাসে বার কয়েক জোরে টান মারল ও। লম্বা ঢেঁকুর তুলল। তারপর দরজার দিকে দ্রুত এগোল। হাসছে।

বেয়ারা কিন্তু শুনে ফেলেছে শব্দ। চলে এল ওদের টেবিলের সামনে, ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হানল কিশোরের মুখে। বোকা হাসল কিশোর। বেয়ারাকে খুশি করতে চাইছে। 'সরি, কিছু মনে করবেন না।' পড়িমরি ছুটল বেরনোর দরজার দিকে।

চোখের কোণে লক্ষ করল রাশ হাসছে ওর দিকে চেয়ে। হাসতে পারল না কিশোর। পারবে কীভাবে? বজ্জাত রাজনটা কি সে সুযোগ রেখেছে?

মেজাজটা তিরিক্ষে হয়ে রয়েছে ওর। মেজাজ ভাল করার একটা রাস্তা অবশ্য রয়েছে। ক্লু। কাল সকালেই তিন নম্বর জেটিতে যেতে হবে। রহস্য ছাড়া গোয়েন্দা কিশোর পাশাকে কল্পনাই করতে পারে না ও।

চার

পাথুরে ঢাল বেয়ে পানিতে নেমে এল কিশোর। এখানকার পানিটা কেমন যেন তেলতেলে।

'আরে!' চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। 'বুট!' রাজনকে ডাকল ও। বুটটা পানি থেকে তুলে দেখাল।

'সাব্বাস,' ঢালের ওপর থেকে উৎসাহ জোগাল রাজন।

বুটটা চামড়ার তৈরি। পুরানো।

'কিছু থাকতেও পারে ভেতরে,' বলল কিশোর।

'হয়তো একটা ঠ্যাঙ জুটবে তোর কপালে,' হি হি করে হাসছে রাজন।

জুতোটাকে উল্টাল কিশোর। মনে আশা, এটা হয়তো মৃত পুলিস এজেন্টটির ছিল। কিন্তু ভেতর থেকে কিছু বেরোল না দেখে হতাশ হয়ে ছুঁড়ে মারল সমুদ্রের পানিতে। আঙুলগুলো মুছে উঠে এল ওপরে। চাইল তিন নম্বর জেটির দিকে।

'দূর,' বলল ও, 'এক ঘণ্টা খুঁজেও কোন লাভ হলো না। সব কষ্ট পানিতে গেল।'

'হতাশ হোস না।' সব ক'টা দাঁত বেরিয়ে পড়েছে রাজনের।

বন্দরটা জরিপ করে নিল কিশোর। মৃত পুলিসটির কথা ভুলে যাওয়াই বোধহয় ভাল। তারচেয়ে স্মাগলারদের খোঁজার ব্যাপারে ইন্সপেক্টর ববকে যদি কোন সাহায্য করা যায় তাতে ক্ষতি কী?

'স্মাগলারদের কৌশল ধরে ফেলেছি আমি,' বলল কিশোর। 'আন্ডার ওয়াটার সি স্কুটার ব্যবহার করে ওরা, ফ্রেইটার থেকে তীরে ড্রাগস আনার জন্যে।'

'হতে পারে,' স্বীকার করল রাজন। 'একটা সিনেমা দেখেছিলাম। ওতে ওভাবেই দেখানো হয়েছিল।'

খুশি হয়ে উঠল কিশোর। আরও বেশি করে মাথা খাটাতে লাগল স্কুটারের ব্যাপারে। উপর দিকে চাইতেই দেখতে পেল একটা সি গাল। ঝুপ করে নেমে এল পানিতে। পরক্ষণেই ঠোঁটে মাছ গেঁথে নিয়ে উড়াল দিল। কিশোরের নজর চলে গেল তীর বরাবর। বিশাল একটা হোটেল।

'বে শোর ইন,' আঙুল দেখিয়ে বলল ও। 'আমার এক বন্ধু থাকে ওখানে, হাউজবোটে। যাবি?'

'চল। তবে বেশি দেরি করতে পারবি না। আমার আর ভাল্লাগছে না।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

পকেট থেকে চুইংগাম বার করে রাজনকে দিল একটা, নিজেও মুখে পুরল। সমুদ্রের দিকে মুখ করে দাঁড়ানো একটা অফিস চোখে পড়ল কিশোরের। রাজনকেও দেখাল।

'দুটো পাগল একবার ওই বাড়িটা থেকে ঝাঁপ দিয়েছিল, জানিস?'

'তারপর?'

'মাঝপথে একজন চিৎকার করে আরেকজনকে বলেছিল, "তুই পারলি না, হো, হো। আমি তোর আগে পৌছচ্ছি"।'

'তোর জোকটা চমৎকার। তোর উচিত টিভিতে যাওয়া।'

'সত্যি বলছিস?' কিশোরের খুশি ধরে না। ভুলে গেছে রহস্য–স্মাগলার–সব।

'হুঁ। আমি তবে সুইচটা অফ করে দিতে পারতাম।'

মুখে কুলুপ আঁটল কিশোর। জোকের ধারকাছ দিয়ে গেল না আর। বেরসিক লোককে জোক বলে হবেটা কী? হাউজবোটগুলোর দিকে পা বাড়াল ওরা। কাঠের তৈরি ডকে পৌছে গেল। সমুদ্রের স্রোতের কারণে ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ উঠছে। বিলাসবহুল হাউজবোটগুলো দেখে মুগ্ধ হলো দু'জন।

'ফার্নিচারগুলো দেখেছিস?' বলল কিশোর। 'অনেক দামী। বড়লোকদের জায়গা রে।'

'আমার ধারণা ছিল হাউজবোট খুব বাজে জায়গা।'

'আমারও তো,' গলা মেলাল কিশোর। 'রাশ আমাকে বলেছিল ছোট্ট একটা শ্যাকে থাকে।'

ডকের চারপাশটা দেখে নিল রাজন।

'এখানে কোন শ্যাক নেই। ও অন্য কোথাও থাকে।'

মাথা নাড়ল কিশোর।

'বে শোর ইনের কথা বলেছিল। আমার স্পষ্ট মনে আছে।'

'পাখিটাকে দেখ,' বলল রাজন। হলদে একটা ক্যানারি পাখি। একটা হাউজবোটের জানালার সঙ্গে লড়াই করছে। বাইরে বেরোনোর জন্যে। কাছেই ডকে বসে ওটাকে মন দিয়ে লক্ষ করছে একটা কালো বেড়াল। লেজ নাড়াচ্ছে।

'ইস্, পাখিটাকে যদি সাহায্য করতে পারতাম,' আফসোস করল কিশোর।

'উপায় নেই,' রাজন বলল। 'চল ফিরি। নাকি আরও তদন্ত করবি?'

'তিন নম্বর জেটি হয়ে যাব একবার।'

'তবে বাবা আমি চললাম। বড্ড খিদে পেয়েছে।'

'দাঁড়া না। একসঙ্গেই ফিরব। বেশিক্ষণ লাগবে না।'

কিন্তু রাজনের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছে। সে আর বৃথা সময় নষ্ট করতে রাজি নয়।

'উঁহু, তুই থাক। একা ফিরতে পারবি তো?'

'পারব। তা ছাড়া ম্যাপ তো রয়েছেই। আরেকটু পরে গেলে হত না? তুমি জানো না কী হারাইতেছ।'

'জানি,' বলল রাজন। 'কচু হারাচ্ছি।'

অগত্যা হাল ছেড়ে দিল কিশোর। বাড়ির পথ ধরল রাজন। কিশোর চলল আবার তিন নম্বর জেটিতে। কোথাও সুবিধে হচ্ছে না। রহস্যের নাম-গন্ধও নেই। ওহ্ হো, সেই দেড়েল লোকটার কথা তো ভুলেই গিয়েছিল কিশোর। চুরুটখেকো লোকটা যেখান থেকে বকে তাড়িয়েছিল ওকে, সেই ক্লাবটাতে একবার হানা না দিলেই নয়। রহস্য ওখানে জুটবেই। কিশোর আশাবাদী।

পরদিন। মেঘলা আকাশ। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। বেরিয়ে পড়ল কিশোর। একা। ঠাণ্ডার ভয়ে বাইরে বেরতে সাহস করেনি কেউ। ভিক্টরি স্কয়্যারে চলে এসেছে কিশোর। পার্কের মত জায়গাটা। প্রচুর গাছপালা, ঘাসও আছে। সেই অন্ধকার প্যাসেজটা ভালভাবে দেখা যায় এমন একটা বেঞ্চিতে বসল কিশোর।

আশপাশের বেঞ্চগুলোতে বসে ঢুলছে কেউ কেউ। অনেকে আবার মদও খাচ্ছে। গোপনে। কাগজের ঠোঙার ভেতর লুকানো রয়েছে বোতল। ঘাসে অসংখ্য কবুতর। উড়ে যাচ্ছে, আবার এসে বসছে। ওগুলোর কাছেই শুয়ে এক লোক। সারা শরীর খবরের কাগজ দিয়ে ঢেকেছে। শীত তাড়ানোর জন্যে।

নোট নিতে সাহস হলো না কিশোরের। জায়গাটা সুবিধের নয়। কে কখন কী বলে বসে কে জানে? সব কিছু মুখস্থ করে নেয়ার চেষ্টা করছে ও। এক লোক এগোচ্ছে ওর বেঞ্চটার দিকে। পরনের সুটটা কুঁচকানো। বসতে চাইবে নাকি?

'ঘর পালিয়েছ?' বলল লোকটি। চশমার ময়লা কাঁচের ভেতর দিয়ে পিটপিট করে চাইছে।

'না,' দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিল কিশোর।

বসে পড়ল লোকটি। দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

'বাড়ি ফিরে যাও। বাবা-মা কষ্ট পাচ্ছে। ঘর পালিয়ে সুখ নেই রে,

বাপু।'

'বললাম তো ঘর পালাইনি।'

মাথা নাড়ল লোকটি। বিশ্বাস করেনি ওর কথা। চশমাটা তুলে দিল কপালে। বুজে আসছে চোখ।

হাসল কিশোর। এ মুহূর্তে সে মিশে গেছে স্কিড রোডের আর সবার সঙ্গে। রঙচটা জিন্স পরেছে ও। শার্টটাও পুরানো। জুতোজোড়ার কয়েক জায়গায় ফুটো, চুলে খানিকটা ধুলোও লাগিয়ে নিয়েছে। গোপনে আজ বাড়ি ছেড়েছে ও। মামা-মামী ওর এই বেশভূষা দেখলে সন্দেহ করতেন নির্ঘাত। মুসা, রবিন আর রাজনকেও বলে এসেছে মুখ বন্ধ রাখার জন্যে। কিশোর কোথায় যাচ্ছে মামা-মামীকে জানাবে না ওরা।

কিশোরের হাতে এসে বসেছে একটা প্রমাণ সাইজের মাছি। একবার চাইল ও। তারপর আবার দৃষ্টি দিল অন্ধকার প্যাসেজটার দিকে।

অনেকক্ষণ পেরিয়ে গেছে। অনেকেই বেরিয়েছে প্যাসেজটা থেকে। কিন্তু খোঁজ নেই কেবল সেই দেড়েলটার। অবশ্য অন্য কোন রহস্যময় আগন্তুকের দেখা পেলেও আপত্তি ছিল না কিশোরের। কিন্তু সে গুড়ে বালি! কাকে ফলো করবে ও? ওদিকে ঠাণ্ডা বেড়েই চলেছে। গুটিসুটি মেরে বসে রয়েছে কিশোর। কাঁপছে। ধৈর্য হারাচ্ছে কিশোর। ঠিক করল, এরপর ওখান থেকে যেই বেরোক না কেন তাকেই ফলো করবে।

প্রথমেই বেরল এক কিম্ভূত মহিলা। কদমছাঁট চুল। দেখে মনে হচ্ছে ন্যাড়া। ঢুলুঢুলু চোখে চাইল চারদিক। তারপর পুবে হাঁটা ধরল। হেস্টিংস স্ট্রিটের দিকে।

উঠে পড়ল কিশোরও, পিছু নিয়েছে মহিলার। ক'মিনিট বাদে একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে এসে ঢুকল ও। মহিলা ক্যামেরা দেখছে।

দুজন সেলস ক্লার্ক সরু চোখে লক্ষ করছে মহিলাকে। সাদা পোশাকের পুলিস যেভাবে সন্দেহভাজন অপরাধীকে পর্যবেক্ষণ করে, ঠিক তেমনিভাবে। তবে মহিলা যে সুবিধের নয় সে ব্যাপারে কিশোরও নিশ্চিত। ইতোমধ্যে বেরিয়ে পড়েছে মহিলা। ক্যামেরা দেখাই সার, কেনেনি।

শেষ পর্যন্ত বইয়ের দোকানে এসে ঢুকল সে। একটা কবিতার বই বেছে নিয়ে পড়তে শুরু করল, প্রথম পৃষ্ঠা থেকে। হার্ডি বয়েজদের বই রয়েছে কিনা দেখার জন্যে উদ্গ্রীব হয়ে উঠল কিশোর। কিন্তু অতি কষ্টে ইচ্ছেটাকে দমন করল ও। মহিলা ওর নজর এড়িয়ে সটকে পড়ে যদি?

'না, না!'

চকিতে ঘাড় ফেরাল কিশোর। কাছেই চেঁচামেচি শুরু হয়েছে। দ্রুত এগোল সেদিকে। এক তরুণ পড়ে রয়েছে মেঝেতে। আত্মরক্ষার তাগিদে হাত দুটো সামনে বাড়ানো। কাছেই আরেকজন শক্তসমর্থ তরুণ। বছর বিশেক মত বয়স। এক লোক চেপে ধরে রেখেছে তাকে। অবশ্য রীতিমত কসরৎ করতে হচ্ছে সেজন্যে।

'তোকে খুনই করে ফেলব,' চেঁচাল দ্বিতীয়জন। নেকড়ের মত চোখা চোয়াল ওর। 'শাল্লা দুমুখো সাপ। তোর এত্তবড় সাহস!'

'আমাকে মেরো না,' ছেঁচড়ে সরে যেতে চাইছে প্রথম তরুণ। চোখে স্পষ্ট আতঙ্ক।

হঠাৎ এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে ফেলল নেকড়েমুখো। এক টানে বার করে এনেছে ছোরা। ঝিকিয়ে উঠল তীক্ষ্ণ রূপালী ফলাটা। কিন্তু ওটা ব্যবহার করার আগেই সেই লোকটি আঘাত করল ছেলেটির হাতে। পড়ে গেল ছোরাটা। ঠিক কিশোরের পায়ের কাছে এখন ওটা।

দ্রুত হাতে ছোরাটা তুলে নিয়ে দূরে ছুঁড়ে মারতে গেল কিশোর। ঠিক এসময় দৌড়ে এসে ওর হাত চেপে ধরল কে একজন।

'নড়বে না,' মহিলার কণ্ঠস্বর। 'আমি এই স্টোরের ডিটেকটিভ।'

মহিলার দিকে চাইল কিশোর। কঠিন চোখে চেয়ে রয়েছেন তিনি।

'ছুরিটা দাও,' আদেশ এল।

'আমার না এটা,' ফিসফিস করে বলতে পারল কিশোর। কাঁপা হাতে ছোরাটা মহিলার দিকে বাড়িয়ে দিল।

মহিলা এখনও ধরে রেখেছেন ওর হাত। কাঁধে ঝোলানো ব্যাগটার ভেতর হাত ঢোকালেন তিনি। কালো তারওয়ালা একটা রেডিও মাইক্রোফোন বেরল ওটা থেকে।

'ইমার্জেন্সি,' বললেন মহিলা, 'পুলিস পাঠান।'

মুখ শুকিয়ে গেল কিশোরের। চোখের সামনে ভেসে উঠল ইন্সপেক্টর ববের চেহারা। বিনা দোষে আবার সেলে ঢুকতে হবে নাকি? মহিলার দিকে একবার চাইল ও। পরক্ষণেই প্রচণ্ড লাথি মারল তাঁর ডান হাঁটুতে।

'উফ,' বলে মহিলা চেপে ধরলেন হাঁটু। আলগা হয়ে এল মুঠি। প্রাণপণে ছুটল কিশোর। সেই লোকটি ধরতে এল ওকে। কিন্তু নেকড়েমুখো তখন প্রচণ্ড ঘুসি বসিয়েছে তার মুখে। দু পা পিছিয়ে গেছে লোকটি। এক ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে এল কিশোর। হাঁফাচ্ছে। কাঁধে হাতের স্পর্শ পেয়ে চমকে তাকাল। নেকড়েমুখো।

'এই দিকে,' বলল ও।

নির্দ্বিধায় ছেলেটির পিছু নিল কিশোর। একটা গলির ভেতর ঢুকে পড়ল ওরা।

'তোমার উপস্থিত বুদ্ধি আছে,' বলল ছেলেটি। লম্বা শ্বাস টানল। 'ওই মহিলার পায়ে লাথি না মারলে আমার বিপদ ছিল।'

'কিন্তু গোলমালটা কীসের?'

'ওই দুমুখোটাকে হঠাৎ পেয়ে গেলাম দোকানের ভেতর। যাচ্ছিলাম ওখান দিয়েই। শালা শয়তানের হাড্ডি।'

'ওকে খুন করতে নাকি?'

হাসল নেকড়েমুখো।

'মেজাজটা আমার বড্ড গরম। তা তোমার নাম কী?'

'কিশোর পাশা।'

'অদ্ভুত নাম। বিদেশী?'

'হ্যাঁ।'

'আমি স্পাইডার।' ছেলেটি চাইল কিশোরের পরনের পুরানো পোশাকের দিকে। 'ঘর পালিয়েছ? যাহোক, আমার বিরাট উপকার করেছ তুমি।'

ওর কথা কানে ঢুকছে না কিশোরের। মন পড়ে রয়েছে তার ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে। মহিলা বোধহয় এখন পুলিসকে তার কথা জানাচ্ছে।

'আমার ফিরে যাওয়া দরকার,' বলল কিশোর। 'ওদেরকে জানানো উচিত আমি ওতে জড়িত ছিলাম না।'

অট্টহাসি করল স্পাইডার।

'তোমার কথা বিশ্বাস করবে ভেবেছ?'

'করবে কিনা জানি না। তবে করতেও তো পারে।'

'করবে না। ওসব চিন্তা বাদ দাও। কেউ চেনে না তোমাকে। রিপোর্ট করবে পুলিসে, তারপর ভুলে যাবে সব। জানা আছে আমার। তা ছাড়া কেউ আহত হয়নি। ওদের কোন জিনিস খোয়া যায়নি, নষ্টও হয়নি। ওদের অত ঠ্যাকা কী?'

'তা ঠিক।'

কিশোরকে আপাদমস্তক দেখে নিল একবার স্পাইডার। ঠোঁটের কোণে হাসল।

'তোমাকে আমার পছন্দ হয়েছে, কিশোর। তোমাকে কাজে লাগানো যাবে।'

'বুঝলাম না।'

রাস্তাটা প্রায় ফাঁকা। কেবলমাত্র একটি ডেলিভারি ভ্যান থেকে মাল নামাচ্ছে এক লোক। গলা জড়িয়ে ধরে কিশোরকে ভ্যানটার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেল স্পাইডার।

'তোমার টাকা চাই, তাই না?' সতর্ক দৃষ্টিতে ওর দিকে চাইল স্পাইডার। 'আমার হয়ে কাজ করবে?'

ইতস্তত করছে কিশোর। বুঝে পাচ্ছে না স্পাইডারের মতলবটা কী। তা ছাড়া, মাথাও কাজ করছে না পরিষ্কার। স্টোরের ঘটনাটা মন থেকে এখনও তাড়াতে পারেনি ও।

'আমার একজন প্রতিনিধি চাই, কিশোর। প্যাকেট আদান প্রদান করার জন্যে।'

'কীসের প্যাকেট?'

'শান্তির প্যাকেট। স্বপ্নের প্যাকেট।'

'ড্রাগস?'

মাথা ঝাঁকাল স্পাইডার। 'ইন্টারেস্টেড?'

'না,' বলল কিশোর। দেখল স্পাইডারকে। চোখামুখো, কালো চুলের তরুণটিকে ভয়ঙ্কর মনে হলো এ মুহূর্তে।

'ওসব কাজ করিনি কখনও,' বলল কিশোর।

হাসল স্পাইডার। 'শোন, কিশোর,' নরম গলায় বলল সে। 'ঘর পালানো ছেলেদের টাকার দরকার হয়। তোমারও হবে। টাকা পাবে কোথায়?'

'কোন না কোন ভাবে...'

হাত তুলল স্পাইডার।

'আগে আমার কথা শোনো। যদি পছন্দ না হয় তবে যা ভাল মনে হয় করবে। বাধা দেব না আমি।'

'ঠিক আছে।'

'এই তো ভাল ছেলের মত কথা,' বলল স্পাইডার। খুশি। 'চলো, ওপেনহেইমার পার্কে যাই। যা বলার ওখানেই বলব। তুমিও সিদ্ধান্ত নিয়ে নেবে।'

ধকধক করছে কিশোরের বুকের ভেতরটা। ভয় মিশ্রিত কৌতূহল

অনুভব করছে সে। ভ্যাঙ্কুভার ড্রাগ ব্যবসার সঙ্গে সরাসরি জড়িত একজনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেছে তার। এটাকে সৌভাগ্য নাকি দুর্ভাগ্য বলবে ও? সাহস করে স্পাইডারের সঙ্গে থাকতে পারলে তথ্য বার করা যাবে। পুলিসের অনেক উপকার হয়তো হবে তাতে। কিন্তু যদি কোন ভুলচুক হয়ে যায় তবে তার কী হবে? বোকামি হয়ে যাচ্ছে না তো?

পাঁচ

ওপেনহেইমার পার্কে বেসবল খেলছে দু দল ছেলে। ওদের থেকে বেশ খানিকটা দূরে গাছের তলে গিয়ে বসল ওরা দুজন।

'টাকার জন্যে এ ব্যবসায় নেমেছি,' বলল স্পাইডার। 'তবে তোমার সাহায্য পেলে আরও সুবিধে হবে।'

'কী রকম?'

'পরে বুঝবে। অবশ্য তোমাকে এ কাজে ঢোকালে মজা পাবে তুমিও। আমি এখন চারদিকে টুঁ মেরে বেড়াই। বসের কাছ থেকে ড্রাগ নিয়ে বিক্রি করি অন্যদের কাছে। তুমি রাজি হলে কাজটা এখন থেকে তোমাকে দিয়েই করাব। আমিও অবশ্য থাকব তোমার সঙ্গে।'

সামান্য থামল স্পাইডার। ভাবল কী যেন।

'এই ছেলেগুলোকে দেখছ না? বেসবল খেলছে—এদের কাছেই ড্রাগ চালান দেবে তুমি। পরে লোক বাড়াব আরও। পয়সাও বাড়তে থাকবে দ্রুত।'

'খুব রিস্কি কাজ,' বলল কিশোর। 'পুলিস ধরতে পারলে বাপের নাম ভুলিয়ে ছাড়বে।'

উজ্জ্বল হাসল স্পাইডার। সাহসীর হাসি।

'জম্পেশ ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছি আমরা। ধরা পড়িনি কখনও। তোমাকেও শিখিয়ে দেব, ধরা না পড়েও কীভাবে কাজ চালিয়ে যাওয়া যায়। কি, ভয় কাটল?'

জবাব দিল না কিশোর। চোখ তার ছেলেগুলোর দিকে। ব্যাটসম্যান সজোরে বল হাঁকিয়েছে। অনেক দূরে গিয়ে পড়েছে ওটা। কোঁকড়া চুলো একটা ছেলে বল কুড়িয়ে নিয়ে ছুড়ে দিল। তবে রান ঠেকাতে পারল না।

মন খচখচ করছে কিশোরের। এসব ছোট ছোট ছেলেদের কাছে ড্রাগ বেচে এরা?

'এইসব বাচ্চা ছেলেদের কাছে ড্রাগ বিক্রি করব?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'হ্যাঁ,' উত্তেজিত গলায় জবাব দিল স্পাইডার। 'এখানেই কাজ শুরু করতে পারো তুমি। সব সময় ঘুর ঘুর করবে পার্কটার আশপাশে। পরিচিত হবে ছেলেগুলোর সঙ্গে। বিনে পয়সায় ড্রাগ দেবে প্রথম প্রথম। কিছুদিন পর নেশা ধরে গেলে পয়সা চাইতে থাকবে, দেখবে, কেমন সুড়সুড় করে পয়সা বার হয়। একেবারে সোজা!'

'এরা বেশি ছেলেমানুষ!'

'এদের কথা তোমার ভাবতে হবে না,' পাল্টা বলল স্পাইডার। 'ভাল ছেলেরা তোমার ড্রাগ নেবে না। নেবে বখাটেগুলো। ওদের প্রতি কোন সহানুভূতি নেই আমার। নিজেও ড্রাগ নিই না, যারা নেয় তাদেরও দেখতে পারি না দুচোখে। ব্যবসার স্বার্থে কাজ করছি কেবল। মদের দোকানদাররা মদ বেচে না? ঠিক তেমনি আরকী।'

কিশোরের বলতে ইচ্ছে করল, বাচ্চাদের কাছে মদ বিক্রি নিষিদ্ধ। কিন্তু চুপ করে রইল ও। এখন বেশি বকবক করলে স্পাইডার মনে করবে ওর আগ্রহ নেই। কিশোরের এখন একমাত্র কাজ হচ্ছে, তথ্য আদায় করা; যাতে স্পাইডার আর তার বসকে জেলের ভাত খাওয়ানো যায়।

কাষ্ঠ হাসল কিশোর। স্পাইডারের সরু চোখজোড়ার দিকে চেয়ে বলল, 'তো, কবে শুরু করছি?'

দাঁত বেরিয়ে পড়ল স্পাইডারের। 'গুড বয়! ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই বসের সঙ্গে দেখা হবে আমার। পরিকল্পনার কথা জানাব। চলো, তার আগে পেটে কিছু দিয়ে নিই।'

দিলখোলা হাসল স্পাইডার। অচিরেই পকেটে এসে যাচ্ছে বেশ কিছু টাকা, ওরা পার্ক ছাড়তেই বৃষ্টি হয়ে গেল এক পশলা। তবে মেঘ কাটেনি, জমাট বেঁধেছে আরও। বেশ জোরেশোরেই নামার আয়োজন করছে। কেঁপে উঠল কিশোর। স্পাইডারের সঙ্গে দেখা না হলেই বোধহয় ভাল হত।

এ সময় মুষলধারে শুরু হলো বৃষ্টি। ভিজে নেয়ে গেল ওরা দুজন। দেশের কথা মনে পড়ে গেল কিশোরের বর্ষার বৃষ্টি। বৃষ্টির পানি মাথায় করে কত ফুটবল খেলেছে! রকি বীচে চাচা-চাচীকে রেখে এসেছে ও। ওরা কি জানে এমুহূর্তে কীসে জড়িয়ে পড়েছে কিশোর?

রাস্তা ধরে ছুটল ওরা। এক মহিলা খবরের কাগজ মাথায় দিয়ে বৃষ্টি ঠেকানোর চেষ্টা করছে। একটা একতলা বাড়ির বারান্দায় এসে থামল ওরা। বাঁচল বৃষ্টির হাত থেকে।

বাতাসের দিকে পিঠ দিয়ে সিগারেট রোল করল স্পাইডার। রাস্তায় ভিজে যাওয়া মানুষজন দেখতে লাগল কিশোর। ওর মনে হলো, বাড়িতে বসে থাকলেই ভাল হত। আয়েশ করে সবাই মিলে খিচুড়ি খাওয়া যেত। মামীর হাত যা চমৎকার!

এসময় সতেরো-আঠারো বছরের এক তরুণীকে আসতে দেখা গেল ওদের দিকে। কালো চুলগুলো সেঁটে রয়েছে ঘাড়ে-কাঁধে। জল গড়াচ্ছে সর্বাঙ্গ থেকে। কপাল থেকে ঘাম মোছার মত করে পানি তাড়াচ্ছে মেয়েটি। নাক লাল, ঠাণ্ডায়। গাল কালো হয়ে রয়েছে। কাজল গড়িয়েছে চোখ থেকে। কিশোরকে অবাক করে দিয়ে হাসল মেয়েটি।

'হাই!' বারান্দার কাছে এসে বলল। উপরে ওঠেনি।

'হাই!' দ্বিধান্বিত কণ্ঠে বলল কিশোর।

স্পাইডার তখন সিগারেট জ্বালিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। 'কী খবর, ডবল জেড?'

খুশি হয়ে উঠল মেয়েটি।

'ভাল। তুমি কেমন আছ?'

স্পাইডার নিরুত্তর। কিশোরের দিকে চেয়ে বলল, 'এ কিশোর। বিদেশী।'

কিশোরের দিকে তাকাল মেয়েটি। মৃদু হেসে আবার চোখ ফেরাল স্পাইডারের দিকে। স্পাইডারের প্রতি মেয়েটি দুর্বল। ওর চোখ দেখে স্পষ্ট বুঝল কিশোর। অস্বস্তি বোধ করছে ও। সবাই এ মুহূর্তে চুপ করে রয়েছে।

'ভিজছ কেন? বারান্দায় চলে এসো না,' মেয়েটিকে বলল কিশোর।

'আসতে পারি যদি কেউ মাইন্ড না করে,' লাজুক হেসে বলল মেয়েটি। উঠে এসে স্পাইডারের কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল। নামিয়ে রাখল শপিং ব্যাগটা। মেয়েটির ইমিটেশনের কানের দুল দুটোর দিকে চাইল কিশোর। বাদামী একটা কোট ওর গায়ে। আসল চামড়ার নয়। কীভাবে আলাপ জমাবে ভাবছে কিশোর।

মুশকিল আসান করল মেয়েটিই।

'কী জঘন্য দিন!' বলল সে। হাত দিয়ে চুল ঝাড়ল। 'তুমি ভেজোনি তো, স্পাইডার?'

'জ্বী না,' জবাব দিল স্পাইডার। তাকাল পরনের ভেজা গেঞ্জিটার দিকে। 'শখ করে এতক্ষণ গোসল করলাম আর কী।'

মেয়েটার জন্যে দুঃখ হলো কিশোরের। স্পাইডারের বাঁকা কথা অবশ্য গায়ে মাখল না ডবল জেড।

'এ শহরের বৃষ্টিতে এই প্রথম ভিজলাম,' বলল কিশোর। 'আমি এখানে নতুন।'

সিগারেটটা ছুঁড়ে দিল স্পাইডার। পানির ছোট্ট একটা গর্তে গিয়ে পড়ল ওটা।

'একটা বুদ্ধি এসেছে!' ডবল জেডকে বলল স্পাইডার। 'কিশোরকে আমাদের ওখানে নিয়ে গেলে কেমন হয়?'

'চমৎকার,' বলল ডবল জেড। 'চলো যাই।'

'এখন না, তবে পরে দেখা হবে তোমাদের সঙ্গে।'

বৃষ্টিতে বেরিয়ে পড়ল স্পাইডার। হাঁটছে দ্রুত। ও মোড় ঘোরার আগ পর্যন্ত লক্ষ করল ডবল জেড। তারপর ফিরল কিশোরের দিকে।

'বড্ড খিদে পেয়েছে!' মৃদু হেসে বলল কিশোর।

স্পাইডার চলে যাওয়াতে দমে গেছে ডবল জেড। শূন্য তার চোখের দৃষ্টি। হঠাৎ যেন সংবিৎ ফিরে পেল। মাথা ঝাঁকিয়ে কিশোরকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি ওর বন্ধু?'

'বলতে পারো।'

'চায়নাটাউনে আগে কখনও গিয়েছ?'

'না।'

'এসো তবে,' বলল ডবল জেড। বেরিয়ে পড়ল বারান্দা ছেড়ে। বুক ভরে শ্বাস টেনে নিল কিশোর। পিছু নিল মেয়েটির। পরক্ষণেই ঠাণ্ডা পানি কাঁপিয়ে দিল ওর শরীরের সব কটা হাড়। ছাতা মাথায় অনেকে নিশ্চিন্তে হেঁটে যাচ্ছে। ওদেরকে হিংসে হচ্ছে কিশোরের। সে নিজে মুহূর্তে ভিজে দাঁড়কাক হয়ে গেল।

ভাগ্য ভাল, চায়নাটাউন খুব বেশি দূর নয়। পেন্ডার স্ট্রিটে চলে এল ওরা। বিরাট একটা চাঁদোয়ার নীচে এসে দাঁড়িয়েছে। কাঠের ঝুড়িতে সাজানো রয়েছে নানা ধরনের সবজী। প্রদর্শনী চলছে। প্রতিটি সবজীর গায়ে সাঁটানো রয়েছে নাম।

'চায়নাটাউন আমার খুব প্রিয় জায়গা,' মৃদু হেসে বলল ডবল জেড। 'স্পাইডার আসলে কত ভাল হত না?'

'তুমি কি ওর প্রেমিকা?'

লাল হয়ে গেল মেয়েটি। খুশি খুশি দেখাচ্ছে।

'তোমার তাই ধারণা?'

'আমি জানি না ঠিক। এমনি বললাম, আন্দাজে।'

'হলে তো ভালই হত,' এক মুহূর্তের জন্যে বিষণ্ণ মনে হলো ডবল জেডকে। 'তবে হব হয়তো কোনদিন।'

একটা লেটুস বেছে নিয়ে ভেতরে চলে গেল ডবল জেড, বিল মেটাবে। চাঁদোয়ার নীচে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে কিশোর। চোখ তার দোকানদারদের দিকে। বেশিরভাগই চীনেম্যান। ওর দিকে তাকাচ্ছে অনেকেই। হাসছে। নিজেদের ভাষায় বলছে কী যেন। বুঝতে পেরেছে, কিশোর ওদের মহাদেশেরই ছেলে। এশিয়ান। ভাল লাগছে কিশোরের।

'হাই,' কিশোরের পাশে চলে এল ডবল জেড। 'একটা জিনিস দেখবে এসো।'

'কী জিনিস?'

'এসোই না।' একটা স্টোরে ওকে নিয়ে গেল ডবল জেড। লোক গিজগিজ করছে। 'ওই দেখো!'

একগাদা সাপের চামড়া। গোল করে রাখা হয়েছে প্রত্যেকটা। মাথা আর লেজ একসঙ্গে বাঁধা।

'এগুলো দিয়ে কী করে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'জানি না। কোনদিন জানতে চাইনি, যা ভয় করে–'

চামড়াগুলোর কাছে এক লোক দাঁড়ানো। খদ্দেরদের সঙ্গে কথা বলছে।

'এক্সকিউজ মি, সাপের চামড়াগুলো দিয়ে কী হয়?'

'এগুলো রোগ-বালাই থেকে মানুষকে মুক্তি দেয়,' হেসে বলল লোকটি। 'ব্যাঙের চামড়াও একই কাজে লাগে।'

সাপের গাদার পাশে ব্যাঙের চ্যাপ্টা চামড়ার স্তূপ। ওদের হাত-পা চলে গেছে চার কোণে। একটা বুদ্ধি খেলে গেল কিশোরের মাথায়। রাজনের স্কুলের টিফিন বক্সে এমনি একটা ছেড়ে দিলে কেমন হয়? যাহোক, পরক্ষণেই চিন্তাটা দূর করে দিল ও। কেনার পয়সা নেই।

'দারুণ জায়গায় নিয়ে এসেছ!' ডবল জেডকে বলল ও।

'এর পরেরবার স্পাইডারকে নিয়ে এসো,' বলল মেয়েটি। 'ও মজা পাবে।'

দোকান ছাড়ল ওরা। বৃষ্টি এখনও পড়ছে, তবে টিপটিপ করে

কিশোরের দিকে চাইল ডবল জেড।

'স্পাইডারের সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব হলো কীভাবে?'

অস্বস্তি বোধ করল কিশোর। তার জানা নেই, স্পাইডারের ব্যবসায় এই মেয়েটাও জড়িত কিনা। খানিকক্ষণ দ্বিধা করল ও। তারপর সিদ্ধান্ত নিল, সত্যি কথাই বলবে।

'আজই প্রথম পরিচয় ওর সঙ্গে,' বলল কিশোর।

'আমি অবশ্য আগে থেকেই চিনি,' বলল ডবল জেড। 'ভ্যাঙ্কুভারে আসার পর থেকেই।'

'তুমি ঘর ছেড়ে এসেছ?'

'না।'

'কাজকর্ম কিছু করো?'

'একটা জেনিটর কোম্পানিতে আছি। প্রতি রাতে উঁচু বিল্ডিংগুলোতে চলে যাই আমরা, অফিস পরিষ্কার করি। আগে ছিলাম লন্ড্রীতে। ভাল লাগেনি–ছেড়ে দিয়েছি।'

ছোট্ট এক কাফে পেরনোর সময় কিশোরের নজরে এল এক লোক। দাঁড়িয়ে পড়ল ও, লোকটি বাটি থেকে সুপ খাচ্ছে। ব্যবহার করছে দুটো হাতই। বাঁ হাতের চামচ দিয়ে তরল বাদামী সুপ তুলে নিচ্ছে, আর ডান হাতের চপস্টিকগুলো ব্যবহার করছে নুডলস তোলার কাজে। তবে আশ্চর্যের ব্যাপার, একবারও খবরের কাগজটা থেকে চোখ সরাচ্ছে না।

'কী খাচ্ছে অমন করে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'ওয়ান টন সুপ।'

হাসল কিশোর। 'ওরে বাবা, এত ভারি সুপ? লোকটা তো বেজায় পেটুক।'

জোকটা বুঝল না ডবল জেড। পা বাড়াল সামনে। হাঁটতে হাঁটতে কিশোরের চোখ পড়ল মেয়েটির গালে। ফোলা গাল দুটোয় মেকআপ করেছিল, ধুয়ে গেছে বৃষ্টিতে।

'তোমার নাম ডবল জেড কেন? বড় অদ্ভুত নাম!'

'কেন তা জানি না। আমার আসল নাম রেবেকা। কিন্তু স্পাইডার প্রথম থেকেই আমাকে ডবল জেড বলে ডাকে।'

ডবল জেডকে স্পাইডারের ব্যাপারে প্রশ্ন করলে জানা যেতে পারে অনেক কিছু। তবে ঝুঁকিও আছে। ঝুঁকিটা নিল কিশোর।

'স্পাইডারের অনেক রোজগার, তাই না?'

হাসল ডবল জেড।

'জানি না। এটুকু জানি টাকা ছাড়া আর কিছু বোঝে না ও, রাতদিন শুধু টাকার চিন্তা। বিয়ের কথা বলত আগে, এখন আর বলে না। এখন শুধু টাকা, টাকা আর টাকা।'

'কী করে ও?'

ভ্রূ কুঁচকাল ডবল জেড।

'আমাকে বলেছে কী সব যেন আমদানী করে। আমি বিশ্বাস করিনি ওর কথা।'

উত্তেজনা অনুভব করছে কিশোর।

'এশিয়া থেকে আমদানী করে বলেছে?'

'না তো।'

একটা দোকানের জানালার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল কিশোর। জিনিস দেখার ভান করছে। আসলে ভাবছে স্পাইডারের কথা। এশিয়া থেকে ড্রাগ আমদানী করা যদি ওর ব্যবসা হয়ে থাকে তবে পুলিশ ওকেও খুঁজছে। কিন্তু ওর বস্ কে? পালের গোদাটার পরিচয় জানা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

'কার হয়ে কাজ করে ও?' জিজ্ঞেস করল কিশোর। চেষ্টা করছে গলা স্বাভাবিক রাখতে।

শ্রাগ করল ডবল জেড।

'আমাকে এত কিছু বলে না।'

'ও, আচ্ছা।'

ডবল জেড কী সত্যিই জানে না? নাকি এড়াতে চাইছে ওকে? দ্বিতীয়টা ঠিক হলে এখন চুপ করে যাওয়াই ভাল নইলে হয়তো সেই পুলিস এজেন্টের মত তার লাশও পাওয়া যাবে তিন নম্বর জেটিতে।

অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল কিশোর। আবার জানালার দিকে তাকাল।

'কী কুৎসিত জিনিস, দেখেছ?'

'এই চুপ,' সতর্ক করল ডবল জেড, ইতিউতি চাইল। কিশোরের মন্তব্য দোকানের কেউ শুনে ফেলেনি তো? চাইনিজদের ভয় পায় ও।

'চলো অন্যখানে যাই,' তাড়া লাগাল ডবল জেড। 'তোমাকে "চাইনিজ টাইমস" দেখাব।'

পরবর্তী গলিতে কিছু লোককে একটা অফিসের সামনে জটলা করতে দেখা গেল। দেয়ালে খবরের কাগজ সেঁটে দেয়া হয়েছে। পড়ছে লোকগুলো। একটা হেডলাইন দৃষ্টি কেড়ে নিল কিশোরের। কিম্ভূত চাইনিজ

অক্ষরগুলোর মর্মোদ্ধার করার ব্যর্থ চেষ্টা যখন করছে ঠিক তখনই ওর হাত চেপে ধরল ডবল জেড।

'লোকটা পড়ে গেছে!' বলে উঠল মেয়েটি।

ওদের থেকে খানিকটা দূরে চিৎ হয়ে রাস্তায় পড়ে রয়েছে এক বৃদ্ধ। কালো পোশাক পরা, মাথাটা তুলতে প্রাণপণ চেষ্টা করছে, পারছে না। একজন পথচারী তার এ অবস্থা দেখে থমকে দাঁড়াল মুহূর্তের জন্যে, তারপর আবার হাঁটতে লাগল নিজের মত।

'এটা ধরো,' শপিং ব্যাগটা কিশোরের হাতে দিল ডবল জেড। ছুটল বৃদ্ধের কাছে। নিজের কোটটা দিয়ে ঢাকল তার শরীর। লোকটি ডবল জেডের দিকে চেয়ে বলতে চাইল কী যেন। পারল না। দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

জনাকয়েক লোক জুটে গেছে। বৃদ্ধের মুখ থেকে এখন লম্বা সাদা চুলগুলো সরিয়ে দিচ্ছে ডবল জেড। এ সময় সাইরেনের শব্দ কানে এল। দ্রুতগতিতে কোত্থেকে হাজির হয়ে গেল একটা অ্যাম্বুলেন্স। পথচারীদের কেউ একজন হয়তো ফোন করেছে টেলিফোন বুদ থেকে। এক লোক নেমে এল গাড়িটা থেকে। হাঁটু গেড়ে বসল ডবল জেডের পাশে।

'তোমাকে ধন্যবাদ,' বলল অ্যাম্বুলেন্স ম্যান। পরীক্ষা করল বৃদ্ধকে। তারপর স্ট্রেচারে করে গাড়িতে তুলল।

কোটটা আবার গায়ে চাপাল ডবল জেড। হাঁটছে। কানে আসছে অ্যাম্বুলেন্সের শব্দ, ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হচ্ছে।

'ভাগ্যিস তুমি ছিলে,' বলল কিশোর। 'কী করা উচিত বুঝতে পারছিলাম না আমি।'

'মানুষটা সেরে উঠলেই ভাল,' বলল ডবল জেড। মোড় ঘুরল। 'চলে এসেছি প্রায়।'

ডবল জেডের বাড়ি শাংহাই অ্যালিতে। অনেকগুলো প্রাচীন বাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে পাশাপাশি। বাড়িগুলো দেখে গা ছমছম করে উঠল কিশোরের। অদ্ভুত একটা অনুভূতি হচ্ছে ওর।

ছয়

'এখানে থাকো না নিশ্চয়ই?' বলল কিশোর। একটা গুদামঘরের দিকে চোখ ওর। হেলে পড়েছে দেয়ালগুলো।

'না,' হাসল ডবল জেড, 'ওই হোটেলটাতে একটা রুম আছে আমার।'

পুরানো একটা বিল্ডিং, জানালাগুলো সংকীর্ণ। চিমনি রয়েছে।

ভেতরে ঢুকল ওরা। ভীতি অনুভব করছে কিশোর। ওদিকে ভাবান্তর নেই ডবল জেডের। অভ্যস্ত সে। মুহূর্ত পরেই উৎকট একটা গন্ধ নাকে এসে লাগল কিশোরের। নাকে হাত চাপা দিতে বাধ্য হলো ও। বাধ্য ছেলের মত ডবল জেডের পিছু পিছু ওপরে উঠে এল। যদিও সর্বক্ষণই মন চেয়েছে এক ছুটে বেরিয়ে গিয়ে বুক ভরে তাজা বাতাস নিতে।

একটা হলওয়েতে এসে পৌছাল ওরা। দরজার সারি। একটা খোলা দরজা দৃষ্টি কাড়ল কিশোরের। অফিস। ভেতরে অবশ্য দেখা গেল না কাউকেই। তবে ডেস্ক রয়েছে।

ছোট করে শ্বাস টানল কিশোর। ডবল জেডের সঙ্গে চলে এল একটা দরজার সামনে। '৬' লেখা একটা টিন লাগানো রয়েছে দরজায়। এসময় পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল এক মহিলা। পেট চেপে ধরেছে। হলওয়ের দূর কোণে চলে গেল। ওদিকটা আরও বেশি অন্ধকার। বেরনোর রাস্তাও রয়েছে ওখানে।

'মহিলার মনে হলো সাহায্য দরকার,' বলল কিশোর।

'জুলি?' মাথা নাড়ল ডবল জেড। 'ও ভাল অভিনয় জানে। লোকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে অসুস্থতার ভান করে। খানিক বাদেই দেখবে মনের সুখে বিয়ার টানছে।'

ডবল জেডের ঘরে ঢুকল কিশোর। খোলা জানালাগুলো দিয়ে টাটকা বাতাস ঢুকছে। লম্বা শ্বাস টানল কিশোর। অনেকখানি স্বস্তি পাচ্ছে এখন। দরজাটা বন্ধ করে দিল ও। সেজন্যে অবশ্য গায়ের জোর খাটাতে হলো। মেঝেতে আটকে যায় দরজা। এবার ঘরের চারদিকে দৃষ্টি বোলাল ও।

দেয়ালে কতগুলো পোস্টার সাঁটানো, স্কচ টেপ দিয়ে। নায়ক-গায়কদের ছবি। বলাই বাহুল্য, ছবিগুলো ঘরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে পারেনি। বিছানার চাদরটার কয়েক জায়গায় ফুটো। সিগারেটের আগুনে পুড়ে ফুটোগুলো তৈরি হয়েছে। কাঠের একটা চেয়ার রয়েছে। সেটার অবস্থাও করুণ। সিগারেট আর ছাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ওটার ওপর। ছোট্ট টেবিলটার ওপর একটা প্রাচীন আয়না। চেহারাটা একবার দেখে নিল কিশোর। জানালাগুলোয় প্লাস্টিকের পর্দা।

নিজের ঘরটার কথা ভাবল কিশোর। এ ঘরের জীর্ণ হাল সহজে মেনে নিতে পারছে না ও। বেচারী ডবল জেড! মাথার ওপর ভারি পায়ের শব্দ

শোনা গেল। পরক্ষণেই উঁচু ভলিউমে গান বেজে উঠল। হেভি মেটাল। রেডিও ছেড়েছে কেউ।

রান্নাঘরে গিয়েছিল ডবল জেড। একটা প্যাকেট নিয়ে ফিরেছে। জানালার কার্নিসে বিস্কুটের টুকরো ছড়িয়ে দিল ও। মুহূর্ত পরেই ডানার ঝটপটানি। কবুতর। অনেকগুলো। ব্যস্ত হয়ে পড়ল ওরা।

'আমার ওপর ভরসা করে ওরা,' বলল ডবল জেড। 'প্রতিদিনই খাবার দিতে চেষ্টা করি। দিই।'

ডবল জেডের মলিন পোশাকগুলো এক কোণে স্তূপ করা। স্টারদের পোস্টারগুলোর পাশে বড় বেশি বেমানান। মেয়েটির জন্যে দুঃখ হলো কিশোরের।

কাঠের চেয়ারটা পরিষ্কার করে বসল কিশোর। চাইল ডবল জেডের দিকে।

'এখানে থাকো কেন?'

'এটাই তো আমার বাসা।'

'অন্য কোথাও থাকতে পারো না?'

চুপ করে রইল ডবল জেড।

'স্ট্যানলী পার্কের কাছে যে অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংগুলো রয়েছে সেখানে চলে গেলেই তো পারো,' বলল কিশোর।

সশব্দে হাসল ডবল জেড। 'অত টাকা কোথায় পাব, কিশোর?'

জবাব দিতে পারল না কিশোর। এক মনে কবুতরগুলোকে দেখছে। এখনও বিস্কুট খেয়ে শেষ করতে পারেনি ওরা।

'আগে কোথায় থাকতে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'রেডিয়াম হট স্প্রিংস।'

'ওখানে ফিরে যাচ্ছ না কেন? হয়তো একটা ভাল অ্যাপার্টমেন্ট পেয়ে যেতে পারো।'

'যাব না,' দৃঢ় শোনাল ডবল জেডের গলা। 'ভ্যাঙ্কুভারই এখন আমার দেশ।'

'একা একা খারাপ লাগে না?'

শ্রাগ করল ডবল জেড। প্যাকেট থেকে আরও বিস্কুট নিয়ে টুকরো করল। ছড়িয়ে দিল কার্নিসে। জানালার কাছে এগিয়ে গেল কিশোর। ওকে দেখেই ফুড়ুত করে উড়াল দিল সবকটা কবুতর।

'সরি,' বলল কিশোর।

'ওরা আবার আসবে,' বলল ডবল জেড। 'খারাপ যে লাগে না তা নয়। তবে ভবিষ্যতে হয়তো এতখানি একাকিত্ব নাও থাকতে পারে।'

'তেমন হলেই ভাল।'

একটা সরু গলির ওপাশে আরেকটা হোটেল। কয়েকটা ঘরে বাতি জ্বলে উঠেছে। সন্ধ্যা ঘনিয়েছে। হঠাৎই বাড়ির কথা মনে পড়ল কিশোরের।

'বাড়িতে একটা ফোন করা দরকার,' ডবল জেডকে বলল ও।

'অফিসটার পাশে ফোন আছে। টাকা লাগবে?'

নিষেধ করল কিশোর। কষ্টেসৃষ্টে খুলল দরজাটা। এগোল হলওয়ের দিকে। নাক কুঁচকে গেল ওর। সেই দুর্গন্ধ। বিল্ডিংটার কোথায় যেন হালকা সুরে গান বাজছে।

লালচুলো অল্প বয়সী এক লোক বসে রয়েছে অফিসটিতে। ঢুলু ঢুলু চোখে কিশোরকে দেখল। তারপর আবার ঝিমাতে লাগল। কিশোর ফোন করল মামার বাড়িতে।

'হ্যালো, মামা?' ও প্রান্তের কণ্ঠ শুনে বলল কিশোর। 'আমি কিশোর। এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেছে হঠাৎ। খুব করে বলছে ওর সঙ্গে রাতে থেকে যেতে। রকি বীচের বন্ধু। কী বলো, মামা? আগে ওরা রকি বীচে থাকত। এখন চলে এসেছে কানাডায়। তুমি চাইলে ওর আম্মার সঙ্গে কথা বলতে পারো, বলবে?'

কিশোর ফোনে কথা বললেও দৃষ্টি তার লোকটির দিকে। ব্যাটা সত্যিই ঢুলছে নাকি ওর কথা গিলছে?

'অনেক ধন্যবাদ, মামা,' বলল কিশোর। 'আমি তবে আগামীকাল ফিরছি।'

মামা কথা বলতে চাননি। বিশ্বাস করেছেন কিশোরের কথা। অনুমতিও দিয়েছেন। অবশ্য তিনি কথা বলতে চাইলে কিশোর ডবল জেডকে ডেকে আনত। ওকে সব বুঝিয়ে বললে মামাকে ঠিকই ম্যানেজ করে নিত সে।

কিশোর ফিরে চলল ডবল জেডের ঘরের দিকে। খানিকটা অপরাধবোধে ভুগছে ও। মামা-মামীকে ঠকিয়েছে সে। কিন্তু এ ছাড়া উপায়ও তো ছিল না। অবশ্য ওঁরা যখন জানবেন কেন ও মিথ্যে বলেছে তখন নিশ্চয়ই মাফ করে দেবেন।

ডবল জেডের ঘরের দরজাটা খোলাই রয়েছে। বিছানায় শুকনো মত একটা মেয়েকে বসে থাকতে দেখে অবাক হলো কিশোর। কেমন চেনা চেনা মনে হচ্ছে। একটু ভাবতেই মনে পড়ল, পেট্রল পাম্পে দেখেছিল

একে। রাশের পরিচিত। মেয়েটির লম্বা চুলগুলো আজও অগোছাল, নোংরা। ঠোঁট দুটো ফুলে রয়েছে। কাঁপছে মেয়েটি। স্পাইডারের কাছে ড্রাগ কিনতে এসেছে? তবে তো রাশের সব চেষ্টাই পানিতে গেছে। মেয়েটিকে ফেরাতে পারেনি সে।

'হাই,' বলল কিশোর। 'চিনেছ আমাকে?'

চুপ করে রইল মেয়েটি। বসে রয়েছে জবুথুবু হয়ে। এ সময় রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল ডবল জেড।

'ওর নাম রিটা,' কিশোরকে বলল ও। 'ওর জন্যে সুপ বানাচ্ছি, খাবে তুমি? স্পাইডারের জন্যে অপেক্ষা করছে ও।'

কিশোর জানাল, সে খাবে না। রিটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে ও। মেয়েটি হঠাৎ মুখ তুলতেই চোখাচোখি হয়ে গেল। হাসল কিশোর। 'এখানে থাকো তুমি?'

মেঝের দিকে তাকিয়ে বসে রইল মেয়েটি। কথা নেই মুখে। অগত্যা হাল ছেড়ে দিল কিশোর। কানে আসছে গান। হেভি মেটাল। রান্নাঘরে চলে এল কিশোর।

রান্নাঘরটা ছোট্ট। ফলে ঢুকেই আবার বেরিয়ে এল কিশোর। দাঁড়াল দরজার কাছে। দুটো পাত্রে সুপ ঢালছে ডবল জেড। ধোঁয়া উঠছে। একটা পাত্র তুলে নিল কিশোর। রিটাকে দেবে।

ওকে সুপ আনতে দেখে এগিয়ে এল মেয়েটি। বাটিটা নিয়ে আবার গিয়ে বসল বিছানায়। কোলের ওপর বাটি রেখে সেঁকে নিচ্ছে হাত দুটো, তারপর খেতে শুরু করল সুপ। দেখে মনে হচ্ছে, বহুদিন যেন না খেয়ে আছে। এ দৃশ্য কিশোরের অতি পরিচিত। দেশে যখনই গেছে মানুষকে খাওয়ার কষ্ট পেতে দেখেছে। জানে, ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে খাবারের কী মূল্য।

ডবল জেড নিজের বাটিটাও এগিয়ে দিল রিটার দিকে। জানালাগুলো বন্ধ করে দিয়েছে ও। এখন রাত। পাশের হোটেলটায় মানুষজন দেখা যাচ্ছে। স্পাইডার কোথায়? এখনও ফিরছে না কেন?

দরজাটা খুলে গেল। স্পাইডারকে আশা করেছিল কিশোর। ও নয়। অন্য এক লোক ঢুকেছে ঘরে। কালো কোট, নীল প্যান্ট আর সাদা জুতোয় হাস্যকর দেখাচ্ছে তাকে। ঠোঁটে এক চিলতে হাসি, সিগারেটও আছে।

'স্পাইডার কোথায়?' সিগারেট সরিয়ে জিজ্ঞেস করল লোকটি।

'জানি না,' বলল ডবল জেড।

'ওর দরজায় নোট দেখলাম। বলেছে ৬ নম্বর রুমে দেখা করতে। কোথায় ও?'

'নোটটা সব সময়ই থাকে,' শান্ত স্বরে বলল ডবল জেড। 'আমি বড় জোর লোককে অপেক্ষা করতে বলতে পারি। অবশ্য ওকে কিছু জানানোর থাকলেও আমাকে বলতে পারেন।'

কাশল লোকটা। কিশোরকে জরিপ করে চলে গেল ঘর ছেড়ে। ভেজিয়ে দিয়েছে দরজা।

'অভদ্র কোথাকার,' বলল ডবল জেড।

'আগে কখনও দেখোনি?' জানতে চাইল কিশোর। ডবল জেডকে মাথা নাড়তে দেখে বলল, 'টিভি দেখি এসো।'

'আমার টিভি নেই।'

'ও।'

ছাদের দিকে এক ঝলক চাইল ডবল জেড। দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। 'রেডিওতে গান শুনেই ভাল সময় কেটে যায়। টিভির দরকার হয় না।'

'শোনো,' এসময় হঠাৎ বলে উঠল রিটা। 'স্পাইডারকে বলবে, ওকে আমার খুব দরকার।' দরজার দিকে এগোল ও। ভেজানো দরজাটা খুলতে যখন চেষ্টা করছে তখন এগিয়ে গেল কিশোর, সাহায্য করার জন্যে।

'গুড বাই,' বলল ও। জবাব পেল না।

পিঠে ঠাণ্ডা বাতাসের স্পর্শ পেয়ে ঘুরল কিশোর। ডবল জেড খুলে দিয়েছে জানালাগুলো। বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে কথাবার্তাও কানে এল। ওপাশের হোটেলটায় খুব হাসাহাসি হচ্ছে। কে একজন রেকর্ড প্লেয়ারের সঙ্গে তালি দিচ্ছে।

'এখন বুঝছি তোমার খুব একটা খারাপ লাগার কারণ নেই,' মৃদু হেসে বলল কিশোর। 'লোকজনের তো অভাব দেখছি না।'

'ঠিকই বলেছ,' বলল ডবল জেড। 'তবে স্পাইডারের কাছে যারা আসে তাদেরকে বন্ধু ভাবা যায় না।'

'এখানে ওয়াশরুম আছে?'

'হ্যাঁ। হলওয়ের শেষ প্রান্তে।'

'ধন্যবাদ,' বেরিয়ে এল কিশোর। ভাবল, ফিরে আবার কোন্ আগন্তুককে ডবল জেডের ঘরে দেখবে? দুর্গন্ধ এড়াতে দ্রুত পা চালাল ও। 'টয়লেট' লেখা দেখতে পেল একটা দরজার গায়ে। হ্যান্ডেল ঘোরাল ও। সামান্য খুলেছে দরজাটা। তারপর আটকে গেছে কীসে যেন। খানিকটা

জোর খাটাল কিশোর। এবার মাথা গলানো গেছে ভেতরে।

আবছা অন্ধকার। ভেতরে ডিম লাইটের আলো, হলওয়ে থেকে আসছে। একটা বস্তায় আটকাচ্ছে দরজাটা। ওটা একপাশে সরানোর জন্যে ঝুঁকে হাত লাগাল কিশোর। চমকে উঠল পরক্ষণেই। মানুষ।

লাফিয়ে উঠেছে কিশোরের হৃৎপিণ্ড। মরা নাকি? এ সময় নড়ে উঠল বস্তাটা। ওর দিকে চাইল এক লোক। মাথাটা টলছে।

'হাই!' বলল লোকটা। অ্যালকোহলের গন্ধ নাকে এসে লেগেছে কিশোরের।

'আপনি...আপনি কি অসুস্থ?'

'নো, ফ্রেন্ড,' জবাব এল। 'ঘুমাতে দাও।'

মাথাটা আবার আশ্রয় নিল মেঝেতে।

দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এল কিশোর। বুকের কাঁপুনি এখনও থামেনি। শ্বাস টানল লম্বা করে।

সামনে সিঁড়ি। উঠতে শুরু করল ও। পৌঁছে গেল ওপরতলায়। টয়লেট খুঁজে পেতেও কষ্ট করতে হলো না। এটা খালি। ভেতরে লাইটও রয়েছে, তবু নার্ভাস বোধ করছে কিশোর। দরজা লক করে দিল ও।

টয়লেটের দেয়ালগুলো নজর কাড়ল ওর। ভুল বানানে অসংখ্য কথা লেখা। পুলিস, উকিলদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেছে কেউ।

কাজ সেরে দ্রুত বেরিয়ে এল ও। ডবল জেডের ঘরে ঢুকতেই দেখতে পেল চেয়ারে বসে রয়েছে কে যেন।

লোকটা ঘুরে তাকিয়েছে ওর দিকে। হাসল কিশোর। কুতকুতে চোখে চেয়ে রয়েছে লোকটা। নাক চ্যাপ্টা আগন্তুকের ঠাণ্ডা চাহনি ভয় ধরিয়ে দিয়েছে কিশোরের মনে।

'এই ছোঁড়া কে?' কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠল লোকটি।

'স্পাইডারের বন্ধু,' জবাব দিল ডবল জেড। বসে রয়েছে বিছানায়। অস্বস্তিভরে বালিশে হাত বোলাচ্ছে।

'আগে তো কখনও দেখিনি।' হাতের ইশারায় কিশোরকে ডাকল। 'কাছে এসো। চেহারাটা ভাল করে দেখি একবার।'

এক মুহূর্ত দ্বিধা করল কিশোর, তারপর নির্দেশ পালন করল। চেহারা থেকে ভয় তাড়াতে চেষ্টা করছে ও। এক দৃষ্টে খানিকক্ষণ ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল লোকটি। তারপর মন দিল ওর কাপড়ে। ক'সেকেন্ড পর হাতের প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে বিছানায় গিয়ে পড়ল কিশোর।

'ওখানেই থাক,' গর্জে উঠল লোকটি। চাইল দরজার দিকে।

শুয়ে রইল কিশোর। নড়াচড়া করতে সাহস পাচ্ছে না। লোকটার গোলাপী শার্টের কলারে চোখ পড়ল ওর। ঘাম আর ধুলোয় কালো হয়ে রয়েছে। নড়ে উঠল বিছানা। ডবল জেড উঠে দাঁড়িয়েছে।

'চা বানাইগে,' বলল ও।

'চুপ করে বসে থাক,' আদেশ করল নাক চ্যাপ্টা। এখনও সে দরজার দিকে চেয়ে।

কিশোরকে অবাক করে দিয়ে রান্নাঘরে গেল ডবল জেড। প্রমাদ গুণল কিশোর। লোকটা কী করে বসে কে জানে? কিছুই ঘটল না। আরও বেশি অবাক হলো কিশোর। কেতলিতে পানি ঢালার শব্দ শুনতে পেল ও। জানালার দিক থেকে কবুতরের ডাক আসছে। কিন্তু সেদিকে তাকানোর মত সাহস নেই ওর।

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল ডবল জেড। হাতে মগ। ধোঁয়া উঠছে।

'চিনি দেব?' জিজ্ঞেস করল লোকটিকে। বাড়িয়ে দিল মগটা।

আচমকা উঠে দাঁড়াল নাক চ্যাপ্টা। প্রচণ্ড এক চড় কষাল ডবল জেডের গালে। দু পা পিছিয়ে হুড়মুড় করে পড়ে গেল ও। গরম চা চলকে পড়েছে কাপড়ে। এক সেকেন্ডের নীরবতা। তারপর ফোঁপাতে শুরু করল ডবল জেড।

আবার বসে পড়ল লোকটা।

'কথা কানে যায়নি না?'

ডবল জেডের দিকে তাকাল কিশোর। মনটা খারাপ হয়ে গেছে ওর। রাগ হচ্ছে নিজের ওপর। কিছুই করা সম্ভব নয় ওর পক্ষে।

সামলে নিয়েছে ডবল জেড। কাঁদছে না আর। তবে লাল হয়ে রয়েছে চোখ।

'স্পাইডার জানলে নিশ্চয়ই একটা কিছু করবে,' মেয়েটিকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল কিশোর।

ওর কথা কানে ঢোকেনি ডবল জেডের। তার লাল চোখ দুটো বোঁচাটার চেহারায় স্থির।

অনেকক্ষণ কেটে গেল এভাবে। নিশ্চুপ সবাই, নড়াচড়া নেই। হলওয়েতে পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। একাধিক লোকের। কথা বলছে কারা যেন, একজনের গলা চিনতে পারল কিশোর। স্পাইডার।

'কাল দেখা হবে,' বলল স্পাইডার। এক ধাক্কায় খুলে ফেলল দরজা।

ফাঁকটুকু দিয়ে গলিয়ে দিল চোখা মুখটা।

'কী ব্যাপার?' ওর কণ্ঠে বিস্ময়। ডবল জেডকে মেঝেতে বসে থাকতে দেখেছে। তারপর নাক চ্যাপ্টাকে দেখে ফিক করে হাসল। 'কী হে, হ্যারী, বেশি দেরি করে ফেলিনি তো?'

'করেছ,' জবাব দিল লোকটি।

'বস্ বলেছিলেন টাকা নিতে আসবে তুমি,' বলল স্পাইডার। 'সরি। দেরি হয়ে গেল।'

'হুঁ, টাকাটা কোথায়?'

পকেট থেকে একটা খাম বার করে এগিয়ে দিল স্পাইডার। টাকাগুলো গুণে নিল হ্যারী। তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'আজ রাতে ইয়ার্ডে দেখা হবে,' তারপর বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

'স্পাইডার!' ডাকল কিশোর। উঠে দাঁড়িয়েছে। 'ওকে যেতে দিয়ো না। বদমাশটা ডবল জেডকে মেরেছে।'

ডবল জেডের দিকে এক নজর চাইল স্পাইডার। লাল হয়ে রয়েছে মেয়েটির গালের চামড়া।

'কেন মেরেছে?' ডবল জেডকে জিজ্ঞেস করল স্পাইডার।

'এমনি।'

'হতেই পারে না। তুমি নিশ্চয়ই এমন কিছু করেছ যাতে চেতে গেছে হ্যারী।'

'না, ও কিছুই করেনি,' এবার মুখ খুলল কিশোর। 'বিনা কারণে মেরেছে।'

শ্রাগ করল স্পাইডার। ঘুরল। চলে যাবে।

'আমার ঘরে এসো, কিশোর। জরুরী কথা আছে।'

'কিন্তু ওই লোকটার ব্যাপারে কী করবে? ওকে এমনি এমনি ছেড়ে দেবে?'

ধৈর্য হারাল স্পাইডার।

'হ্যারী আমার বসের লোক,' বলল ও। 'ডবল জেডের সঙ্গে ওর কী হয়েছে সে ওদের ব্যাপার। আমি কেন ওতে নাক গলাতে যাব?'

'কিন্তু...'

'আসবে তুমি? নাকি এখানে দাঁড়িয়ে খালি প্যাঁচাল পাড়বে?'

বেরিয়ে গেছে স্পাইডার। ডবল জেড কাঁদতে শুরু করেছে আবার। হ্যারীর চড়ের চেয়েও বোধহয় স্পাইডারের অবহেলায় বেশি কষ্ট পেয়েছে

ও।

'তুমি স্পাইডারের সঙ্গে যাও,' কিশোরকে বলল ডবল জেড। 'আমার জন্যে চিন্তা কোরো না।'

'তুমি একা থাকবে?'

মাথা ঝাঁকাল ডবল জেড।

'আবার দেখা হবে,' বলল কিশোর।

হাত দেখাল ডবল জেড। ঘর ছাড়ল কিশোর। কষ্ট হচ্ছে মেয়েটির জন্যে। ওর জন্যে হলওয়েতে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে স্পাইডার। চোয়াল শক্ত হলো কিশোরের। উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হবে স্পাইডারকে।

সাত

ওপরে উঠতে লাগল ওরা।

'ডবল জেডকে নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না,' বলল স্পাইডার। 'ও একটুতেই নাকিকান্না শুরু করে।'

'ও ভাল মেয়ে।'

'হুঁ,' কিশোরের দিকে তাকাল, স্পাইডার। 'এত নরম মন নিয়ে কাজ করবে কীভাবে?'

'আমি নরম নই,' চোয়ালের পেশীগুলো দৃঢ় করল কিশোর। স্পাইডারের কাছে নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করতে চাইল না। 'তুমি আমার ওপর বিশ্বাস রাখতে পারো।'

'আমি ভরসা পাচ্ছি না,' বলল স্পাইডার। জরিপ করছে কিশোরকে। কেঁপে উঠল কিশোর। এ মুহূর্তে ভয় পাচ্ছে স্পাইডারকে।

'তোমাকে আরেকটা চান্স দেব,' বলল স্পাইডার। 'কিন্তু কোন ভুলচুক হলেই শেষ।'

ওপরতলায় স্পাইডারের ঘরে চলে এল ওরা। ভেতরে গুমোট ভাব। সব ক'টা জানালা বন্ধ। নোংরা কাপড়ের গন্ধে টেকা দায়। বাতি জ্বালল স্পাইডার।

এ ঘরটার অবস্থা ডবল জেডের চেয়েও বেহাল। অবশ্য ঘরের সৌন্দর্য বৃদ্ধির কোন চেষ্টাও করেনি স্পাইডার। কয়েকটা কম্বল আর বেডশিট গাদা করা অবস্থায় বিছানায় পড়ে আছে। বোটকা গন্ধ ছুটছে।

'তেষ্টা পেয়েছে?' জানতে চাইল স্পাইডার।

'না।' স্পাইডারের ছড়ানো ছিটানো কাপড়গুলো দেখছে ও।

একটা জানালা খুলে দিল স্পাইডার। বাইরের কোলাহল কানে আসছে। কাঠের একটা বাক্স রয়েছে ঘরে। ওটার ভেতর থেকে বিয়ারের একটা টিন বার করল স্পাইডার। মুখটা খুলে ছুঁড়ে দিল বাইরে। জানালা বন্ধ করল আবার।

এ ঘরের সঙ্গে রান্নাঘর নেই। তবে কোথায় রান্না করে স্পাইডার? হ্যামবার্গারের একটা কনটেইনার চোখে পড়ল কিশোরের। বিছানার পাশে পড়ে রয়েছে।

'কাজের কথায় আসি,' বলল স্পাইডার। ধপ করে বসে পড়ল বিছানায়। 'তোমাকে ভাড়া করব।'

কিশোর বুঝে উঠতে পারল না, এখন কী বলা উচিত। খানিক পরে মাথা নেড়ে বলল, 'গুড।'

'বসের সঙ্গে আর পোষাচ্ছে না,' গলায় বিয়ার ঢালল স্পাইডার। সতর্ক চোখে দেখছে কিশোরকে।

'কেন, কী হয়েছে?' জানতে চাইল কিশোর।

সবেগে মাথা ঝাঁকাল স্পাইডার। ক্রুদ্ধ।

'আমার প্ল্যানের কথা জানাতেই বস খেপে উঠেছে। বলে কিনা ছোটদের কাছে ড্রাগ বেচার চিন্তা ছেড়ে দিতে। আমাকে পাগলও বলেছে ওকে খুন করে ফেলতাম আমি, সামলে নিয়েছি কোনমতে।'

'তাই?'

'হ্যাঁ। আমার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেছে, কিশোর। আজ রাতে দেখা হচ্ছে বস আর হ্যারীর সঙ্গে। জানিয়ে দেব, আমি আর ওদের সঙ্গে নেই। নিজেই ব্যবসা শুরু করব। ওপেনহেইমার পার্কে আমার অপারেশন চালু হবে।'

'ওরা খেপে যাবে না?'

'খেপলে খেপবে। আমার প্রস্তাব পছন্দ হয়নি বসের। ব্যস, আমি নিজের রাস্তা দেখছি। এতে কার কী বলার আছে?' বিয়ারের টিনটা তুলল স্পাইডার। 'তবে আমার প্ল্যানের কথা আরও খোলসা করে বললে মত পাল্টে যাবে বসের। তা ছাড়া, তোমার কথাও তো বলিনি। চালু ছেলে এ লাইনে খুব বেশি নেই। বসের খুব মনে ধরবে তোমাকে। ধরুকগে, আমি আর তার সঙ্গে কাজ করব না। যা করার নিজেই করব।'

টোকা পড়েছে দরজায়। চমকে উঠল কিশোর। বেড়ে গেছে হৃদস্পন্দন। দরজার দিকে একবার চেয়ে চোখ সরিয়ে নিল স্পাইডার। এক চুমুকে খালি করে ফেলল বিয়ারের ক্যান।

'দরজাটা খোলো,' কিশোরকে বলল ও।

ধীর পায়ে দরজার কাছে গেল কিশোর। বুকটা কাঁপছে। হ্যারী ফিরেছে নাকি? না, ডবল জেড। ত্রস্ত পায়ে ঘরে ঢুকল ও। চোখ স্পাইডারের দিকে।

'তোমাকে বলতে মনে ছিল না,' নরম গলায় বলল ডবল জেড। 'রিটা এসেছিল। তোমাকে নাকি খুব দরকার।'

'ঠিক আছে,' বলল স্পাইডার। 'আর কোন মেসেজ?'

'না,' ডবল জেড ভীরু চোখে চেয়ে রয়েছে। মনে আশা, স্পাইডার হয়তো বলবে কিছু। তার বদলে টোবাকো বার করে সিগারেট রোল করতে শুরু করল স্পাইডার। মাথা নিচু করে বেরিয়ে গেল ডবল জেড।

'দরজাটা বন্ধ করে দাও।' চেয়ার থেকে কাপড় সরিয়ে ইঙ্গিতে কিশোরকে বসতে বলল স্পাইডার। 'মেয়েটা বোকার হদ্দ। গর্দভ। ওকে দিয়ে কিস্যু হবে না।'

জোর করে হাসল কিশোর। ফুঁসছে ভেতর ভেতর।

'ডবল জেডকে একবার ভ্যাঙ্কুভার ছাড়তে বলেছিলাম। কথা শোনেনি। এখানেই নাকি ভাল লাগে ওর।' সিগারেট ধরিয়েছে স্পাইডার। লক্ষ্য করছে লাল আগুন। 'কেউ যদি নিজের ভাল না বোঝে তো আমার কী?'

'তা তো ঠিকই।'

'তারচেয়ে বাবা আমিই ভাল আছি। ভাবনা নেই, চিন্তা নেই।' কিশোরকে এক ঝলক দেখে নিল স্পাইডার।

'স্নেক কারা জানো?'

'না।'

'এগুলো সব শিখতে হবে তোমাকে। পুলিসের আন্ডারকভার ইনফর্মার হচ্ছে স্নেক।'

'ওদের তো নার্কও বলে।'

বিস্মিত দেখাল স্পাইডারকে। বেরিয়ে পড়েছে দাঁত। হাসছে। 'বাহ, তুমি জানলে কীভাবে?'

খুশি হয়ে উঠল কিশোর। হাসি গিয়ে ঠেকল দু'কানে। পরমুহূর্তেই বুঝল, বেশি চালাকি করাটা ওর জন্যে বোকামি। স্পাইডার সন্দেহ করতে পারে। হাসি মিলিয়ে গেল।

'কদিন আগে একটা স্নেক খুব জ্বালাচ্ছিল,' বলল স্পাইডার। 'হ্যারী আর বস্ মীটিং করল ওর সঙ্গে। তারপর খতম। তিন নম্বর জেটিতে লাশ ভেসে উঠল।'

'খুন?' উত্তেজনা দমন করতে না পেরে বলে উঠল কিশোর। 'তবে ও নিশ্চয়ই...'

'ও কী?'

'না, কিছু না,' কোনমতে বলতে পারল কিশোর। লাল দেখাচ্ছে তার মুখ। 'ও নিশ্চয়ই নিজেকে খুব চালাক মনে করেছিল!'

'ঠিকই বলেছ,' বলল স্পাইডার। ধোঁয়া ছাড়ল নাক দিয়ে। 'সেজন্যেই জানটা দিতে হলো।'

উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছে কিশোর। মৃত পুলিসটি আর কেউ নয়, যার কথা শার্প বলেছিলেন সে-ই। তারমানে স্পাইডারের বস্ আর হ্যারী দুজনেই অবৈধ ড্রাগ ব্যবসায়ী এবং খুনী। পুলিসের জন্যে এটা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। কিন্তু ওরা তো স্পাইডারের বসের পরিচয়ও জানতে চাইবে। কে সে? তার পরিচয় কীভাবে উদ্‌ঘাটন করবে কিশোর?

মুচকি হাসল স্পাইডার।

'বসের মেজাজ মর্জি বুঝি না আমি,' বলল ও। 'এত টাকা রোজগার করে অথচ ভাল একটা গাড়ি কেনে না। আমার অনেক টাকা হলে নতুন মডেলের একটা গাড়ি কিনব। সারা শহরটা দাপিয়ে বেড়াব। লোকে স্বীকার করবে, হ্যাঁ, স্পাইডার নামে আছে একজন।'

'কিন্তু ছেলেদের হাতে অত টাকা কোথায়?'

'ড্রাগের টাকা ভূতে জোগায়, কিশোর। একবার শুধু নেশাটা ধরুক। তারপর আপনিই টাকা বেরোবে সুড়সুড়িয়ে। প্রয়োজন পড়লে চুরি করবে।' সামান্য থামল স্পাইডার। 'লোকে কীভাবে টাকা জোগাড় করে তার অনেক গল্প শুনেছি বসের মুখে।' জানালার দিকে চাইল ও। 'বসের সাহায্য ছাড়া ব্যবসায় জুত করা কঠিন হবে। পুলিসের ভেতরের খবর সব জেনে যায় বস্। বিরাট প্লাস পয়েন্ট তার।'

'কীভাবে?' বিস্মিত হয়ে গেছে কিশোর।

'পুলিস হেডকোয়ার্টার থেকে গোপন খবর কীভাবে যেন পেয়ে যায় বস্, অপারেশনের আগে। নতুন কোন স্নেক বেশি কিলবিল করলেই জানান দেয় হ্যারী আর আমাকে।'

ধৈর্য ধরে রয়েছে কিশোর, বেশি কৌতূহল প্রকাশ করতে চাইছে না।

স্পাইডারের চোখ এখন উল্টো দিকের হোটেলটিতে।

'লোকগুলোকে দেখো,' বলল ও। 'মহা আনন্দে দিন কাটাচ্ছে। কোন চিন্তা ভাবনা নেই, কেবল ফুর্তি।'

চুপ করে আছে কিশোর। বলে চলল স্পাইডার। 'তবে কোন কোন ব্যাপারে বস্ আমাদের সঙ্গে পাত্তা পাবে না। যেমন ধরো, ড্রাগ লুকিয়ে রাখার জায়গা। বসের চেয়ে ভাল ব্যবস্থা আছে আমার।'

চারপাশে এক ঝলক চাইল কিশোর। মনে আশা, ওকে হয়তো গোপন জায়গাটা দেখিয়েও দিতে পারে স্পাইডার। কিন্তু সরু চোখে এখনও বাইরে চেয়ে রয়েছে স্পাইডার।

'বস্ ময়েশ্চার প্রুফ প্যাকেজে তার মাল রাখে। ভিজে যাওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু মাঝেমধ্যে আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হয়ে যায় আমার। বস্ ক্যাপ খুলতে যা দেরি করে! কোত্থেকে কখন ঠোলাগুলো এসে পড়ে কোন ঠিক আছে?'

'তোমার কথা বুঝতে পারলাম না,' বলল কিশোর। আরও বিস্তারিত বিবরণ আশা করছে।

'মাল রাখার জন্যে ভাল জায়গা চাই,' বলল স্পাইডার। 'ট্রানজিস্টর রেডিও সেজন্যে চমৎকার।'

টোকা পড়ল দরজায়। দুবার। সাড়া দিতে গেল কিশোর। রিটা। জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

'স্পাইডার আছে?'

'রিটা নাকি?' চেঁচাল স্পাইডার।

'হ্যাঁ।'

সিগারেটটা মেঝেতে ফেলে জুতো দিয়ে পিষে দিল স্পাইডার। বেরিয়ে গেল বাইরে। দরজা ভেজিয়ে দিয়েছে। দরজায় কান পাতল কিশোর। বৃথা। হেঁটে চলে যাচ্ছে ওরা।

হঠাৎই ক্লান্তি বোধ করল কিশোর। বাসায় ফেরার জন্যে মন ছটফট করছে। কিন্তু উপায় নেই। এই রহস্যের জালে নিজেকে পুরোপুরি জড়িয়ে ফেলেছে সে। জানালার কাছে গেল ও। বাইরে শহুরে ব্যস্ততা।

নিয়ন লাইট জ্বলছে। অসংখ্য লোকজন। নিজেকে অন্য ভুবনের বাসিন্দা মনে হলো ওর। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে অন্য হোটেলটার দিকে চাইল ও। উৎসব চলছে।

ঘরের ভেতর ভাপসা গন্ধ। দম আটকে আসছে কিশোরের। খুলে দিল

একটা জানালা, স্পাইডার রাগ করতে পারে ভেবেও। বুক ভরে রাতের বাতাস টেনে নিল ও। শান্তি! হোটেলটা থেকে এখন স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে কোলাহল। নীচ থেকে সসেজ ভাজার গন্ধ নাকে এল ওর।

কাঠের বাক্সটার কথা হঠাৎ মাথায় এল কিশোরের। স্পাইডার কি শুধুই বিয়ার রাখে ওটায়? নাকি অন্য কিছুও? ভেতরটা হাতড়ে দেখল ও। না, কিছুই নেই।

ঘরটা তল্লাশী করা উচিত। কিন্তু ধরা পড়ে গেলে? একটা ডিটেকটিভ হ্যান্ডবুকে পড়েছিল, ঘরের আসবাবপত্রের নীচ দিকটা পরীক্ষা করা দরকার। টেপ দিয়ে কোন কিছু হয়তো আটকানো থাকতে পারে। মুহূর্তে চেয়ারটা উল্টে ফেলল কিশোর। শুকনো পুটিং ছাড়া কিছুই দেখতে পেল না।

হাঁটু গেড়ে বসে বিছানার নীচে উঁকি দিল কিশোর। মেঝেটা ধুলোয় ভর্তি। তা ছাড়া সিগারেটের টুকরো, উচ্ছিষ্ট খাবার তো রয়েছেই। হামাগুড়ি দিয়ে ম্যাট্রেসের তলাটা পরীক্ষা করল কিশোর।

খামোকা। উঠে পড়ল ও, ধুলো ঝাড়ল শরীর থেকে। স্পাইডারের একটা প্যান্টের পকেটে ম্যাচের বাক্স পেল। বাক্সটা রেখে দিয়ে দ্রুত হাতে অন্য কাপড়গুলো দেখে নিল ও। পাওয়া গেল না কিছুই।

কাঁপছে কিশোর। যে কোন মুহূর্তে ফিরতে পারে স্পাইডার। ক্লজিটটা পরীক্ষা করা হয়নি এখনও। ঝুঁকি নেবে ও? ইতস্তত করতে লাগল কিশোর। মানসপটে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে স্পাইডারের ক্রুদ্ধ চেহারাটা।

বাইরে রেডিও ছেড়েছে কেউ। খবর চলছে। কানাডা ফুটবলে দু গোলে হেরেছে, হন্ডুরাসের সঙ্গে।

ক্লজিটের দিকে এগোল কিশোর। পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। চমকে তাকাল ও। প্রচণ্ড ভয় পেয়েছে। দড়াম করে খুলে গেল দরজা। তার আগেই অবশ্য ক্লজিটটার কাছ থেকে খানিকটা পিছিয়ে গেছে কিশোর-। স্পাইডার ঢুকল ঘরে।

'কী করছ?'

'কিছু না।' দ্রুততর হয়েছে কিশোরের হৃদস্পন্দন। টেনিস বল লাফাচ্ছে বুকের ভেতর। ভয় হচ্ছে, স্পাইডার শুনে ফেলবে না তো?

ঘরের ভেতরটা একবার জরিপ করে নিল স্পাইডার। তারপর বিয়ারের ক্যান নিয়ে ঢাকনাটা ছুঁড়ে দিল বাইরে। দেখছে কিশোরকে।

'কাজটা ভাল করোনি।'

'কোন্ কাজ?' চোখজোড়া বিস্ফারিত হয়ে গেছে কিশোরের।

'জানালাটা খোলা উচিত হয়নি।' বিয়ারের ক্যানে চুমুক দিল স্পাইডার। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে মুখ মুছছে। 'আমার পারমিশন ছাড়া কিছুই করা চলবে না, বুঝেছ?'

'সরি। আমি বুঝিনি।'

বিরক্ত চোখে বাইরের দিকে তাকাল স্পাইডার। চকিতে ছড়ানো কাপড়গুলো দেখে নিল কিশোর। স্পাইডার বোঝেনি তো? দ্রুত খেলছে ওর মাথা। আজ রাতে যদি স্পাইডার কাজ ছেড়ে দেয়, তবে ওর বসকে দেখার একমাত্র সুযোগ আজই।

'তোমাদের মীটিং-এ আমাকে নেবে?'

মাথা নাড়ল স্পাইডার।

'আমি একাই যাব। তুমি এখন ঘুমাও, কাল অপারেশনের প্ল্যান করব।'

'কখন হচ্ছে মীটিংটা?'

'আরও অন্তত ঘণ্টা দুয়েক।' জানালার পাশে চেয়ার নিয়ে গিয়ে বসল স্পাইডার। চৌকাঠে তুলে দিয়েছে পা দুটো। সিগারেট রোল করল।

'তুমি শুয়ে পড়ো,' কিশোরকে বলল।

'ঠিক আছে।' অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজি হতে হলো কিশোরকে। কিছুতেই স্পাইডারের সন্দেহ উদ্রেক করা চলবে না। ঘুমানোর ভান করবে ও। তারপর গোপনে পিছু নেবে স্পাইডারের। পৌঁছে যাবে ওদের আড্ডাখানায়।

খাটে বসে জুতো খুলল কিশোর। অজান্তেই কুঁচকে উঠল নাক। তেলচিটচিটে বালিশ মাথায় দিয়ে, নোংরা বেডশিটে গা এলিয়ে দিল ও। মুহূর্ত পরেই চুলকাতে শুরু করল শরীর। উঠে বসে হেলান দিল দেয়ালে।

'ওটা কী?' মেঝের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করেছে স্পাইডার।

বিদঘুটে কোন পোকামাকড় দেখবে ভেবেছিল কিশোর। কিন্তু তা নয়।

'কোনটা কি?' জিজ্ঞেস করল ও।

'তোমার জুতোর ভেতর।' এক পাটি জুতো তুলে নিয়েছে স্পাইডার। 'এখানে টাকা রাখো নাকি?'

লজ্জা পেল কিশোর, ভয়ও। অন্য সব স্নেকরাও কি তার মত জুতোর ভেতর টাকা রাখে?

'আমার আসলে...আসলে মানিব্যাগ কেনার পয়সা নেই,' ভীরু শোনাচ্ছে কিশোরের গলা। 'তা ছাড়া পকেটগুলোও ফুটো।'

স্থির চোখে কিশোরকে দেখল স্পাইডার। ঢোক গিলল কিশোর। পকেটগুলো দেখতে চায় যদি? কিন্তু তেমন কোন ইচ্ছে স্পাইডারের নেই।

মৃদু হেসে টাকাগুলো জুতোর ভেতর রেখে দিল ও।

'তোমার স্ক্রু ঢিলা আছে,' বলল স্পাইডার। 'আই লাইক ইউ।'

হাঁফ ছেড়ে বাঁচল কিশোর।

'আচ্ছা, ডবল জেডকে অমন অদ্ভুত নামে ডাকো কেন?' দ্রুত প্রসঙ্গ পাল্টাতে চাইল ও।

হাসল স্পাইডার। ' "এ" হচ্ছে অ্যালফাবেটের প্রথম অক্ষর। আর "জেড" হচ্ছে শেষ। মেয়েটা এতই অপদার্থ, অপ্রয়োজনীয়–ঠিক দুটো জেডের মতই।'

বাতি নিভিয়ে দিয়েছে স্পাইডার। ঘরে এখন অস্বস্তিকর অন্ধকার। রাগে গা জ্বলে যাচ্ছে কিশোরের। রাস্তায় সেই বুড়ো মানুষটির প্রতি ডবল জেডের সহানুভূতির কথা মনে পড়ল। মেয়েটার হয়ে মুখ খুলতে মন চাইছে ওর। উপায় নেই।

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল স্পাইডার।

'ডবল জেডকে দেখলে পুরানো কথা মনে পড়ে যায়।'

'কীরকম?'

'ছোটবেলায় এক মেয়েকে ঠকিয়েছিলাম,' চাপা হেসে সিগারেটে লম্বা টান মারল স্পাইডার। 'ও-ও ডবল জেডের মত গর্দভ ছিল। বিস্কুট বিক্রি করছিল রাস্তায়। কেনার ভান করে গিয়ে ওর ক্যাশ নিয়ে পালালাম।'

স্মৃতি রোমন্থন করে খুশি হয়ে উঠেছে স্পাইডার। বেরিয়ে পড়েছে দু পাটি দাঁত।

'সেই শুরু। আর থামিনি। কাজ করে চলেছি।'

'ভয় করে না! যদি ধরা পড়ো?'

'কোন চান্স নেই। ধরা পড়ে বোকারা, আমার মত ছেলেরা নয়।'

মনে মনে হাসল কিশোর। অহঙ্কারই পতনের মূল। শীঘ্রিই ব্যাপারটা ঘটতে যাচ্ছে স্পাইডার বাবাজীর ভাগ্যে। পাশের ঘর থেকে হারমোনিকার-সুর ভেসে আসছে। হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। বোতল ভাঙার শব্দ। উঁচু স্বরে গালি দিয়ে উঠল কে যেন। 'ওই চুপ যা,' বলল আরেকটা কণ্ঠ। মাতাল। বাজনা শুরু হলো আবার।

ঘুম পাচ্ছে কিশোরের। জেগে থাকতে হলে চোখে পানির ছিটে দেয়া দরকার। উঠে পড়ল ও।

'মুখটা ধুয়ে আসি।'

বাতি জ্বালল স্পাইডার।

'তোয়ালেটা খুঁজে নাও।'

কিশোর জানে কোথায় আছে ওটা। স্পাইডারের কাপড়চোপড় ঘাঁটাঘাঁটির সময় দেখেছে। কিন্তু ইচ্ছে করে সময় নিল ও। তোয়ালেটা খুঁজে পেয়ে চলে গেল বেসিনের কাছে। বড়সড় একটা তেলাপোকা ঘুরে বেড়াচ্ছে বেসিনের ভেতর।

'ওরে বাবা, বিরাট সাইজ!' বিস্ময়ে বলে উঠল কিশোর।

'কী?'

'তেলাপোকা।'

'মেরে ফেলো,' আদেশ দিল স্পাইডার।

তেলাপোকাটা এখন স্থির, স্পাইডারের কথা বুঝেই যেন। কিশোর আশা করল, দ্রুত নিরাপদ আশ্রয়ে পালাবে ওটা। কিন্তু পোকাটা নড়ল না। হয়তো ভেবেছে, নট নড়ন চড়ন নট কিচ্ছুই এ মুহূর্তে সবচেয়ে কার্যকর।

'কই, মারলে না?' অসহিষ্ণু গলায় বলে উঠল স্পাইডার।

বেসিনের এক কোণে কিল বসাল কিশোর। তারপর মুখ না ধুয়েই ফিরে এল বিছানায়। গা এলিয়ে দিল।

আরেকটা সিগারেট রোল করল স্পাইডার। বাতি নিভিয়ে দিয়েছে। তবে তার আগেই ম্যাট্রেসের এক কোনার দিকে চোখ পড়েছে কিশোরের। সিগারেটের পোড়া দাগ। বেশ অনেকগুলো। স্পাইডার কবে যে ঘরে আগুন ধরিয়ে বসবে কে জানে।

সাইরেন আর গাড়ির হর্ন চিরে দিচ্ছে রাতের নিস্তব্ধতা। ঘুম নামছে কিশোরের চোখে, টিভি পর্দায় নিজেকে দেখতে পাচ্ছে ও। হারমোনিকা বাজাচ্ছে। হলভর্তি দর্শক হাততালি দিচ্ছে। তারপর বদলে গেল ছবিটা। রেডিওতে খবর পড়ছে ও। শ্রোতাদের জানাচ্ছে, জিম্মিরা সবাই অক্ষত অবস্থায় ছাড়া পেয়েছে। হ্যাঁ, সবাই ভাল আছে। সুস্থ আছে। নিশ্চিন্তে ঘুমের রাজ্যে তলিয়ে গেল ও।

আট

'বেরিয়ে যাও!'

ধড়মড় করে উঠে বসল কিশোর, চারদিকে অন্ধকার। কোথায় ও? অচেনা গন্ধ, শব্দ অবাক করে দিয়েছে ওকে।

'বেরোও!' মহিলার কণ্ঠস্বর। 'দুদিন কোন খবর নেই এখন এসেছ ইয়ার্কি মারতে? দূর হয়ে যাও। তোমার মুখ দেখতে চাই না আমি।'

দেয়ালের ওপাশ থেকে চিৎকারটা আসছে। নিচু স্বরে ক্ষমা চাইল এক লোক। এ সময় সব মনে পড়ে গেল কিশোরের। ঘুমিয়ে পড়েছিল ও। ইতোমধ্যে স্পাইডার চলে গেছে মীটিং-এ। হলো না। স্পাইডারকে ফলো করতে পারল না ও।

জুতো পরে নিয়ে জানালার কাছে গেল ও। নিজের ওপর প্রচণ্ড রাগ হচ্ছে। তারাভরা আকাশ। দেখে মন খানিকটা ভাল হলো ওর।

দেয়ালের ওপাশের মহিলা ফোঁপাচ্ছে। হঠাৎ ডবল জেডের কথা মনে পড়ল কিশোরের। স্পাইডার কোথায় গেছে হয়তো জানে ও। আশাবাদী হলো কিশোর। বেরিয়ে এল হলওয়েতে।

অর্ধেক পথ পেরোনোর পর মনে পড়ল রাতের বেলা কাজে বেরোয় ডবল জেড। মুহূর্তে দমে গেল ও। কিন্তু সামলেও নিল দ্রুত। ডবল জেডের দরজার কাছে পৌঁছে নক করল, বেশ জোরে। এটাই একমাত্র চান্স। ডবল জেড না থাকলে সব ভেস্তে যাবে।

সাড়া দিচ্ছে না ডবল জেড। কিশোর নক করল আবারও। বিছানার স্প্রিং-এর শব্দ শুনতে পেল ও। কান পাতল দরজায়। পায়ের শব্দ। ক্রমশ জোরাল হচ্ছে। হ্যান্ডেলে মোচড় পড়ল। ডবল জেডের ঘুমমাখা চেহারাটা দেখে খুশি হয়ে উঠল কিশোর।

'কিশোর?' চোখ পিটপিট করে জানতে চাইল ডবল জেড।

'তোমার সঙ্গে জরুরী কথা আছে,' বলল কিশোর। অপেক্ষা করল ডবল জেডের প্রতিক্রিয়া দেখার জন্যে। হাই তুলল মেয়েটি। মাথা চুলকাচ্ছে।

'প্লীজ, ঢুকতে দাও।'

'এসো।'

ঘরে ঢুকল কিশোর। শুনতে পেল হাসির শব্দ। ছাতের দিকে চাইল ও। রেডিও বাজছে। হাসির নাটক শুনছে লোকটা।

'কাজে যাওনি?' ডবল জেডকে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'আজ আমার ছুটি,' ড্রেসিং গাউনের ফিতেটা কষে বাঁধল ডবল জেড। 'কী ব্যাপার বলো তো?'

'তোমার সাহায্য চাই,' সামান্য বিরক্তি দিল কিশোর। ভাবছে, কী বলবে। সত্যি কথাটা বলে দেবে? উঁহুঁ, ঠিক হবে না। তবে সত্যির ধারে কাছের একটা কিছু বলা উচিত।

'স্পাইডারকে এক্ষুণি খুঁজে বার করতে হবে।'

'কেন!'

'আমার ধারণা ও বিপদে পড়েছে,' বলল কিশোর। অবাক হলো নিজের উপস্থিত বুদ্ধি দেখে। বিপদে স্পাইডার ঠিকই পড়েছে। কিশোর এখন ওর গোপন শত্রু। তা ছাড়া ওর বস্ আর হ্যারী কাজ ছাড়ার ব্যাপারটা কীভাবে নেবে সেটাও একটা প্রশ্ন।

'কী বিপদ?'

'এখনও শিওর বলতে পারছি না। তবে স্পাইডারকে খুঁজে পাওয়া দরকার। ও কোথায় গেছে জানো?'

মাথা নাড়ল ডবল জেড।

'আমি ঘুমাচ্ছিলাম।'

'ও কি কখনও বলেছে বসের সঙ্গে কোথায় দেখা করে?'

এক মুহূর্ত ভাবল ডবল জেড।

'ও কি সত্যিই বিপদে পড়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'কাল রাতে এক লোকের জন্যে মেসেজ রেখে গেছে ও। কারাল স্ট্রিটের রেলওয়ে ইয়ার্ডে দেখা করতে বলেছে।'

'যাবে আমার সঙ্গে?'

'কেন?'

'আমি কারাল স্ট্রিট চিনি না। প্লীজ, ডবল জেড আমার সঙ্গে চলো। স্পাইডারকে বাঁচানো দরকার।'

কিশোরের অনুরোধ ফেরাতে পারল না ডবল জেড।

'বাইরে গিয়ে দাঁড়াও। আমি কাপড় পাল্টে আসছি।'

'আচ্ছা!' বলল কিশোর। খুশি হয়ে উঠেছে। হলওয়েতে গিয়ে প্ল্যান এঁটে নিল। যত দ্রুত সম্ভব যোগাযোগ করতে হবে পুলিসের সঙ্গে। তবে তার আগে স্পাইডারের বসকে চিনে নেয়া দরকার।

কোট পরে বেরিয়ে এল ডবল জেড। কানে রিং, মেকাপও করেছে। স্পাইডারের জন্যে?

'ও ভাল থাকলেই ভাল,' উদ্বিগ্ন শোনাল ডবল জেডের কণ্ঠ।

ডবল জেডকে নিশ্চিত করতে চাইল কিশোর। কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ল অচিরেই জেলে যাচ্ছে স্পাইডার। কাজেই চুপ করে রইল ও। হাঁটছে ওরা হলওয়ে ধরে। রেডিও বাজছে, লোকজনের কথাবার্তাও কানে আসছে।

লোকগুলো কি ঘুমায় না নাকি?

হোটেল ছেড়ে বেরোতে পেরে হাঁফ ছাড়ল কিশোর। ফুসফুস ভরে নিল মুক্ত বাতাসে। এজন্মে আর এমুখো হচ্ছে না ও। আল্লাহ্‌ বাঁচিয়েছেন! হাঁটতে শুরু করল ওরা।

খানিকক্ষণ পা চালাতেই স্কিড রোডে চলে এল ওরা। এখানে জীবনযাত্রা থেমে যায়নি এখনও। দুটো লোক বেঞ্চে বসে মদ গিলছে। পেপার ব্যাগে লুকিয়ে রেখেছে বোতল। আবছা মত একটা শরীর ডাস্টবিন হাতড়াচ্ছে।

পরের ব্লকটাতে এখন ওরা। সাঁ করে বেরিয়ে এল একটা ট্রাক। আরেকটু হলেই ধাক্কা খেত এক মাতাল। ভারি শব্দ তুলে চলে গেল ট্রাকটা। রেখে গেল ডিজেলের গন্ধ। ডবল জেড এ এলাকায় থাকে কীভাবে? চারদিকে মাতাল, ক্রিমিনাল।

'রেডিয়াম হট স্প্রিঙ-এ চলে গেলেই ভাল করতে তুমি,' ডবল জেডকে বলল কিশোর।

ডবল জেড নিশ্চুপ। দূরের ল্যাম্প পোস্টটার দিকে আঙুল দেখাল।

'ওই যে গ্যাসটাউন।'

'জলদি চলো!' বলল কিশোর। ম্যাপল ট্রি স্কয়্যার চমৎকার জায়গা। ভাল লেগেছে ওর। আঁধার ফুঁড়ে বেরিয়ে এল ওরা। গাছপালা আর সাদা ল্যাম্প পোস্টগুলো দেখতে পেয়ে স্বস্তির শ্বাস ছাড়ল কিশোর। নিরাপদ বোধ করছে।

'স্পাইডারের কাছে যাবে না?' জানতে চাইল ডবল জেড। কিশোরকে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে অবাক হয়েছে।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ,' বলল কিশোর। 'রেলওয়ে ইয়ার্ড কোথায়?'

'ওইদিকে,' জবাব দিল ডবল জেড। 'লাইটগুলোর পেছনে।'

ম্যাপল ট্রি স্কয়্যার পেরোতেই আবার অন্ধকার। দমে গেল কিশোর। বিগড়ে গেছে মেজাজ। ফিরে যেতে মন চাইছে। অতিকষ্টে সামলে নিল ও।

সামনে সবুজ সিগন্যাল বাতি। রেল-চাকার ঘটাংঘট শব্দ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। রেলওয়ে ইয়ার্ডটা ডুবে রয়েছে গাঢ় আঁধারে।

'কিশোর,' ডাকল ডবল জেড। 'স্পাইডার এমন জায়গায় এল কেন?'

'পরে বলব।'

'আমার ভয় করছে,' ফিসফিস করে বলল ডবল জেড।

'ভয় নেই। আমি আছি,' বলল কিশোর। মিথ্যে আশ্বাস দিল। ভয়ভয়

করছে তারও। ধীর পায়ে আগে বাড়ল ও। কয়লা আর মাটির ঢেলা চূর্ণ হচ্ছে পায়ের চাপে। প্রতি পদক্ষেপেই শিরশিরে অনুভূতিটা বেড়ে চলেছে। স্পাইডার ব্যাটা কোথায় লুকাল?

'ঠিক কোনখানে লোকটাকে দেখা করতে বলেছে জানো?' ফিসফিসিয়ে জানতে চাইল কিশোর।

'কার্পেটল্যান্ড ওয়্যারহাউজে যেতে বলেছে।'

কোন্ একটা ট্রেন যেন রওনা দিয়েছে। বগিগুলো সশব্দে পিছু নিল ওটার। ভালই হলো। ওদের পায়ের শব্দ ঢাকা পড়ে যাবে ট্রেনের আওয়াজে। একটা ওয়্যারহাউজের দিকে এগোল কিশোর।

কাছে পৌঁছে দেখল লেখা রয়েছে: কার্পেটল্যান্ড। কিন্তু স্পাইডারের টিকিটিও দেখা যাচ্ছে না। চোখ সরু করে চাইল কিশোর। আশা করল, সিগারেটের লাল আলো দেখতে পাবে। কিন্তু শুধুই আঁধার।

'ওই যে!' কিশোরের বাহু আঁকড়ে ধরে দেখাল ডবল জেড, 'আমার মনে হয় ও ওই শ্যাকটায় রয়েছে।'

ধক করে উঠল কিশোরের হৃৎপিণ্ড। ছোট একটা শ্যাকের দিকে এগোচ্ছে ডবল জেড। ওয়্যারহাউজের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ানো ওটা।

'সাবধান,' বলল কিশোর। 'বিপদ হতে পারে।' ওর কথা কানে তুলল না ডবল জেড। অগত্যা পিছু নিতে হলো কিশোরকে। দেখতে পেল, শ্যাকের কাছে পৌঁছে গেছে ডবল জেড। ঝুঁকেছে দরজার সামনে। তারপর ঝট করে তাকাল পেছন দিকে।

'স্পাইডার,' কোনমতে বলল ও। 'এখানে পড়ে আছে।'

সতর্ক পায়ে আগে বাড়ল কিশোর। শ্যাকের মেঝেয় মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে স্পাইডার। ভীষণভাবে আহত। খুব সম্ভব মারা গেছে মনে করে ফেলে রেখে চলে গিয়েছে আক্রমণকারী।

'ওকে চিত করে শোয়াও,' বলল ডবল জেড। দুজন মিলে চিত করল স্পাইডারকে। ওর মুখ থেকে ধুলো মুছে দিল ডবল জেড।

'আমি যাচ্ছি,' উঠে দাঁড়িয়েছে ডবল জেড। 'তুমি ওকে দেখে রেখো।'

'কোথায় যাচ্ছ?'

'কাছেই পুলিস স্টেশন। খবর দেয়া দরকার।' ঘুরেই ছুটল ডবল জেড। ক্রমশ মিলিয়ে গেল ওর পায়ের শব্দ।

স্পাইডারের ওপর ঝুঁকল কিশোর। মেঝেতে হাত লাগতেই চমকে উঠল। ভাল করে চেয়ে দেখল সিগারেটের পোড়া টুকরো, ম্যাচের কাঠি

ছড়িয়ে রয়েছে। একটা সানগ্লাসের ভাঙা কাঁচও চোখে পড়ল। রূপালী ফ্রেমের খানিকটা লেগে রয়েছে। এসময় গুঙিয়ে উঠল স্পাইডার। চোখ মেলেছে।

'তোমাকে কে মেরেছে, স্পাইডার? তোমার বস্?'

ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকাল স্পাইডার। সায় জানাচ্ছে।

'হ্যারীও ছিল,' দুর্বল কণ্ঠে বলল ও।

'কেন? কাজ ছাড়তে চেয়েছ বলে?'

খপ করে কিশোরের আস্তিনের কাছটা আঁকড়ে ধরল স্পাইডার।

'তুমি পুলিসের ইনফর্মার,' ফিসফিস করে বলল।

'কী বললে?'

'বসকে তোমার কথা বলাতে চিনে ফেলেছে।'

আত্মা খাঁচাছাড়া হবার জোগাড় কিশোরের। স্পাইডারের দিকে চেয়ে রইল বিস্ফারিত চোখে।

'বস্ আর হ্যারী তোমাকে খুঁজছে। তোমার রক্ষা নেই।'

'তোমার বস্ আমাকে চিনল কীভাবে?' এক ঝটকায় আস্তিন ছাড়িয়ে নিয়ে জানতে চাইল কিশোর। স্পাইডারের কথা বিশ্বাস হতে চাইছে না। কিন্তু স্পাইডার মিথ্যেই বা বলবে কেন?

'তোমার বস্ কে, স্পাইডার? প্লীজ, আমাকে নামটা বলো।'

কিশোরের কণ্ঠে ভয়। স্মিত হাসল স্পাইডার। তারপর চোখ বুজল। উঠে দাঁড়াল কিশোর। একদৃষ্টে চেয়ে রইল আঁধারের দিকে। মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে স্পাইডারের কথাগুলো। হঠাৎ সাইরেনের শব্দ। পুলিস। নিরাপদ বোধ করা উচিত ছিল কিশোরের। করল না। পালাবে ও। তীব্র গতিতে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল কিশোর।

নয়

একটা পাথুরে দেয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে কিশোর। শ্যাক থেকে পালিয়ে এসেছে অনেকক্ষণ আগে। ওর বাঁ দিকে গাছেরা জড়াজড়ি করে দাঁড়ানো। স্ট্যানলী পার্কে ঢোকার মুখে ওরা যেন একটা মোটা পর্দা টাঙিয়ে রেখেছে।

আকাশের দিকে চাইল কিশোর। মস্ত চাঁদ। রূপালী আলো ছড়াচ্ছে। মহাকাশচারীদের পদচিহ্ন রয়েছে ওখানে। তাঁরাও কি চাঁদে কিশোরের মত এতখানি নিঃসঙ্গ বোধ করেছিলেন? কেঁপে উঠল ও।

ঠাণ্ডা হাতজোড়া ঘষল কিশোর। আঙুল ফুটাল। পুবে লালের ছিটে। ভোর আসছে। এগোতে হবে ওকে।

পার্কের দিকে হাঁটতে শুরু করল ও। কাছেই একটা রাস্তা। লস্ট লেগুন নাম। ফোয়ারা রয়েছে। স্পটলাইটের আলোয় ঝিকমিক করছে পানি। পার্কের ভেতর দিয়ে যে রাস্তাটা লায়ন্স গেট ব্রিজের দিকে গিয়েছে সেটা এখন বন্ধ। রিসার্ফেসিং চলছে।

পার্কের ভেতর দিয়ে একা হেঁটে চলেছে কিশোর। চমকে উঠল হঠাৎ। কর্কশ স্বরে ডেকে উঠেছে একটা রাতজাগা পাখি। চারদিকে গাছ। শহরের আলো ঢোকেই না প্রায়। তারারাও ঢাকা পড়ে গেছে, গাছগুলোর উচ্চতার কারণে। চিড়িয়াখানা থেকে জীবজন্তুর নানা ধরনের চিৎকার কানে আসছে।

একটা মাঠ পেরোল কিশোর। চিড়িয়াখানার দিকে হাঁটছে ও। খাঁচাগুলো অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। খানিকটা সাহস ফিরে পেল ও।

টেলিফোন বুদটা কোথায়, মনে আছে ওর। দ্রুত এগোল ওদিকে। পকেট থেকে কাগজ বার করে নাম্বারটা ডায়াল করল। দেরি হলো সাড়া পেতে।

'হ্যালো, রাশ?' বলল কিশোর। 'এত রাতে বিরক্ত করতে বাধ্য হলাম। কিছু মনে করবেন না। আপনি একবার আসতে পারবেন?'

রাশকে সংক্ষেপে সব জানাল কিশোর। তারপর কোথায় আসতে হবে বলে দিল। এরপর শার্পকে ফোন করল ও। পুলিস ক্লাবে নিয়ে গিয়েছিলেন ভদ্রলোক। পাওয়া গেল না তাঁকে। ডিউটিতে রয়েছেন। শার্পের স্ত্রীকে জরুরী মেসেজ দিয়ে ফোন ছাড়ল কিশোর।

চিড়িয়াখানা পেছনে ফেলে লাম্বারমেন্স আর্চে চলে এল ও। এক লোক এখানেই কাঠবেড়ালীকে বাদাম খাওয়াচ্ছিল। চারদিক সাদা কুয়াশায় ছাওয়া। পেছনে সমুদ্রের খানিকটা অংশ এবং উত্তর ভ্যাঙ্কুভারের পাহাড়ের সারি।

সমুদ্রের নোনা গন্ধে ওর মনে পড়ে গেল আগের মিশনের কথা। রাজনকে নিয়ে এসেছিল সেবার। অজান্তেই হেঁটে চলল সমুদ্রের দিকে। পৌঁছল সি ওয়ালের কাছে। লায়ন্স গেট ব্রিজ এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। বিশাল স্তম্ভগুলোতে লাল আলোর ঝলকানি।

ব্রিজের দিকে পা বাড়াল কিশোর। বন্দরে এসে বাড়ি খাচ্ছে প্রবল স্রোত। বিশাল পাথরগুলো ধুয়ে যাচ্ছে নোনা পানিতে। ফুঁসছে সমুদ্র। ওপরে ওঠার রাস্তা খুঁজে পেয়ে খুশি হয়ে উঠল কিশোর।

উঠছে এখন কিশোর। মাঝেমধ্যে গাল ছুঁয়ে দিচ্ছে গাছের ডাল। পা পিছলে যাচ্ছে নুড়িতে। যাহোক, নিরাপদেই ওপরে উঠে এল ও। হাঁফ ধরে গেছে। ব্রিজের দিকে যে ফাঁকা রাস্তাটা গিয়েছে সেটাই ধরল ও। রাস্তার পাশে যন্ত্রপাতি দেখা যাচ্ছে, কেউ নেই। এসময় অবশ্য কর্মচারীদের থাকার কথাও নয়। দুটো সিংহ রাস্তা পাহারা দিচ্ছে। তবে ও দুটো পাথরের। নিষ্প্রাণ চোখে চেয়ে রয়েছে পার্কের দিকে।

আস্তে আস্তে ব্রিজের ওপর চলে এল কিশোর। বহু নীচে পানি। মাথাটা টলে উঠল ওর।

দ্রুত অন্যদিকে চোখ ফেরাল ও। পুবাকাশ রক্তিম হয়ে উঠছে। যে কোন মুহূর্তে সূর্য উঠবে। আচমকা মোটর সাইকেলের শব্দে সংবিৎ ফিরে পেল ও, পার্কের দিক থেকে আসছে শব্দটা। সূর্যটা উঠল ঠিক সে সময়ই। বন্দরের রাস্তাটা এখন কমলা রঙ ধারণ করেছে। কিশোর আবার চোখ ফেরাল পার্কের দিকে।

একটা মোটর সাইকেল স্পিড তুলে ব্রিজের দিকে আসছে। স্পষ্টতর হচ্ছে ওটার গর্জন। হার্লে ডেভিডসনটা ভেঙে দিয়েছে ভোরের নীরবতা। কিশোরের কাছে এসে ঘ্যাচ করে ব্রেক কষল রাশ।

'এসেছেন? খুব ভাল হলো,' খুশি খুশি গলায় বলল কিশোর। 'আপনাকে খুব দরকার ছিল।'

হেলমেট খুলে নিল রাশ। সূর্যের নরম আলোয় চকচক করছে ওর সোনালী চুলগুলো।

'সব খুলে বলো তো শুনি,' বলল রাশ।

সেই প্রথম থেকে তদন্তের সব কথা বর্ণনা করল কিশোর। কীভাবে ভিক্টরি স্কয়্যারে স্পাইডারের সঙ্গে পরিচয় হলো এবং এখন রেলওয়ে ইয়ার্ডে ওর আহত অবস্থায় পড়ে থাকার কথা জানাল। ওর সব কথা মন দিয়ে শুনল রাশ। ঘটনাগুলো বর্ণনা করার সময় নিজের কানকেই বিশ্বাস হতে চাইল না কিশোরের। সবই কি এত দ্রুত ঘটে গেছে?

'একটা ব্যাপার বুঝলাম না,' বলল রাশ। 'ব্রিজে দেখা করার কথা বললে কেন?'

'জায়গাটা নিরিবিলি,' বলল কিশোর।

মাথা ঝাঁকাল রাশ।

'স্পাইডারের বসকে ধরতে হবে,' বলল কিশোর। 'সেজন্যে আপনার সাহায্য চাই।'

'তুমি চেন তাকে?' জিজ্ঞেস করল রাশ। বিস্মিত। 'কে সে?'

'ইন্সপেক্টর বব।'

কিশোর ভেবেছিল আঁতকে উঠবে রাশ। কিন্তু তার বদলে ঠোঁটের কোণে হাসল ও। মাথা নাড়ল। 'শেষ পর্যন্ত পুলিস ইন্সপেক্টর?' বলল রাশ। 'তুমি বোধহয় ভুল করছ, কিশোর। কিন্তু ওঁর কথা কেন মনে হলো তোমার?'

'স্পাইডার বলেছিল ওর বস্ পুলিসের গোপন খবর পেয়ে যায়, হেডকোয়ার্টার থেকে,' বলল কিশোর। 'কাজটা ইন্সপেক্টরের জন্যে পানির মত সহজ, তাই না?'

'কিন্তু সেটা তো অন্য যে কোন পুলিস অফিসারের জন্যেও পানির মত।'

'তা ঠিক। তবে স্পাইডার বলেছে ওর বস্ নাকি চেনে আমাকে। আপনিই বলুন, এ শহরে কজন পুলিস অফিসারকে চিনি আমি?'

রাশের চেহারা থেকে সন্দেহের ছায়া মিলাতে দেখে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেল কিশোর।

'স্পাইডার আরও বলেছে ওর বস্ হাল মডেলের গাড়ি কিনতে চায়। জানেনই তো, ইন্সপেক্টরের একটা লক্কড় মার্কা গাড়ি আছে।'

হাসল রাশ। 'ইন্সপেক্টরের বিরুদ্ধে খুব খেপেছ তুমি। কিন্তু কোন প্রমাণ কি আছে?'

কী বলবে ভেবে পেল না কিশোর, ওকে জেলে পুরেছিলেন ইন্সপেক্টর। কিন্তু সেটা তো কোন প্রমাণ হলো না।

রাশের সঙ্গে হাঁটতে শুরু করল কিশোর। চলে এল ব্রিজের উল্টো দিকে। লাইটহাউজটা বহু নীচে। একবার তাকিয়েই চোখ সরাল কিশোর।

'গত বুধবার ইন্সপেক্টর বব আর কজন মেকানিকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল লাইটহাউজের কাছে। কী নাকি মেরামত করছিল তারা। আমি অবশ্য তাদের কথা বিশ্বাস করিনি।'

'কেন?'

রাশের দিকে চাইল কিশোর।

'সিক্রেট অভ দ্য কেভস পড়েছেন?'

'হার্ডি বয়েজদের গল্প? হ্যাঁ, পড়েছি। অনেক আগে।'

'ওই বইটাতে ছিল সাবমেরিনে করে গুপ্তচরদের আনা হচ্ছে তীরে। গুহার ভেতর থেকে অপারেশন চালায় তারা। আমার ধারণা, অমন একটা গুহা রয়েছে লাইটহাউজের নীচে। নোঙর করা জাহাজ থেকে ড্রাগ কালেক্ট করা হয়। তারপর আন্ডার ওয়াটার সি স্কুটারে করে নিয়ে আসা হয় লাইটহাউজের নীচে। ব্যস, এরপর শুধু স্পাইডার আর হ্যারীর মত লোকদের দরকার। ড্রাগ ডিস্ট্রিবিউট করার জন্যে।'

কিশোরের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে রাশ।

'সম্ভব?' জানতে চাইল সে।

'অবশ্যই সম্ভব। ইন্সপেক্টর বলেছিলেন হাঁটার পথে লাইটহাউজের কাছে থেমেছেন। কিন্তু সেদিনটা ছিল রবিবার। ওই দিনে কাজ করে কেউ?? আসলে তাঁর স্যাঙাৎরা ট্রাকে ড্রাগ তুলছিল।'

'হতেও পারে,' স্বীকার করল রাশ। 'তোমার কল্পনাশক্তির প্রশংসা করতে হয়।'

'থ্যাঙ্কস। আপনি আমাকে সাহায্য করবেন না? চলুন, লাইটহাউজে হানা দিই। তারপর প্রমাণ নিয়ে সোজা পুলিসের কাছে। ইন্সপেক্টরকে গ্রেফতার করা দরকার। নইলে আমাকে খুন করে ফেলবে।'

'খুন করবে? তোমাকে?'

'স্পাইডার বলেছে সেই পুলিস এজেন্টের মৃত্যুর পেছনে ওর বস আর হ্যারীর হাত ছিল। রেলওয়ে ইয়ার্ডে ও আমাকে বলেছে, আমার নাকি রক্ষা নেই।'

'তুমি ছেলেমানুষ। ড্রাগ চোরাচালানীরা তোমাকে পাত্তাই দেবে না। খামোকা ভয় পাচ্ছ।' গম্ভীর দেখাচ্ছে রাশকে। 'স্পাইডার না কি বললে ওই ছোকরা আসলে কথার রাজা। তোমাকে ভয় দেখাতে চেয়েছে, আর কিছু না।'

'কিন্তু ওকে তো অন্তত গ্রেপ্তার করানো উচিত।'

'জোরাল প্রমাণ পেয়েছ ওর বিরুদ্ধে?'

মাথা নাড়ল কিশোর, পায়নি। রাশ স্মিত হেসে চাপ দিল ওর কাঁধে।

'তুমি বুদ্ধিমান ছেলে। কিন্তু কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে হলে প্রমাণ চাই। প্রমাণ ছাড়া ভাল গোয়েন্দা হওয়া যায় না, কিশোর।'

'কিন্তু লাইটহাউজের ব্যাপারটাও কি আপনি উড়িয়ে দেবেন? আমি জানি, ওখানে কিছু না কিছু পাওয়া যাবেই।'

'চাইলেই তো আর ওখানে গায়ের জোরে ঢুকতে পারছি না। সার্চ ওয়ারেন্টও পাব বলে মনে হয় না।'

'হুঁ।' দমে গেছে কিশোর। তলানিতে এসে ঠেকেছে তার উদ্দীপনা। ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে মুখ। এত কিছু করে, এত ঝুঁকি নিয়ে কী লাভটা হলো? নিজেকে এ মুহূর্তে ওর খোঁড়া যুক্তির খোঁড়া গোয়েন্দা মনে হচ্ছে।

'এসো,' বলল রাশ। 'তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিই।'

ঘাড় কাত করে সম্মতি জানাল কিশোর। ঘুরল। রোদের তেজ বাড়ছে। রাতের অবসাদ কাটিয়ে আবার প্রাণবন্ত হয়ে উঠছে শহর। এই সুন্দর শহরে রিটার মত মেয়েরা ড্রাগের ছোবলে ধীরে ধীরে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। ওদের জন্যে কিছুই করতে পারল না কিশোর। ব্যর্থ সে, পুরোপুরি ব্যর্থ।

মোটর সাইকেলের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে রাশ। সেদিকে চোখ গেল কিশোরের। রিয়ারভিউ মিরর আর পেট্রল ট্যাঙ্কের ক্যাপে রোদ পড়ে চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে।

'একটা ব্যাপার বুঝলাম না,' বলল কিশোর।

'কোন্ ব্যাপার?

'স্পাইডারের বস্ ময়েশ্চার প্রুফ প্যাকেজে ড্রাগ রাখে। ক্যাপ খুলতে নাকি দেরি করে ফেলে মাঝেমধ্যে। সেজন্যে স্পাইডার খুব ভয় পায়।'

বিস্মিত দেখাচ্ছে রাশকে।

'কোন টুপি-মুপির কথা বলেছে হয়তো।'

'ইন্সপেক্টর ববের ইউনিফর্ম ক্যাপ নয়তো?'

'কে জানে?' শ্রাগ করে বলল রাশ। 'যাই চলো, পরে এ ব্যাপারে কথা বলা যাবে।'

'কিন্তু ময়েশ্চার প্রুফ প্যাকেজ কেন?' ব্রিজের ওপর দিয়ে সগর্জনে উড়ে গেল একটা সি প্লেন। 'বোধহয় বৃষ্টির পানি থেকে বাঁচানোর জন্যে। নাকি অন্য কোন ধরনের ক্যাপের কথা বলেছিল স্পাইডার?'

'জানি না,' হার্লে ডেভিডসনের স্যাডল ব্যাগটা খুলল রাশ। হাত পুরল ভেতরে। বিরক্ত দেখাচ্ছে তাকে। 'একস্ট্রা হেলমেট সঙ্গে নেই। তুমি বরং আমারটা পরে নাও।'

'আপনি পারবেন কী? ব্যাপারটা তো বেআইনী।'

'উপায় নেই। তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিই চলো। খুব ক্লান্তি লাগছে। ঘুমাতে হবে। সারারাত ঘুমাতে পারিনি।'

সায় জানাল কিশোর। হেলমেটের জন্যে মোটর সাইকেলের কাছে

পৌঁছল। এসময় পার্কের ছায়ায় নড়ে উঠল কী যেন। দ্রুত পায়ে এক লোক ব্রিজের দিকে হাঁটছে। হ্যারী।

হ্যারীর কুৎসিত চেহারাটা মনে পড়তেই ঠাণ্ডা হয়ে এল কিশোরের হাত-পা। লুকানোর জায়গা খুঁজতে লাগল ও। ব্রিজের স্তম্ভগুলোর দিকে এক পা বাড়ল। কিন্তু হ্যারী পিস্তল তুলতেই জমে যেতে হলো।

'কী হচ্ছে এসব?' জানতে চাইল রাশ। চোখ পিস্তলে।

রাশকে উপেক্ষা করল হ্যারী। ঠাণ্ডা চোখ দুটো কিশোরের ওপর স্থির। একপা দুপা করে এগিয়ে আসছে।

'বহুত জ্বালিয়েছ, ছোকরা,' দাঁতের ফাঁকে বলল হ্যারী। 'এখন যাবে কোথায়? মরবে।'

'ওকে যেতে দাও,' ক্রুদ্ধস্বরে বলল রাশ।

'তুমি চুপ থাকো, এই বিচ্ছুটা তোমার ক্যাপ খুলতে গিয়েছিল, তুমি বাধা দাওনি।'

'ও হেলমেট নিয়েছে। ক্যাপে হাত দেয়নি।'

বিদ্যুতের চমক খেলে গেল কিশোরের শরীরে। চমকে রাশের দিকে চাইল ও। তারপর ঘুরেই ব্রিজের রেলিং-এর দিকে ছুটল। রেলিং টপকে ছোট্ট একটা প্ল্যাটফর্মে নেমে এল। আঁকড়ে ধরেছে ইস্পাতের মই।

'দাঁড়াও, কিশোর,' চেঁচাল রাশ।

কিশোর ওর কথা গায়ে মাখল না। একটা স্তম্ভের পাশ দিয়ে নামতে শুরু করেছে নীচে, মই বেয়ে। প্ল্যাটফর্মে পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। হ্যারীর বোঁচা চেহারাটা দেখতে পেল ও। পিস্তলটা তাক করেছে ওর দিকে। কিন্তু ট্রিগার টেপার আগেই ব্যথায় বিকৃত হয়ে গেল বদমাশটার মুখ।

রাশ প্রচণ্ড বাড়ি মেরেছে হ্যারীর পিস্তল ধরা হাতে। দুজনের লড়াই চলছে এখন ছোট্ট প্ল্যাটফর্মটায়। মই আঁকড়ে রইল কিশোর। ইস্পাতের প্ল্যাটফর্মে ওদের জুতোর শব্দ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। মাঝেমধ্যে ক্ষণিকের জন্যে দেখাও যাচ্ছে দুজনকে। মন থেকে ভয় তাড়াতে চেষ্টা করল কিশোর।

উপর দিক থেকে চিৎকার এল এসময়। চাইল কিশোর। আতঙ্কে চোখ ঠিকরে বেরুচ্ছে হ্যারীর। প্ল্যাটফর্ম থেকে পড়ে যাচ্ছে নীচে। গা হিম করা চিৎকারটা শোনা গেল ক মুহূর্ত। তারপর সব চুপ।

চোখ বুজল কিশোর। যতটা সম্ভব শক্ত হাতে ধরে রেখেছে মই। ভুলতে চাইছে হ্যারীর পতনের দৃশ্যটা। উপর দিকে চাইল ও। প্ল্যাটফর্ম থেকে

ঝুঁকেছে রাশ।

'উঠে এসো, কিশোর,' বলল ও। 'কোন ভয় নেই।'

'না।'

কিশোরের দিকে কড়া চোখে চাইল রাশ। তারপর নামতে শুরু করল রাশ নামছে। ওদিকে আতঙ্ক গ্রাস করছে কিশোরকে। আরও খানিকটা নীচে নেমে এল কিশোর। পা ঠেকেছে একটা ক্রস বিমে। বিমটা চলে গেছে এক কোণে। বহু নীচে সমুদ্র। পানিতে রোদ পড়ে ঝকমক করছে।

'নীচের দিকে তাকিয়ো না!' উপদেশ দিল রাশ। বাতাসের প্রচণ্ড দাপটে ভাল করে শোনা গেল না ওর কথা। 'ওপরে উঠে এসো।'

'না।'

'ভয় পেয়ো না। চেষ্টা করো। পারবে।'

'আগে স্বীকার করুন আপনিই স্পাইডারের বস!'

'কী বললে?' নিজের কানকেই যেন বিশ্বাস হচ্ছে না রাশের।

'দোষ স্বীকার করুন। তারপর আমি উঠব।' দীর্ঘক্ষণ একটানা কিশোরের দিকে চেয়ে রইল রাশ।

'কী সব আবোল তাবোল বকছ!'

'ঠিকই বলছি।'

চেয়েই রইল রাশ। বিম ধরে কোণের দিকে দু পা এগোল কিশোর।

'যেয়ো না!' চিৎকার করল রাশ। 'তোমার যা ইচ্ছে বলো, তবু নীচে যেয়ো না।'

মইয়ে মাথা ঠেকাল কিশোর। ওপরে নীল আকাশ। চাচা-চাচী, মুসা রবিনের কথা বড্ড মনে পড়ছে ওর। ওদের সঙ্গে দেখা কি হবে আবারও? নাকি আজই ওর জীবনের শেষ দিন? ওর কিছু হলে মামা-মামী মুখ দেখাবেন কেমন করে?

মাথার ওপর দিয়ে একটা সিগাল ভেসে গেল। কী পরম নিশ্চিন্ত ওটা! উচ্চতা কোন ব্যাপারই নয় ওটার কাছে। নীচের দিকে চোখ টানছে কিশোরের। অতিকষ্টে সামাল দিল। ঘাড় উঁচু করে চাইল রাশের দিকে।

'আপনার সানগ্লাসটা দেখান!'

'বেশ, দেখাচ্ছি। যা বলবে সবই দেখাব।' এক হাতে শক্ত করে মই ধরে অন্য হাতটা জ্যাকেটের পকেটে ঢোকাল রাশ। রূপালী ফ্রেমওয়ালা একটা সানগ্লাস এক ঝলকের জন্যে দেখে ফেলল কিশোর। হঠাৎ রাশের হাত ফসকে সানগ্লাসটা পড়ে গেল নীচে। কিশোরের কাঁধে বাড়ি খেয়ে যত্র

করল অজানার উদ্দেশে।

'সরি, কিশোর,' চেঁচাল রাশ। 'তুমি ভয় পাওনি তো?'

রাশের দিকে চাইল কিশোর।

'একটা মাত্র লেন্স দেখলাম। তারমানে আপনিই স্পাইডারের বস্। আর কোন প্রমাণের দরকার নেই।'

'তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আমি ওপরে উঠছি। আমাকে ফলো করো।' কয়েক ধাপ উঠে গেল রাশ। 'উঠতে তোমাকে হবেই। সারাজীবন ওভাবে থাকবে নাকি?'

লোকটা কেটে পড়ছে? হতেও পারে। ধরা তো পড়েই গেছে। লম্বা শ্বাস টানল কিশোর। উঠছে।

'এই তো, উঠে এসো। কোন ভয় নেই।'

এসময় শার্পের মুখটা উঁকি মারল মইয়ের আগা থেকে। এঁর কথা ভুলেই গিয়েছিল কিশোর। স্ত্রীর কাছ থেকে খবর পেয়ে ঠিকই চলে এসেছেন। অনেকখানি ভরসা ফিরে পেল কিশোর।

'মিস্টার শার্প!' চিৎকার করে উঠল ও। 'হেলপ মি।'

'আমি আছি, শার্প,' পাল্টা চেঁচাল রাশ। 'ওকে ধাপে ধাপে উপরে নিয়ে আসছি।'

'মিস্টার শার্প!' আবার চিৎকার করল কিশোর। 'রাশের মোটরসাইকেলের পেট্রল ট্যাঙ্কের ক্যাপটা খুলুন। ভেতরে জিনিস পাবেন।'

কিশোরের দিকে চকিতে চাইল রাশ। আতঙ্কিত। তারপর মাথা নাড়ল শার্পের উদ্দেশে।

'ওর কথায় কান দিয়ো না। ওর মাথার ঠিক নেই।'

'প্লীজ, মিস্টার শার্প!'

অদৃশ্য হয়ে গেলেন শার্প। আরও একধাপ উঠল রাশ। তারপর যেন বদলে ফেলল মন। নামছে এবার। কিশোরের দিকে।

বেপরোয়া হয়ে উঠল কিশোর। দ্রুত নামতে চাইল নীচে। হঠাৎ ফসকে গেল পা। বিদ্যুৎ প্রবাহ বয়ে গেল ওর সারা শরীর বেয়ে। ঝুলছে। সর্বশক্তি দিয়ে আঁকড়ে রেখেছে মই। চোখ বুজে গেছে ভয়ে। যে-কোন মুহূর্তে ধাক্কা দিয়ে ওকে নীচে ফেলে দেবে রাশ।

'রাশ!'

ওপর থেকে ডাকছেন শার্প। চোখ খুলল না কিশোর। মাথায় কেবল একটাই চিন্তা। মই ধরে থাকতে হবে, শক্ত করে।

'থামো, রাশ!' আদেশ করলেন শার্প।

দীর্ঘ নীরবতা। সিগালের ডাকে সংবিৎ ফিরল কিশোরের। মাথা তুলল ও। ঠিক ওপরেই রাশ। ইস্পাতের প্ল্যাটফর্মের ওপর থেকে ঝুঁকে পড়েছেন শার্প। রিভলভার তাক করা, রাশের দিকে।

'উঠে এসো, রাশ!' বললেন শার্প। 'ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট।'

'ছেলেটাকে নিয়ে আসছি।'

'ওর কাছ থেকে সরে যাও, ও একাই উঠতে পারবে।'

অদ্ভুত চোখে কিশোরের দিকে তাকাল রাশ। তারপর ধীরে ধীরে উঠতে লাগল ওপরে। কিশোরের বিপদ কাটেনি এখনও। ওকে সাহায্য করারও কেউ নেই।

'নীচে তাকানো চলবে না,' নিজেকেই ফিসফিসিয়ে বলল ও। ডান হাত বাড়াল ওপরের ধাপটায়। ঘামে ভিজে রয়েছে হাত, পিছলে গেল ইস্পাতে. চোখ বুজে সাহস সঞ্চয়ের চেষ্টা করছে ও।

'জলদি উঠে এসো!' শার্পের গলা শুনে চমকে উঠল কিশোর। মুহূর্তের জন্যে ভুলে গেল ভীতি। ইস্পাত চেপে ধরে এক ধাপ উঠল। বাতাসের ঝাপটার কারণে থামতে হলো। সাইরেনের শব্দ। কোথা থেকে আসছে কে জানে। হাতের শক্তি দ্রুত ফুরাচ্ছে ওর।

'ওঠো!'

বুক ভরে দম নিল কিশোর। উঠল এক ধাপ।

'আর সামান্য একটু!'

বাতাস বড্ড শত্রুতা আরম্ভ করেছে। ছুঁড়ে ফেলে দিতে চাইছে কিশোরকে। মাঝেমধ্যে সিগালরাও বিপত্তি ঘটাচ্ছে। ওদের ডাকে চমকে উঠছে কিশোর।

সাইরেনের শব্দ এখন জোরদার। ব্রিজের ওপর দিয়ে সশব্দে উড়ে গেল আরেকটা সি প্লেন। পৃথিবীর সবাই কি ওর পেছনে লেগেছে নাকি? কেউ কি চায় না কিশোর বেঁচে থাকুক?

'পেরেই তো গেছ!'

শার্পের কণ্ঠ সাহস জোগাল কিশোরকে। আত্মবিশ্বাস ফিরে পাচ্ছে ও। পারবে, ওকে পারতেই হবে। আরও দু ধাপ উঠে গেল ও। শার্পের কণ্ঠ এখন আরও স্পষ্ট।

'সাব্বাস, কিশোর। এবার প্ল্যাটফর্মে উঠে এসো।'

শরীরের শেষ শক্তিটুকু একত্রিত করে উঠতে লাগল কিশোর। শক্ত

দুটো হাত চেপে ধরেছে দু কাঁধ। তারপর কীভাবে যেন প্ল্যাটফর্মে উঠে পড়ল কিশোর। নিজেকে শুয়ে থাকতে দেখল ও। শরীরের কাঁপুনি থামতে চাইছে না কিছুতেই।

'আর ভয় নেই। তুমি এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ,' শান্তস্বরে বললেন শার্প।

ধীরে ধীরে কাঁপুনি কমে এল কিশোরের। প্রচণ্ড অবসাদ অনুভব করছে। অতিকষ্টে উঠে দাঁড়াল ও। রেলিং-এর ওপর দিয়ে গলা বাড়াল।

সব কিছুই অন্য রকম লাগছে। ব্রিজে একটা পুলিস কার দেখতে পেল। ইমার্জেন্সি লাইট ঘুরছে, জ্বলছে। রাশ ভেতরে বসা। দুপাশে গার্ড। দুজন অফিসার দাঁড়ানো রাশের মোটর সাইকেলটার পাশে। একজনের হাতে পেট্রল ট্যাঙ্কের ক্যাপ। ক্যাপটার নীচ দিক থেকে একটা প্লাস্টিকের টিউব ঝুলছে। ওটার ভেতরে বেশ কয়েকটা প্যাকেট।

কিশোর পুলিস কারের কাছে পৌঁছলে চোখাচোখি হলো রাশের সঙ্গে। ওকে দেখে মাথা নাড়ল রাশ।

'ভুলটা আমারই,' বলল ও।

'কোন ব্যাপারে?' জানতে চাইল কিশোর। লোকটার প্রতি ভীতি এখনও কাটেনি ওর।

'স্পাইডার শ্যাকে তোমার ব্যাপারে সতর্ক করেছিল। আমি হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলাম ওর কথা। এখন বুঝতে পারছি, ও ঠিকই বলেছিল।'

রাশের নীল চোখজোড়া দেখছে কিশোরকে।

'তবে শেষপর্যন্ত তোমাকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছি আমি। তোমার টেলিফোন পাওয়ার পর হ্যারী রেগে গিয়েছিল। চাপাচাপি করছিল যাতে তোমার কাছ থেকে সব কথা আদায় করি। টর্চার করতেও পিছপা হত না ও, কিন্তু আমিই ওকে ব্রিজের গোড়ায় দাঁড় করিয়ে রেখে তোমার কাছে এসেছিলাম। চেয়েছিলাম হ্যারী কোন ক্ষতি করার আগেই তোমাকে পার করে দেব।'

রাশের চেহারা দেখে কিশোর বুঝতে পারল না, কথাগুলো সত্যি কিনা। অবশ্য বোঝার কোন দরকারও নেই। রাশ স্মাগলার, ক্রিমিনাল। তার শাস্তি হবে, ব্যস। এমনিতেই প্রচণ্ড শারীরিক এবং মানসিক চাপ গেছে ওর ওপর দিয়ে। কোন কিছুই এখন আর মাথায় ঢুকছে না। বিশ্রাম দরকার। দরকার প্রচুর ঘুম। ঘুরে হাঁটতে লাগল কিশোর। যত দ্রুত সম্ভব পৌঁছুতে হবে মামার বাড়ি।

দশ

পরবর্তী ক'দিন ব্যস্ততার মধ্যে কাটল কিশোরের। রিপোর্টার, পুলিস ইনভেস্টিগেটররা প্রশ্নবাণে জর্জরিত করল ওকে। কাগজে ফলাও করে বাঙালী ছেলের সাহসিকতার কাহিনি প্রচার করা হলো।

রাশ তো ধরা পড়েছেই, স্পাইডারও পার পায়নি। দুজনই এখন শ্রীঘরে। মারা গেছে হ্যারী।

মামা-মামী ঠিক করলেন পিকনিকে যাবেন। ডবল জেডকেও দাওয়াত দিতে বললেন তাঁরা। কিন্তু কিশোর শাংহাই অ্যালিতে গিয়ে পেল না ওকে। চলে গেছে রেডিয়াম হট স্প্রিঙ-এ। আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে দেখা করতে।

স্ট্যানলী পার্কের পছন্দসই এক জায়গায় আসর জমিয়ে বসল ওরা। ওদের সঙ্গে রায়হান সাহেব এবং তাঁর স্ত্রীও এসেছেন। ভদ্রলোক মামার বন্ধু। কানাডাতেই থাকেন।

কপাল ভাল, এখান থেকে লায়ন্স গেট ব্রিজে দেখা যায় না। ফলে কিশোর মনের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ ফ্রী। এ মুহূর্তে সে আর রবিন গর্ত থেকে হঠাৎ বেরিয়ে আসা একটা খরগোশকে ধাওয়া করছে। কিছুতেই ধরা দিতে চাইছে না ওটা। এরাও নাছোড়বান্দা।

'খেতে এসো,' ডাকলেন মামী, শতরঞ্চি পেতে বসেছেন তাঁরা। তাঁদের ঠিক পেছনেই সিওয়াল আর পার্কের মহীরুহগুলো।

খরগোশটাকে ধরার জন্যে শেষবার চেষ্টা করল কিশোর। ওর হাত এড়িয়ে সমুদ্রের দিকে পাড়ি জমাল ওটা।

শতরঞ্চির ওপর হটডগ, বিফবার্গার, স্যান্ডউইচ আর টিকিয়ার প্লেট। টিকিয়াগুলো মামী বানিয়েছেন। কিশোরের খুব পছন্দের আইটেম।

'আর কিছু নেই?' বসে পড়ে জানতে চাইল মুসা। খানিকটা হতাশ।

হাসলেন মামা।

'আছে। পরে পাবে।'

বন্দরে মাছ ধরা নৌকা ভিড়ছে। মাস্তুলে রশি জড়ানো, বিশাল জালটা পড়ে রয়েছে পাটাতনে। একটা হেরন নেমে এল পানির কাছাকাছি। আবিষ্ট হয়ে পড়েছে কিশোর।

'শোনো তো, কিশোর,' রায়হান সাহেবের ডাকে চমকাল ও।

'বলুন, আঙ্কেল।'

'তোমরা যখন খরগোশের পেছনে ছুটছিলে তখন আমরা ড্রাগ কেসটার ব্যাপারে আলাপ করছিলাম। আচ্ছা, ব্রিজে উঠেই কি তুমি বুঝতে পারলে যে রাশ স্পাইডারের বস?'

'আসলে হঠাৎ মনে পড়ে গেল রাশের মোটর সাইকেলে ফিউয়েল ক্যাপ আছে। ওটার নীচে সহজেই ময়েশ্চার প্রুফ প্যাকেজগুলো রাখা সম্ভব। ভিজে যাওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না। তা ছাড়া শ্যাকের মেঝেতে সিগারেটের টুকরো পড়ে ছিল।'

'তাতেই বুঝে ফেললে?'

'রাশ যে ব্র্যান্ডের সিগারেট খায় টুকরোগুলো সেই ব্র্যান্ডেরই। ভাঙা একটা লেন্সও পেয়েছিলাম। অমন সানগ্লাস শুধু রাশকেই ব্যবহার করতে দেখেছি। সম্ভবত স্পাইডারকে মারধর করার সময় ভেঙে গিয়েছিল জিনিসটা।'

'আর একটা টিকিয়া নেবে?' জিজ্ঞেস করলেন মামী।

'এখন না, মামী। পরে,' বলে চলল কিশোর, 'জানা ছিল টাকার জন্যে পুলিসের চাকরি ছেড়েছে রাশ। কিন্তু ও যে ড্রাগ বেচে টাকা বানাতে চায় সেটা প্রথমে বুঝিনি। রিটা নামে এক মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমাদের, পেট্রল পাম্পে। রাশ বলেছিল মেয়েটি ওর মক্কেল। আমি ভেবেছিলাম মেয়েটিকে বুঝি সাহায্য করতে চায় ও, ড্রাগের নেশা থেকে ফেরাতে চায়। পরে বুঝলাম ওসব কিছু নয়। ওই মেয়ের কাছে ড্রাগ বেচে রাশ।'

'আরেকটা খটকা আছে,' বললেন মিসেস রায়হান। 'রাশ পুলিসের গোপন খবর পেত কীভাবে?'

'ও তো পুলিস ক্লাবে নিয়মিত যেত। অফিসারদের অনেকেই ওর বন্ধু। খুব সহজেই ইনফর্মেশন পেয়ে যেত ও। গল্প করতে বসলে কত কথাই তো আসে।'

'তা ঠিক।'

'তবে স্পাইডারের একটা কথায় ধোঁকা খেয়ে গিয়েছিলাম।'

'কী কথা?' জানতে চাইলেন মামী।

'ও বলেছিল ওর বসের উচিত ভাল দেখে নতুন মডেলের একটা গাড়ি কেনা।'

'মানে?' প্রশ্ন করলেন মামা।

'ও আসলে রাশের কথাই বলেছিল। কিন্তু আমি ভুল বুঝেছিলাম। সন্দেহ করেছিলাম অন্য একজনকে।'

'কী রকম?'

মুখ খুলতে যাবে কিশোর এমন সময় পরিচিত একজনকে দেখে চেপে গেল ও। সিওয়ালের পাশ দিয়ে হেঁটে আসছেন ভদ্রলোক। ইন্সপেক্টর বব। 'ভদ্রলোক কি আর আসার সময় পেলেন না?' আপন মনে বিড়বিড় করল কিশোর।

ইন্সপেক্টর হাঁটতে বেরিয়েছেন। পরনে ট্র্যাকসুট।

'হ্যাল্লো, ইন্সপেক্টর,' উঠে দাঁড়িয়ে হাত দেখালেন মামা। 'এদিকে আসুন।'

বালি মাড়িয়ে ধীরপায়ে এগিয়ে এলেন ইন্সপেক্টর। 'গুড আফটারনুন,' বললেন ভদ্রলোক। বসে পড়লেন শতরঞ্চির এক কোণে। রুমাল বার করে ঘর্মাক্ত মুখ মুছলেন। তাঁকে পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো রায়হান সাহেব এবং তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে।

'এদেরকে মনে আছে নিশ্চয়ই?' তিন গোয়েন্দা আর রাজনকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন মামা।

'থাকবে না আবার?' পাল্টা বললেন ইন্সপেক্টর। 'ওদের জন্যেই তো এসেছি আমি।'

'আবার জেলে পুরবেন না তো?' কিশোরের কণ্ঠে ভয়।

'না,' মৃদু হেসে বললেন ইন্সপেক্টর। 'আমি আসলে কিশোরকে ধন্যবাদ জানাতে এবং ক্ষমা চাইতে এসেছি। ও আমাদের বিরাট উপকার করেছে–সেজন্যে ধন্যবাদ। আর ওকে জেলে ঢোকানো ঠিক হয়নি–সেজন্যে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।'

'কিন্তু এখন ওর সাহস অনেক বেড়ে গেছে। চাইলে বছর কয়েক ওকে কয়েদীদের সঙ্গে রেখে দিতে পারেন। ও ভয় পাবে না। কী বলো, কিশোর?' ভ্রূ নাচিয়ে জানতে চাইল মুসা।

'পাগল?' চোখ পাকিয়ে ধমক লাগাল কিশোর।

'আমার ওপর থেকে রাগ গেছে তো?' নরম কণ্ঠে কিশোরকে জিজ্ঞেস করলেন ইন্সপেক্টর।

'অবশ্যই। তা ছাড়া আমি নিজেও আপনার সম্পর্কে ভুল ধারণা করেছিলাম।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ,' বলল কিশোর। লাইটহাউজের কাছে ইন্সপেক্টরের দেখা পেয়ে কী মনে হয়েছিল সেটা বলবে কিনা ভাবল ও। সবাই চুপ, অপেক্ষা করছে ওর জবাব শোনার জন্যে।

'আমি ভেবেছিলাম আপনি মিথ্যা বলেছেন। হাঁটতে বেরিয়েছেন, কথাটা বিশ্বাস হচ্ছিল না।'

হাসলেন ইন্সপেক্টর।

'আমার দেহখানি তো দেখছ,' বললেন তিনি, 'না হেঁটে উপায় আছে, বলো?'

'মামা, আপনি না বলেছিলেন আরও কী একটা আইটেম আছে, পরে দেবেন। কই?' এসব আলোচনায় মন বসছে না মুসার। ওর কেবল পেট পুজোর চিন্তা।

'শীঘ্রই আসিতেছে,' হায়দার সাহেবের হয়ে জবাব দিলেন ইন্সপেক্টর। আঙুল দেখালেন একটা অগ্রসরমান শরীরের দিকে। পার্কের ভেতর দিয়ে হেঁটে আসছে লোকটা।

'ঠিক সময়মত এসেছে!' খুশি খুশি শোনাল ইন্সপেক্টরের গলা।

'আরে, মিস্টার শার্প!' বলে উঠল কিশোর। এগোচ্ছেন ভদ্রলোক। হাতে বাক্স।

'জিনিসটা খুব ঠাণ্ডা, ইন্সপেক্টর,' কাছে এসে বললেন শার্প। বুড়ো আঙুল দেখালেন কিশোরকে। নামিয়ে রাখলেন বাক্সটা।

'আইসক্রীম তো ঠাণ্ডাই হয়,' বললেন ইন্সপেক্টর। তিন গোয়েন্দা আর রাজনের অবাক হওয়ার পালা। 'তোমাদের জন্যে ভ্যাঙ্কুভার সিটি পুলিসের ছোট্ট উপহার।'

'দারুণ!' আনন্দে বলে উঠল মুসা। 'কোন্ ফ্লেভার?'

'স্পেশাল। সারা শহর খুঁজে তবে পেয়েছি।' বাক্সটা খুললেন ইন্সপেক্টর। বেরিয়ে পড়ল উজ্জ্বল নীল রঙা আইসক্রীম।

'তোমার মামার কাছ থেকে জেনে নিয়েছি, আইসক্রীম তোমার খুব প্রিয়,' বললেন ইন্সপেক্টর।

'হ্যাঁ,' বলল কিশোর। সম্পূর্ণ সন্দেহমুক্ত হতে পারছে না। চামচ দিয়ে খানিকটা তুলে মুখে দিল। এবার হাসল কান পর্যন্ত। 'অসংখ্য ধন্যবাদ,' ইন্সপেক্টরকে বলল ও।

মুসা অবশ্য ততক্ষণে হামলা চালিয়েছে বাক্সের ওপর।

আইসক্রীম খেয়ে বালিতে চিত হলো কিশোর, মুসা, রবিন আর রাজন।

পরিতৃপ্ত। খানিক বাদে উঠে বসল কিশোর। চাইল সমুদ্রের দিকে। একটা ফ্রেইটার। ঢেউয়ের দোলায় এগিয়ে চলেছে ম্লান হয়ে আসা সূর্যটার দিকে।

'এস. আর. গারু নাকি?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'না,' জবাব দিলেন ইন্সপেক্টর। 'ক্যাপ্টেন তানিমোটো ক'দিন আগেই চলে গেছেন।'

'যারা কানাডায় ড্রাগ পাচার করছে তাদের কোন হদিস পেলেন?'

'স্মাগলারদের পিছনে আসলে লাগিনি আমরা,' বললেন ইন্সপেক্টর। 'লেগেছিলাম ইলিগ্যাল ইমিগ্রেন্টদের বিরুদ্ধে। সে ব্যাপারে বেশ অনেকদূরই এগিয়েছি। গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও পেয়েছি।'

'ভেবেছিলাম পুরো দঙ্গলটাকেই ধরিয়ে দেব,' দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল কিশোর। 'পারলাম না।'

'রাশ আর স্পাইডারকে ধরতে পারায় বিরাট উপকার হয়েছে। ওদের কাছ থেকে খোঁজ জেনে আজ সকালেই আরও ক'জনকে গ্রেপ্তার করেছি। সবই কিন্তু তোমার কৃতিত্ব, ইয়াং ম্যান। তবে একটা কথা মনে রাখবে, তুমি বড় বেশি ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছিলে। শার্প যদি তখন সময়মত না যেত তবে? মামা-মামী তোমার চাচা-চাচীকে কী জবাব দিতেন?'

মাথা নিচু করে রইল কিশোর।

এসময় পরিস্থিতিটাকে হালকা করার জন্য কিশোরের পকেট থেকে একটানে রুমাল বার করে আনল রাজন। রুমালটা নাড়ল ও।

'এটা রেখে দেব আমি,' বলল ও, 'তোর চিহ্ন হিসেবে। তুই তো চলে যাবি রকি বীচে। রুমালটা আমি বন্ধুদের দেখাব। বলব, আমার ভাই গোয়েন্দা কিশোরের জিনিস এটা। ড্রাগ পাচারকারীদের ধরিয়ে দিয়েছিল সে। ওরা শুনবে, আর গর্বে বুকটা ফুলে উঠবে আমার।'

***

অনীশ দাস অপুর লেখা 'ভয়ঙ্করের হাতছানি' বইটি তিন গোয়েন্দার পাঠক-পাঠিকাদের জন্য 'গুপ্তধনের নকশা' নামে রূপান্তর করেছেন শামসুদ্দীন নওয়াব।

গুপ্তধনের নকশা

প্রথম প্রকাশ: ২০০৮

এক

সোনারঙের সূর্যের আলো ঝলমল করছে কেনটাকির গ্রামাঞ্চলে, ছুঁয়ে যাচ্ছে দিগন্ত বিস্তৃত তৃণভূমি, ঢেউ খেলানো পাহাড়চুড়ো আর গাছ-গাছালি। চার্লি পেকার, দীর্ঘকায় এক নিগ্রো, লম্বা পা ফেলে দৌড়ে চলেছে খোলা এক মাঠ দিয়ে। দৌড়াতে দৌড়াতে পেছন ফিরে একবার দেখল সে। তারপর একটা বেড়ার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। ওটার গায়ে হেলান দিয়ে হাঁপাতে লাগল চার্লি। তার কালো মুখে রাজ্যের শঙ্কা, কপালে কয়েকটা ভাঁজ ফেলে তাকাল সামনের দিকে। ধুলোমাখা রাস্তাটার মাথায় একটি বাড়ি। বাড়িটি এককালে 'প্ল্যান্টেশন হাউস' নামে বিখ্যাত ছিল। এখন আর ওটার আগের জৌলুস নেই। খোলা হাওয়া বাড়িটির ওপর যথেচ্ছ অত্যাচার চালিয়েছে দেখেই বোঝা যায়। জীর্ণ, দৈন্য চেহারাটা ঢাকতে ওটার ওপর বেশ কয়েক প্রলেপ রঙ চড়াতে হবে। সামনের লনে যে একসময় প্রচুর ফুল ফুটত এখন আর তা দেখে ঠাওর করা সম্ভব নয়। যত্নের অভাবে বাগানটির অবস্থা সঙ্গীন, এখানে ওখানে নিজেদের ইচ্ছেমত বেড়ে উঠেছে আগাছা। দূরে, ধুলোর একটা ছোট মেঘ দেখে আতঙ্কিত হয়ে উঠল চার্লি। কেউ আসছে! তাড়াতাড়ি বেড়া টপকে একটা গাছের আড়ালে আত্মগোপন করল সে।

ছোট একটি অভিজাত এক্কা গাড়ি এসে থামল 'গ্র্যাসি' নামের বাড়িটির সামনে। পুরানো অনেক প্রথাই রয়ে গেছে এই বাড়িটিতে। ঘোড়ার গাড়িও তার মধ্যে একটি। মধ্যবয়স্কা দুই নারী নামতে যাচ্ছেন গাড়ি থেকে, যেন ভোজবাজির মত এক কিশোর হাজির হলো তাদের সামনে। হাত বাড়িয়ে দিল সে ফুফুদের দিকে, নামতে সাহায্য করল। পোশাক থেকে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে দু'জনেই নেমে এলেন গাড়ি থেকে। অপেক্ষাকৃত বয়স্কজন, শেরী, কর্তৃত্বের সুরে ছেলেটিকে বললেন, 'র‍্যালফ, বেবকে মাঠে নেয়ার আগে তোমার কাপড় পাল্টে নাও।'

একা গাড়ির সঙ্গে জোতা বেব কেশর নাড়িয়ে চিঁহিঁহিঁ করে উঠল। র‍্যালফ আদর করে ওর মখমল নাকে হাত বোলাতে লাগল। কিন্তু সামনের দৃশ্যটা ওর মনোযোগ কেড়ে নিল। দু'জন ঘোড়সওয়ার ছুটে আসছে ওদের বাড়ির দিকে।

মেরী ফুফু বিস্মিত হয়ে বললেন, 'ওরা আবার কারা?'

চার্লি গাছের আড়ালে আরও সেঁধিয়ে গেল, চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠল ভয়ে। তাকে ওই লোক দুটোর হাত থেকে বাঁচতে হবে। ওদের একজন, যদিও নিজেকে আইনের লোক বলে মনে করে, আসলে সে তা নয়।

ঘোড়ার লাগাম এক হাতে সামলে অন্য হাতে হ্যাট খুলে ভদ্রমহিলাদের প্রতি মাথা নুইয়ে সম্মান জানাল শেরিফ স্টিফেন। তার সঙ্গী মি. হোলারের ঘর্মাক্ত মুখ অন্ধকার, দেখে মনে হয় খুব বদমেজাজী—আর বন্ধুবৎসল তো নয়ই। লোকটা সন্দিগ্ধ চোখে একবার র‍্যালফ আর তার দুই ফুফুর দিকে চাইল, তারপর বাড়িটির ওপর নজর বোলাল।

ওদের দিকে তাকিয়ে হাসল শেরিফ। বলল, 'মিস শেরী, মিস মেরী···র‍্যালফ!' জ্যাকেটের আস্তিন দিয়ে মাথা মুছল সে। 'আবার গা পোড়ানো গরম পড়তে যাচ্ছে।'

তীক্ষ্ণ গলায় শেরী বললেন, 'অতদূর থেকে এই গরমের মধ্যে আপনি কি কথা বলতে এসেছেন তা আমরা ভাল করেই জানি, শেরিফ স্টিফেন।'

শেরিফের চোখ বিশাল বাড়িটির চারদিকে একবার দ্রুত ঘুরে এল। ওটার সাদা পোর্টিকো, ম্যাগনোলিয়ার সারি, লম্বা বারান্দা তার কাছে লোভনীয় ঠেকল। অর্থপূর্ণ গলায় সে বলল, 'আমাকে সামনের বার আর এত পথ পাড়ি দিতে হবে না,' শেরী ফুফুর ঋজু শরীর হঠাৎই যেন শক্ত হয়ে গেল, র‍্যালফকে বিস্মিত দেখাল। মেরী ফুফু ঘুরে দাঁড়ালেন, তাঁর মুখে বিষাদের একটা ছায়া মুহূর্তের জন্য ছুঁয়ে গেল। শেরিফ তার কথা শেষ করল, 'আমরা আপনাদের ওই নিগ্রো চাকরটা, চার্লি পেকারকে খুঁজতে এসেছি।'

চার্লি সব কথাই শুনতে পাচ্ছে। টের পাচ্ছে পাঁজরের গায়ে হৃৎপিণ্ডটা ধড়াশ ধড়াশ বাড়ি খাচ্ছে।

মেরী ফুফু তাঁর সুন্দর বাঁকানো ভ্রূ কপালে তুলে বিস্মিত হয়ে বললেন, 'কেন, ক্যাপ্টেন রজারসের সঙ্গে যুদ্ধে যাবার পর থেকে চার্লি তো আর এদিকে আসেইনি।'

র‍্যালফ ধুলোতে জুতোর ডগা দিয়ে নকশা আঁকতে আঁকতে কৌতূহলী

চোখে তাকাল। তার বাবা, ক্যাপ্টেন রজারস সম্পর্কে কেউ কোন কথা বললেই সে সজাগ হয়ে ওঠে। র‍্যালফের কাছে তার মৃত বাবা রহস্যময় এক হীরো। শেরিফ স্টিফেন মহিলাদেরকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে বলল, 'মি. হোলার অভিযোগ করেছেন চার্লি তার কিছু জিনিসপত্র নিয়ে পালিয়েছে।'

শেরী রেগে উঠলেন, 'মি. হোলার নিশ্চয়ই মিথ্যা বলেছেন।'

হোলারের ছোট, কুঁতকুঁতে চোখ দুটো কঠিন হয়ে উঠল। ঘোঁত ঘোঁত করে বলল, 'ব্যস, আর কোন কথা নয়।'

অপ্রীতিকর কোন ঘটনা ঘটতে পারে ভেবে হাত তুলল শেরিফ। 'চার্লির সঙ্গে দেখা হলে দয়া করে বলবেন আমি তার খোঁজ করেছিলাম।' হ্যাটটা আবার মাথায় পরে ধুলোময় রাস্তায় ঘোড়া ছোটাল সে। তাকে অনুসরণ করল হোলার।

র‍্যালফ আর তার দুই ফুফু চেয়ে দেখল তাদের প্রস্থান। র‍্যালফ তার ফুফুর স্কার্ট খামচে ধরল। 'আচ্ছা শেরী ফুফু, শেরিফ যে বলল সামনের বার তাকে আর এত পথ পাড়ি দিতে হবে না...মানে কী এই কথার?'

কাঁধ ঝাঁকালেন শেরী। 'ওর ধারণা আমরা এই জায়গা ছেড়ে চলে যাব।' বাড়িটির দিকে তাকালেন তিনি, জলে ভরে গেল চোখ। কী চমৎকার বাড়ি এই গ্রাসি। নন্দন কাননসম এই বাড়িতে এতদিন সকলে মিলে বাস করার পর এটাকে ছেড়ে যেতে হবে...ওহ্, ভাবাই যায় না। কিন্তু ভাবতে না চাইলেও যেন কিছুই করার নেই। বাড়ি ছেড়ে দেয়ার হুমকি মাথার ওপর খড়গ হয়ে ঝুলেই আছে। সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে র‍্যালফের বাবার মৃত্যুর পর থেকে। কারণ তিনি তেমন টাকাকড়ি রেখে যেতে পারেননি যাতে এই সমস্যার সমাধান হয়।

'শেরী, ছেলেটার সঙ্গে ওভাবে কথা বোলো না।' সতর্ক করে দিলেন তাঁর বোন। 'ওর মন খারাপ হয়ে যাবে।' র‍্যালফের হতবুদ্ধি চেহারা দেখে কথাটা বললেন তিনি।

'ওহ্, আমি দুঃখিত,' হঠাৎ যেন উত্তেজিত হয়ে পড়লেন শেরী। দুপদাপ পা ফেলে এগোলেন বারান্দার দিকে।

'গ্রাসি আমাদেরই থাকবে, র‍্যালফ।' সান্ত্বনার সুরে বললেন মেরী ফুফু। 'কেউ এই বাড়ি আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না।'

ওইদিন রাতে র‍্যালফ বসে আছে তার বিছানায়, হাত দুটো মাথার পেছনে।

খুব গরম পড়েছে, খোলা জানালা দিয়ে ম্যাগনোলিয়া ফুলের মিষ্টি গন্ধ এসে নাকে লাগছে। অন্ধকার, মখমল আকাশে অজস্র তারা। অপূর্ব সুন্দর চাঁদ রুপোলি আলো অকৃপণ ছড়িয়ে দিচ্ছে বাগানে। ছোট্ট একটা নুড়ি পাথর এসে ঠক করে লাগল জানালায়। পিছলে নামল সে বিছানা থেকে, দৌড়ে গেল জানালার কাছে। মাথা বের করে ডাকল, 'কে?'

কোন জবাব এল না। কেউ নেই ওখানে। জঙ্গলের মধ্য থেকে ডেকে উঠল একটি নিশাচর পাখি। কিন্তু আর কোন শব্দ হলো না। র‍্যালফ জানালার ফ্রেমে কনুই রাখল, রহস্যময়, অন্ধকার উঠানের দিকে চেয়ে রইল। এই সময় লোকটাকে চোখে পড়ল তার। গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল সে, মুখ তুলে ওপর দিকে চাইল। চাঁদের আলোয় তাকে স্পষ্ট চিনতে পারল র‍্যালফ। শ্বাস যেন বন্ধ হয়ে এল তার। 'চার্লি!' পরক্ষণে চেঁচিয়ে উঠল সে। আনন্দে বুক ভরে উঠেছে ওর, এক দৌড়ে ঘর থেকে বেরুল। দুড়দাড় করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে ছুটল বাগানের দিকে। বাড়ানো দুই বাহুর মধ্যে সেঁধিয়ে গেল র‍্যালফ।

মুখ ভরা হাসি নিয়ে চার্লি ওকে জড়িয়ে ধরল। 'চার্লি! ওহ্, চার্লি! ওহ্...' উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে র‍্যালফ। যেন এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না ওদের সবচে' বিশ্বস্ত মানুষটা আবার ফিরে এসেছে।

'র‍্যালফ!' চার্লি আদর করে র‍্যালফের মসৃণ চুলে হাত বোলাচ্ছে।

র‍্যালফ একটু সুস্থির হয়ে চার্লির মুখের দিকে কৌতূহলী চোখে তাকাল, 'চার্লি, তুমি সামনের দরজা দিয়ে ঢোকোনি কেন?'

ঠোঁটে আঙুল রাখল চার্লি, সাবধান করল র‍্যালফ যেন জোরে কথা না বলে। ভীত চোখে একবার পেছন দিকে চাইল।

'শ্‌শ্‌শ্‌...' বিড়বিড় করে বলল সে। 'আমি কোন ঝুঁকি নিতে চাইনি।'

র‍্যালফ হঠাৎ বুঝে ফেলল ব্যাপারটা। ঠিকই তো... শেরিফ আজ সকালেই ওর খোঁজে এসেছিল। 'কি হয়েছে, চার্লি? কোন বিপদে পড়েছ?' মাথা দোলাল চার্লি। 'বিপদটা গুপ্তধন নিয়ে, র‍্যালফ!' র‍্যালফ খুবই আশ্চর্য হলো। 'তোমার বাপ গুপ্তধন লুকিয়ে রেখেছিলেন যাতে রিডলার ওটার সন্ধান না পায়।'

অবাক গলায় জানতে চাইল র‍্যালফ, 'রিডলারটা আবার কে?'

কেঁপে উঠল চার্লি। 'মস্ত শয়তান একটা!' ফিসফিস করে বলল সে, ওর চোখ এদিক ওদিক ঘুরছে। যেন লোকটা এখনই এসে হাজির হবে এখানে।

রাতজাগা কোন প্রাণী হয়তো খাবার খুঁজতে বেরিয়েছিল, খসখস শব্দ

হলো মাটিতে। সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠল চার্লি। র‍্যালফের মাথায় ঝড়ের বেগে চিন্তা চলছে। ওর দুই ফুফুই খুব সদয় আর ভাল। আর চার্লি বিপদে পড়েছে শুনলে ওরা নিশ্চয়ই ওকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবেন। মনস্থির করে ফেলল র‍্যালফ। চার্লির হাত ধরে এগোল ওদের বাড়ির ভেতরে।

বসার ঘরের দরজা খুলল র‍্যালফ সন্তর্পণে। ওর দুই ফুফু বসে গল্প করছিলেন, একই সঙ্গে চোখ তুলে চাইলেন দু'জনে। শেরী ফুফু সম্ভবত র‍্যালফকে খুব কড়া একটা কথা বলতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ তাঁর চোখ পড়ল চার্লির ওপর। সঙ্গে সঙ্গে গপ্ করে বকুনিটা গিলে ফেললেন তিনি, মুখে ফুটে উঠল হাসি। হাত নেড়ে ডাকলেন তিনি চার্লিকে। দুই বোনই উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন চার্লিকে দেখে। অজস্র প্রশ্ন করতে লাগলেন তাঁরা। চার্লি কিছু বলার আগেই র‍্যালফ সব প্রশ্নের জবাব দিয়ে ফেলল।

শেরী উত্তেজনা খানিকটা প্রশমন করে জিজ্ঞেস করলেন, 'এই গুপ্তধনের ব্যাপারটা আসলে কী?'

এবার চার্লি উত্তর দিল। 'আমরা একটা কার্গো ডুবিয়ে অনেক সোনা পেয়েছিলাম...ক্যাপ্টেন রজারস সোনা নিয়ে বাহামা যেতে মনস্থ করেন, ওই সময় কামবারলান-এর নজরে পড়ে যাই এবং ওরা আমাদের ধাওয়া শুরু করে।'

উত্তেজনায় র‍্যালফের চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল, 'কামবারলান কি সেই গানবোট যেটা ফ্লোরাবি-কে ডুবিয়ে দিয়েছিল?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ,' বলল চার্লি। 'ওটা রিডলারের জাহাজ। কিন্তু ক্যাপ্টেন রজারসও চালাকিতে কম যান না। তিনি ফ্লোরাবিকে অগভীর পানিতে নিয়ে আসেন। ওখানে কামবারলানের ঢোকার সাধ্য ছিল না।' নাটকীয়ভাবে থামল সে, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মুখ তিনটেকে পর্যবেক্ষণ করল। তারপর ঘোষণা করল, 'তারপর তিনি স্বর্ণ ভাণ্ডার লুকিয়ে ফেলেন।'

কথাটা শুনে চুপ হয়ে গেল সবাই। র‍্যালফ ঢোক গিলল। মেরী ফুফু অনিসন্ধিৎসু ভঙ্গিতে বললেন, 'এখনও ওটা লুকানো আছে?'

'জ্বী, ম্যাম। ফ্লোরিডার কাছে কোথাও।' মেরী ফুফুর দিকে চরকির মত ঘুরল চার্লি। 'তারপর আমি জিমি রজারসকে খুঁজতে বেরোই...'

'ওই হতভাগাটার সঙ্গে তোমার আবার কী দরকার পড়ল?' মেরী ফুফু চার্লিকে হাত ইশারায় বসতে বললেন।

'ক্যাপ্টেন রজারস আমাকে বলেছিলেন তাঁর ভাই র‍্যালফের জন্য

গুপ্তধন খুঁজে দিতে সাহায্য করবেন। তা হলে আর র‍্যালফকে গ্রাসি থেকে কেউ বেআইনীভাবে তাড়িয়ে দিতে পারবে না।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন শেরী ফুফু। 'জিমি রজারস জীবনেও কোন কাজ ঠিকভাবে করতে পারেনি।'

মেরী ফুফু এক প্লেট খাবার এনে রাখলেন চার্লির সামনে। কৃতজ্ঞ ভঙ্গিতে হাসল চার্লি, তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল প্লেটের ওপর। মায়াভরা চোখে ওকে দেখতে দেখতে তিনি বললেন, 'তোমার টাকা লাগবে, চার্লি?'

চার্লির কালো মুখ করুণ হয়ে উঠল। 'আমার কাছে একটা কানাকড়িও নেই, মিস মেরী।'

'ঠিক আছে, তোমাকে কিছু টাকা আমরা ধার দিচ্ছি, তবে পরিমাণে খুবই অল্প।' একটা কাবার্ডের দিকে এগোলেন তিনি।

শেরী ফুফু খুবই দুঃখিত স্বরে বললেন, 'আমাদের অবস্থাও খুব একটা ভাল যাচ্ছে না, চার্লি। তাই ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও তোমাকে বেশি টাকা দিতে পারছি না। যাকগে, এখন বলো তো তোমার এই গুপ্তধন কোথায় থাকতে পারে?'

'বাড়িতে একটা ম্যাপ পাঠিয়েছিলেন ক্যাপ্টেন রজারস··· তাঁর মৃত্যুর আগে।'

বিস্মিত হলেন শেরী। 'কিন্তু ওর জিনিসপত্রের মধ্যে আমি তো কোন ম্যাপ পাইনি।'

'একটা বই'র মধ্যে ছিল ওটা।' বলল চার্লি। 'ওই বইটা তিনি সব সময় পড়তেন।'

'আচ্ছা···ঠিক আছে, এসো আমার সঙ্গে,' উঠে দাঁড়ালেন শেরী ফুফু। চারজনের দলটা এগোল চিলেকোঠার দিকে।

রুমটা ছোট, ধুলো ভরা। আলো-বাতাসও পর্যাপ্ত নয়। লণ্ঠনের ছায়া পড়েছে দেয়াল আর ছাদে। কেমন ভৌতিক লাগছে। শেরী ফুফু তার মৃত ভাইয়ের 'প্রিয়' বইটি খুঁজতে শুরু করলেন। বইটি পাওয়ার পর হলুদ, জীর্ণ পাতাগুলো ওল্টাতে লাগলেন তিনি। বিরক্ত গলায় বললেন, 'হোমারের কবিতা ছাড়া আর কিচ্ছু নেই এই হতচ্ছাড়া বইতে।'

চওড়া কাঁধ ঝাঁকাল চার্লি। 'মিস শেরী, বিশ্বাস করুন, আমি মিথ্যে বলছি না। ক্যাপ্টেন রজারস মারা যাওয়ার আগে আমাকে বারবার এই বইটার কথাই বলেছেন।'

সবাই বইটার ওপর যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ল। শেরী চার্লির হাতে বইটা

দিলেন। পৃষ্ঠা ওল্টাতে ওল্টাতে ভ্রূ কুঁচকে উঠল তার। মনিব ওকে মিথ্যে বলতেই পারেন না। ম্যাপটা এই বইয়ের মধ্যে অবশ্যই থাকবে···কিন্তু কোথায়? বইটা হাতে নিল র‍্যালফ, আড়াআড়িভাবে মেলে ধরল লণ্ঠনের ওপর। খুব মনোযোগ দিয়ে পৃষ্ঠাগুলো পরীক্ষা করতে লাগল। কিন্তু ম্যাপের 'ম'ও খুঁজে পেল না সে কোথাও। ভয়ানক হতাশ হলো। ইতিমধ্যে সে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল গুপ্তধন হাতে পেয়েছে তারা, গ্রাসিকে রক্ষা করেছে লোভী শেরিফের হাত থেকে, তার দুই ফুফুকে আর সবসময় শঙ্কিত থাকতে হচ্ছে না।

শেরী ফুফু চার্লিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা চার্লি···আজ তোমার খোঁজে যে লোকটা এসেছিল কে সে?'

চার্লির মুখ সাথে সাথে কালো হয়ে গেল। জানালায় একটা শব্দ হতেই সে ওদিকে ভীত চোখে তাকাল। 'ও রিডলারের লোক। ওদের ধারণা গুপ্তধনের সন্ধান আমি জানি। কিন্তু আসলে আমি কিছুই জানি না। ক্যাপ্টেন রজারস আমাকে বলেননি। আমার ভালর জন্যই নাকি তিনি বলেননি।' র‍্যালফ খোলা বইটাকে লণ্ঠনের কাঁচের ওপর ধরে রেখেছিল। গরম কাঁচের তাপে পৃষ্ঠার গায়ে আস্তে আস্তে কিছু লেখা আর ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠল। 'আরে!' চিৎকার করে উঠল সে। 'দেখো! পৃষ্ঠাটায় কী সব লেখা ফুটে উঠেছে।'

বিস্মিত মেরী এবং শেরী ফুফু চার্লির কাঁধের ওপর দিয়ে চাইলেন। 'মেটকাম্ব-এর চাবি!' নাটকীয়ভাবে আঙুল তুলে নির্দেশ করল সে। 'এই "এক্স" চিহ্নটা দেখো। এখানে নিশ্চয়ই সোনা লুকানো আছে।'

চার্লি বইটার ওপর ঝুঁকল। 'ক্যাপ্টেন রজারস বলেছিলেন একটা গাছের নীচে তিনি ওগুলো পুঁতে রেখেছেন। কিন্তু কোথায় তা বলেননি।'

হঠাৎ ঝট করে মুখ তুললেন মেরী ফুফু। 'কোন আওয়াজ পেলে, শেরী'পা?'

'বাতাসের শব্দ হয়তো।' বললেন তাঁর বড় বোন।

কিন্তু জবাবটা সন্তুষ্ট করল না মেরী ফুফুকে। বাতাস নয়, অন্য কোন শব্দ শুনেছেন তিনি। ওদিকে একই সময় নিচতলার জানালার কাছে মোটা গোঁফওয়ালা, লম্বা এক লোক ঝোপের আড়ালে আত্মগোপন করা তার দলের লোকদের ইশারা করল। তারা দ্রুত উঠে এল বারান্দায়, ধাক্কা দিল দরজায়। দড়াম করে খুলে গেল দুই কবাট, থরথর করে কেঁপে উঠল গোটা বাড়ি। বিদ্যুৎগতিতে সিধে হলেন শেরী ফুফু। চার্লির মুখ আতঙ্কে ফ্যাকাসে

হয়ে গেল। ফিসফিস করে বলল, 'রিডলার এসে পড়েছে!' জানালার দিকে পা বাড়াল সে। 'এ ও না হয়েই যায় না।'

নীচের তলায় হলরুম থেকে পায়ের আওয়াজ ভেসে এল। 'এসব হচ্ছেটা কী!' ভয় পেলেন মেরী ফুফু। দলটা সিঁড়িঘরের দরজা খুলল, ওপরে তাকাল। সিঁড়ি গোড়ায় অনেক লোক, নেতা চেহারার লোকটা সবার সামনে, তার মাথায় ক্যাপ্টেনের টুপি, হাতে একটা লাঠি।

কেঁপে উঠল চার্লি। চিনতে পেরেছে সে রিডলারকে। 'ও-ই এসেছে!' শ্বাস টানল সে।

সামনে থেকে ওদের সরে যেতে বলে শেরী ব্যালকনির দিকে এগোলেন, তাকালেন অনুপ্রবেশকারীদের দিকে। 'আমার বাড়িতে কী চাই তোমাদের?' বরফ ঠাণ্ডা গলায় বললেন তিনি।

নীল চোখের ভয়ঙ্কর দৃষ্টি মেলে তাঁর দিকে চাইল রিডলার। 'আমরা ক্যাপ্টেন রজারসের নিগ্রোটাকে খুঁজতে এসেছি। জানি ও এখানেই আছে। সুতরাং মিথ্যে বলার চেষ্টা করবেন না।' সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল সে।

হাত তুললেন শেরী। 'এখানে আমি, আমার বোন এবং ভাতিজা ছাড়া অন্য কেউ থাকে না। সবাই ঘুমাচ্ছিলাম। তোমরা খামোকা আমাদের ঘুম ভাঙিয়েছ।' কঠোর গলায় আদেশ করলেন তিনি। 'এখন, ভাগো এখান থেকে।'

রিডলার বিদ্রূপের হাসি হাসল। 'আপনারা বুঝি চিলেকোঠায় ঘুমান, না?'

রাগে লাল হয়ে গেল শেরীর মুখ। রিডলার তার লোকদের দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিত করল। দাঁত বের করে হাসতে হাসতে সবাই উঠতে শুরু করল ওপরে। আতঙ্কিত বোধ করলেন শেরী। এই দস্যুদের কাছে তাঁর সম্মানের কানাকড়ি দামও নেই, বুঝতে পেরেছেন তিনি। ঘুরলেন তিনি, দৌড়ে চলে এলেন চিলেকোঠার ঘরে। সশব্দে বন্ধ করলেন দরজা। 'ওরা ওপরে উঠে আসছে!' দরজার দিকে আঙুল দেখালেন শেরী। 'দরজায় ব্যারিকেড দাও!'

মরিয়া হয়ে উঠল চার্লি, ভারী একটা ফার্নিচার ঠেলে দরজার গায়ে ঠেকাল। ট্রাঙ্ক, চেয়ার, সিন্দুক, পুরানো, বড় গ্রান্ড ফাদার ক্লক যা কিছু হাতের কাছে পেল সব দিয়ে দরজায় ব্যারিকেড দিতে লাগল সে। 'তাড়াতাড়ি···তাড়াতাড়ি করো।' একটা আলনা দরজার কাছে ঠেলে নিতে নিতে বললেন শেরী ফুফু।

'ওখান থেকে সরো, র‍্যালফ,' সাবধান করে দিলেন মেরী ফুফু চার্লি ভারী বড় একটা ট্রাঙ্ক হাতে তুলছে দেখে।

'আপনার মাথা সরান,' বলতে বলতে চার্লি ট্রাঙ্কের ওপর দিড়িম করে একটা সিন্দুক রাখল। বাইরের সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনল সবাই, ডাকাতগুলো গালাগাল শুরু করেছে।

এই সময় বাগান থেকে একটা কণ্ঠ ভেসে এল, 'র‍্যালফ···র‍্যালফ!'

চার্লি ছুটে গেল ছোট জানালাটার দিকে, উঁকি দিল বাইরে। চাঁদের আবছা আলোয় দেখতে পেল কিশোর পাশাকে। হাত নাড়ল সে। র‍্যালফও দেখল ওকে। প্রত্যুত্তরে হাত নাড়ল সে-ও। চার্লি জানালার চৌকাঠে একটা পা রাখল। এদিকে লোকগুলো চিলেকোঠার দরজায় দুমদাম বাড়ি দিতে শুরু করেছে, চিৎকার করে দরজা খুলতে বলছে। চার্লির শ্বাস পড়ছে ঘনঘন। সে জানে সে একা এই শয়তানগুলোর সঙ্গে পেরে উঠবে না। এখন ওর সামনে একটাই পথ–ঝেড়ে পালানো। চার্লি পালাতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে ভীত, আতঙ্কিত মেরী ফুফু বললেন, 'ওকে সঙ্গে নেবে, চার্লি! র‍্যালফকে সঙ্গে নিয়ে যাও, প্লীজ!'

লোকগুলোকে তাঁর ভয় নেই। জানেন ওরা চার্লির কাছে এসেছে ম্যাপের সন্ধানে। কিন্তু তাঁর ভয় দুর্বৃত্তগুলো র‍্যালফের কাছে ম্যাপটা আছে ভেবে ওর কোন ক্ষতি করতে পারে।

চার্লি লাফ দিতে গিয়েও থেমে গেল। মেরী ফুফু র‍্যালফের হাতে কিছু টাকা গুঁজে দিলেন। 'চার্লি, চলে এসো,' র‍্যালফ ডাকল তাকে। জানালা দিয়ে নীচে লাফিয়ে পড়তে সে প্রস্তুত।

'চার্লি···ম্যাপ,' বললেন মেরী, বইটা ওর হাতে ধরিয়ে দিলেন।

বিদায় জানাবার সময় এখন নেই। হলঘরের গোলমাল ক্রমশ বেড়েই চলেছে। র‍্যালফ লাফিয়ে পড়ল নীচের গাছের ডাল লক্ষ্য করে। ছায়ায় দাঁড়িয়ে কিশোর তার বন্ধুকে লাফাতে দেখল। দৌড় দিল সে র‍্যালফকে সাহায্য করতে।

এদিকে রাগে ষাঁড়ের মত গাঁক গাঁক করছে রিডলার, 'ভেঙে ফেলো দরজা!' চিৎকার করে উঠল সে। 'ভাঙো এক্ষুনি!'

মহাউৎসাহে লোকগুলো তার আদেশ পালন করল। দরজায় দ্রিম দ্রিম শব্দটা প্রচণ্ডতর হয়ে উঠল। এখন আর সময় নষ্ট করার সময় একটুও নেই। বইটা মাটিতে ছুঁড়ে ফেলল চার্লি, তারপর গাট্টাগোট্টা গাছটার ডাল ধরে ঝুলে পড়ল। চিলেকোঠার ঘরে মেরী প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলেন

দরজার ব্যারিকেড রক্ষা করতে। প্রচণ্ড চাপে খিল ছুটে যায় যায় অবস্থা।

'পারছি না, শেরী'পা, আমি আর ঠেকাতে পারছি না,' কাতরে উঠলেন মেরী। বাইরে থেকে প্রচণ্ড এক ধাক্কায় দরজাটা ভেঙে ছিটকে এল ভেতরে। সঙ্গে সঙ্গে দাঁড় করানো ভারী ফার্নিচারটা দড়াম করে আছড়ে পড়ল লোকগুলোর ঘাড়ে। তালগোল পাকিয়ে চিৎ হয়ে পড়ে গেল সামনের ক'জন। যে লোকটা প্রথমে চিলেকোঠার ঘরে ঢুকেছিল ঠিক তার মাথার ওপর ছিটকে পড়ল ভারী গ্রান্ড ফাদার ক্লক, চোখে বিনে পয়সায় লাল নীল তারা দেখতে দেখতে মেঝেতে আছাড় খেয়ে পড়ল সে। লোকগুলোর ধাক্কায় পড়ে গিয়েছিলেন মেরী। কিন্তু শেরী একটা পুরানো ফ্রাইপ্যান দিয়ে হাতের কাছের লোকটাকে আচ্ছামত পিটাতে শুরু করলেন। ওকে শায়েস্তা করে দ্বিতীয় শিকার খুঁজতে লাগলেন তিনি। সবাই চিৎপাত হয়ে পড়ে গেলেও দলনেতা রিডলার সুস্থ শরীরেই ছিল। সে তার ভূপাতিত দলের লোকদের দিকে একবার তাকিয়ে দৌড়ে গেল খোলা জানালার দিকে। র‍্যালফ আর ডকশোর তখন জান বাজি রেখে দৌড়াতে শুরু করেছে। চার্লি গাছের ছায়ায় ভীত খরগোশের মত তাদের পিছু ছুটছে। ঘোঁত ঘোঁত করে উঠল রিডলার, হিংস্রতায় বেরিয়ে পড়ল দাঁত। হোলস্টার থেকে বন্দুকটা নিয়ে গুলি ছুঁড়ল চার্লিকে লক্ষ্য করে। মিস হলো গুলি। কিন্তু রিডলার একের পর এক গুলি ছুঁড়তেই থাকল। হঠাৎ একটা গুলি লাগল চার্লির গায়ে। হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল সে। মাথার ভেতর জ্বলে উঠল অনেকগুলো সূর্য, তীব্র একটা ব্যথা অনুভব করল সে বুকে। রিডলার বিকট স্বরে চেঁচিয়ে উঠল, তার লোকদের নির্দেশ দিল চার্লিকে ধরতে। প্রচণ্ড ব্যথা উপেক্ষা করে কোনমতে উঠে দাঁড়াল চার্লি, শরীরটাকে টানতে টানতে একটা ঘন ঝোপের আড়ালে নিয়ে এল। তারপর পড়ে গেল।

র‍্যালফ এবং কিশোর গুলির শব্দ শুনে থেমে গেছে। পেছন ফিরে চাইল ওরা। চার্লি তালগোল পাকিয়ে পড়ে আছে মাটিতে। 'র‍্যালফ! র‍্যালফ!' ডাকল সে করুণ গলায়।

'চার্লি···ওহ্ চার্লি!' কান্না এসে রুদ্ধ করে দিল র‍্যালফের কণ্ঠ, দৌড়ে গেল সে চার্লির কাছে। কিশোর ওর পিছু পিছু এল, 'ম্যাপ!' বিড়বিড় করে বলল চার্লি। কাঁপা হাতে বইটা খুলল সে, মাঝখানের পাতাটা ছিঁড়ে ওটা গুঁজে দিল র‍্যালফের হাতে। কাগজটা দ্রুত শার্টের পকেটে চালান করে দিল র‍্যালফ।

রিডলারের ক্রুদ্ধ কণ্ঠ ভেসে এল রাতের বাতাসে, 'ওরা যেন পালাতে না

পারে, খবরদার!' লোকজনদের হুকুম করল ঝোপঝাড় সার্চ করতে। 'তোমরা এঁদিকে যাও, আর তোমরা ওদিকটা দেখো।'

র‍্যালফ চার্লির হাতে চাপ দিল, কিন্তু সে মাটিতে পিঠ দিয়ে শুয়ে পড়ল। তার চোখ বোজা, মৃত্যু দূত এগিয়ে আসছে তাকে গ্রাস করতে। চারদিকের হৈ হল্লা, চিৎকার কোনকিছুই তাকে আর স্পর্শ করতে পারছে না, 'চলো পালাই,' র‍্যালফ ফিসফিস করে বলল কিশোরকে। দুই বন্ধু গোলাবাড়ির দিকে ছুটল।

অল্প কিছুদূর যেতেই রিডলারের গলা শুনতে পেল ওরা, 'এই তোমরা দু'জন ওদিকটাতে দেখো, ছোকরা দুটোকে যে করে হোক খুঁজে বের করা চাই।'

ভয়ের চোটে গতি দ্রুত হলো ওদের, চট করে ঢুকে পড়ল গোলাবাড়িতে। লাফিয়ে উঠল বেবের পিঠে। ওদের এই আচরণে বিস্মিত বেব চিঁহিঁহিঁ করে প্রতিবাদ জানাল, কিন্তু র‍্যালফ ওর নাকে আদর করতেই ঘোড়াটা শান্ত হয়ে গেল।

রিডলার চার্লিকে খুঁজতে খুঁজতে ঘন ঝোপটার কাছে চলে এল। চার্লির নিশ্চল শরীর দেখেও যেন দেখল না, খোলা বইটা সে সাগ্রহে তুলে নিল মাটি থেকে। মাঝখানের পাতাটা ছেঁড়া দেখে হতাশা আর রাগে চিৎকার করে উঠল সে। বোঝাই যাচ্ছে ওখানে কী ছিল। অভিশাপ দিল রিডলার, 'ক্যাপ্টেন রজারসের ছেলে র‍্যালফ। ওর কাছে নিশ্চয়ই ম্যাপটা আছে।' রাগে বইটা ছুঁড়ে ফেলল সে। দুদ্দাড় করে এগোল সামনে।

গোলাবাড়ির ভেতরে র‍্যালফ কিশোরকে সাবধান করে দিল যেন ঘোড়ার পিঠে শক্ত হয়ে বসে থাকে। তারপর ঘোড়া ছোটাল সে। বেবও বোধহয় বিপদের প্রকৃতি বুঝতে পেরেছে, ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল সে। কিন্তু রিডলারের লোকদের সতর্ক চোখকে ফাঁকি দিতে পারল না। ওদেরকে দেখে ফেলল তারা। সঙ্গে সঙ্গে শুরু করল গুলিবর্ষণ। কিন্তু ছেলেদুটোকে তারপরও কব্জা করা যাচ্ছে না দেখে রাগে বেগুনী হয়ে গেল রিডলারের মুখ। যাচ্ছেতাই গালাগাল শুরু করল সে দলের লোকদের।

গালি গালাজ খেতে খেতেই রিডলারের লোকেরা ঘোড়ায় চড়ে পিছু নিল ওদের। খুরের আওয়াজ শুনেই র‍্যালফ বুঝে ফেলল কারা আসছে ওদের পিছু নিয়ে। খুনীগুলো মরিয়া হয়ে উঠেছে ওদেরকে ধরার জন্য। এখন লুকানো ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। একটা বড় গাছের আড়ালে বেবকে দাঁড় করাল সে। ভয় কাকে বলে টের পেল। এই লোকগুলোকে

ঠেকানোর ক্ষমতা তার নেই। তার ফর্সা মুখ ঘামে ভিজে সপসপে। ভাগ্যিস, কিশোর সঙ্গে ছিল। নইলে সে হয়তো ভয়েই এতক্ষণে অজ্ঞান হয়ে যেত। রিডলারের লোকেরা কাছিয়ে আসছে। অন্ধকারে মুঠি শক্ত করল র‍্যালফ, কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করল বেব যেন ডেকে না ওঠে।

ঝড় তুলে রিডলারের ঘোড়সওয়াররা চলে গেল। বড় একটা ঢোক গিলল র‍্যালফ, তার বুকে দমাদম পিটছে হৃৎপিণ্ড।

'সামনে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, ক্যাপ্টেন,' এক অনুসরণকারীর চিৎকার শোনা গেল। 'ওরা অন্য কোনদিকে চলে গেছে।'

গাছের পাতা হঠাৎ কেঁপে উঠল বাতাসে, ঝিরঝিরে হাওয়া স্বর্গের শান্তি আনল র‍্যালফের বুকে। কিশোর আস্তে করে জানতে চাইল, 'ওই লোকগুলো তোমাকে খুঁজছে কেন, র‍্যালফ?'

র‍্যালফ ঘোড়ার পিঠ থেকে পিছলে নামল। কিশোরও বন্ধুকে অনুসরণ করল। বেবের মুখটা গোলাবাড়ির দিকে ঘুরিয়ে দিল র‍্যালফ। 'যাও সোনা, বাড়ি যাও।' ঘোড়াটা আস্তে আস্তে এগোল তার পরিচিত বাসস্থানের দিকে। পকেটে হাত পুরে র‍্যালফ বসল ঘাসের ওপর। কিশোর তার পাশে। র‍্যালফের মাথায় হাজারও প্রশ্ন। কিশোরের মনেও তাই। কিন্তু র‍্যালফকে কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস পাচ্ছে না সে। অপেক্ষা করছে র‍্যালফ নিজেই হয়তো বলবে। কিছুক্ষণ পর উঠে দাঁড়াল ওরা, হাঁটতে শুরু করল সামনের দিকে। হাঁটতে হাঁটতে নদীর ধারে চলে এল দু'জনে। তীরে একটা নৌকা দেখতে পেল। বাঁধা।

'এসো, নৌকাটাকে পানিতে ভাসাতে আমাকে সাহায্য করো,' বলল র‍্যালফ।

দু'জনে অনেক কষ্টে, ঠেলেঠুলে নৌকাটাকে খাড়া পাড় দিয়ে নীচে নামাল। কিশোর জানে না তার বন্ধু কোথায় যাচ্ছে, কিন্তু উত্তেজিত গলায় সে প্রশ্ন করল, 'আমাকে তোমার সঙ্গে নেবে?' কেনটাকিতে বন্ধু র‍্যালফের বাসায় বেড়াতে এসেছে ও। এখন নিজের অজান্তেই জড়িয়ে পড়েছে বন্ধুর বিপদে।

'আমাকে অনেক দূর যেতে হবে, কিশোর,' বলল র‍্যালফ, চেষ্টা করছে নৌকাটাকে পানিতে ভাসাতে।

কিশোরের মুখ কালো হয়ে গেল। 'আমাকেও নিয়ে চলো, প্লীজ,' করুণ গলায় বলল সে। 'তুমি চলে গেলে আমি কার সঙ্গে থাকব, বলো?'

কিশোরের করুণ চেহারা দেখে খুব মায়া হলো র‍্যালফের। বলল, 'ঠিক

আছে, চলো তা হলে।' উজ্জ্বল হয়ে উঠল কিশোরের মুখ। দ্বিগুণ উৎসাহে হাত লাগাল সে। নৌকা ভেসে পড়ল পানিতে।

দুই

চাঁদের আলো গায়ে মেখে দুই বন্ধু বৈঠা বাইতে শুরু করল। নদীতে ঢেউ নেই, ছন্দায়িত গতিতে বৈঠা ওঠা নামার শব্দ শুধু, ধীরে ধীরে তীর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে ওরা।

'নৌকাটা স্নাইডার বুড়োর না?' জানতে চাইল ডকশোর।

মাথা দোলাল র‍্যালফ। 'আমরা ফিরে এসে ওকে ক্ষতিপূরণ দেব…যদি ফিরতে পারি।' অনেকটা স্বস্তি অনুভব করছে সে এখন। ডকশোরকে লুকানো গুপ্তধন সম্পর্কে সব কথা বলেছে। ডকশোর কোন মন্তব্য না করে চোখ বড় করে শুধু শুনে গেছে। গল্পটা ওর ঠিক বিশ্বাস হয়নি। কিন্তু উল্টো পাল্টা কোন কথা বলে র‍্যালফকে রাগাতে চায়নি সে। যদি র‍্যালফ ওকে এই রোমাঞ্চকর অভিযান থেকে বাদ দিয়ে দেয়। অন্ধকারে হাসল ডকশোর। অ্যাডভেঞ্চারটা খুব মজার হবে।

রিডলার তার দলের লোকদের নিয়ে ঝোপঝাড়, জঙ্গল ভেদ করে নদী তীরে এসে পৌছুল। ছেলেদুটো এভাবে ফাঁকি দেবে কল্পনাও করেনি তারা। ক্লান্তিতে কুকুরের মত হাঁপাচ্ছে সবাই।

রিডলার লণ্ঠনের আলোতে মাটিতে পায়ের ছাপ খুঁজছিল। হঠাৎ মুখ তুলল সে, তাকাল নদীর দিকে। 'ওই যে!' চেঁচিয়ে বলল সে। অনেক দূরে দুটো বাচ্চা ছেলের আবছা আকৃতির দিকে আঙুল তুলে দেখাল রিডলার।

'ওই তো ওরা,' কর্কশ গলায় বলল হোলার, কুঁতকুঁতে চোখ দুটো তীক্ষ্ণ করল, 'পালাচ্ছে নদী পথে।'

শুয়োরের মত ঘোঁত ঘোঁত করে উঠল রিডলার, কঠোর করে তুলল মুখ। 'কিন্তু তীরে ওদেরকে ফিরতেই হবে।' বলল সে। সিদ্ধান্ত নিল ছেলেদুটোকে অনুসরণ করবে।

একখণ্ড ঘন কালো মেঘ ঢেকে ফেলল চাঁদ, পলকে কালিকালো অন্ধকারে ছেলেদুটো অদৃশ্য হয়ে গেল চোখের সামনে থেকে। নৌকাটা যেদিকে গিয়েছে রিডলার তার দল নিয়ে তীর ধরে সেদিকে এগোল। শক্ত

মাটিতে ঘোড়ার খুরের শব্দ ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে।

র‍্যালফ আর ডকশোর কল্পনাও করেনি রিডলারের দল তাদেরকে দেখে ফেলেছে, আনন্দিত মনে ওরা বৈঠা বেয়ে চলল। ঠাণ্ডা বাতাস ওদের শরীরে শান্তির পরশ বুলিয়ে দিচ্ছে, নতুন শক্তিতে ওরা এগিয়ে চলেছে। কিছুক্ষণ পর ক্লান্ত হয়ে পড়ল দু'জনেই, বৈঠা দুটো আড়াআড়ি ভাবে গলুইয়ে রেখে পাটাতনে শুয়ে পড়ল ওরা। পকেটে হাত ঢোকাল র‍্যালফ। টাকার খসখসে শব্দ আর পয়সার ঠিনঠিন আওয়াজ ওকে নিশ্চয়তা এনে দিল, কৃতজ্ঞতা অনুভব করল সে তার ফুফুদের প্রতি। মেটকাম্বে পৌঁছতে ওদের অনেক দিন লাগবে। আর পেট চালাতে এই টাকাটার খুবই প্রয়োজন হয়ে পড়বে।

ভোর হলো। নদী তীরে ঝুলে থাকা ধূসর কুয়াশার গায়ে সূর্যের সোনালী রশ্মি বুলিয়ে দিল সোহাগ। দিগন্তে ফুটে উঠল পাহাড়ের রেখা, শুরু হলো পাখিদের গান। ওদের চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে গেল দুই কিশোরের। কিশোর হাত তুলে একটা হরিণ শাবক দেখাল। চুকচুক করে পানি খাচ্ছে কিনারায় দাঁড়িয়ে।

সূর্যের আলো ক্রমশ উজ্জ্বলতর হয়ে উঠল, বেড়ে চলল তাপমাত্রা, র‍্যালফ পকেট থেকে ম্যাপটা বের করল। ছেঁড়া কাগজটা কিশোরকে দেখাল।

মুচকি হাসল ডকশোর। 'তুমি কাগজটা বারবার দেখে ওটার বারোটা বাজাবে দেখছি।'

'আমি এটার মর্ম উদ্ধার করার চেষ্টা করছি।' বলল র‍্যালফ।

কিশোর নাক ঘষল। 'র‍্যালফ, তোমার কি সত্যি মনে হয় ফ্লোরিডায় এই গুপ্তধনের সন্ধান মিলবে? এখান থেকে কতদূরে জায়গাটা!' কাঁধ নাচাল র‍্যালফ। 'কী জানি! কিন্তু চেষ্টা তো করবই! সোনা পাওয়া গেলে আমাদের আর কোন সমস্যা থাকবে না।' এক মুহূর্তের জন্য ওর মনে পড়ল দুই ফুফু আর বাড়িটার কথা। শঙ্কিত হয়ে ভাবল রিডলারের লোকেরা ওঁদের কোন ক্ষতি করেনি তো। নিষ্ঠুরভাবে ওরা চার্লিকে খুন করেছে। কথাগুলো ভাবতেই অশ্রুসজল হয়ে উঠল র‍্যালফের চোখ।

কিশোর দুঃখী গলায় বলল, 'ওরা যদি তোমাদের বাড়িটা দখল করে তা হলে কোথায় থাকবে তোমরা?'

মাথা নাড়ল র‍্যালফ, করুণ দেখাল চেহারা। 'আমি মেরী আর শেরী ফুফুর কথা ভাবছি। কতদিন ধরে তাঁরা ওই বাড়িতে আছেন।'

'তুমি যদি গুপ্তধনের সন্ধান পাও তোমার দুই ফুফু খুব অবাক হবেন,

তাই না?' হাসল কিশোর, চওড়া হ্যাটটাকে ঠেলে দিল মাথার পেছনে। যদি তারা গুপ্তধনের সন্ধান পায়, অতগুলো সোনা তাদের হাতে আসে, তা হলে যে কি দারুণ ব্যাপার হবে! এক মুহূর্তের জন্য কিশোর ভুলে গেল তার খিদে এবং ক্লান্তির কথা। হঠাৎ দুষ্ট রিডলারের কথা মনে পড়তেই ভীত গলায় বলল, 'র‍্যালফ, ওরা যদি আমাদেরকে ধরতে পারে তা হলে নির্ঘাত চার্লির মত মেরে ফেলবে।'

কঠিন প্রতিজ্ঞা ফুটল র‍্যালফের চেহারায়। 'তবুও আমি ওদেরকে গুপ্তধনের সন্ধান দেব না।'

'ওরা যদি আমাদেরকে খুন করতে আসে তা হলেও না?' ডকশোরের চোখ রসগোল্লা হয়ে গেল।

'তা হলেও না,' দৃঢ় গলায় বলল র‍্যালফ। ওর বাবা চাননি তাঁর ম্যাপ এবং গুপ্তধন বদমাইশগুলোর হাতে পড়ুক। র‍্যালফ প্রাণ গেলেও বাপের ইচ্ছে রক্ষা করবে।

'আমিও না, র‍্যালফ। কারণ চার্লির কথা আমিও ভুলতে পারছি না!'

র‍্যালফ তীক্ষ্ণ চোখে তার প্রিয় বন্ধুর দিকে তাকাল। 'তা হলে এসো শপথ করি। গুপ্তধনের কথা কাউকে বলব না।'

পরস্পরের হাতে হাত রাখল ওরা, উচ্চারণ করল শপথবাক্য। 'ওরা যাই করুক আর ওদের ভয় পাব না আমরা।' বলল ডকশোর। 'ভয় পাব না ওদের!' কথাটা পুনরাবৃত্তি করল র‍্যালফ।

শপথ নেয়ার পর নতুন উদ্যমে জোরে বৈঠা বাইতে শুরু করল দু'জনে। বুঝতে পারল রিডলারের খপ্পর থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে তারা। সূর্য এখন মাঝ আকাশে। তীব্র উত্তাপে চাঁদি আর পিঠ জ্বলছে। নদী তীরে ছড়ানো ছিটানো কুঁড়েঘর চোখে পড়ছে। ঘাসের হ্যাট পরা নারী-পুরুষ গান গাইতে গাইতে কাজ করছে মাঠে। ছোট গ্রামগুলো স্রোতের টানে দ্রুত পেরিয়ে যাচ্ছে র‍্যালফ আর কিশোর।

এক সময় র‍্যালফ ঠিক করল এখন কূলে ভিড়বে। ঘন একটা ঝোপের আড়ালে নৌকাটাকে বাঁধল ওরা। লাফিয়ে নামল তীরে। জঙ্গলে পথ ধরে কিছুদূর এগোবার পর একটা বৈঁচি গাছের নীচে বসল বিশ্রামের জন্য। খানিক পর একটা পাহাড়ের ঢালে উঠে নদীর দিকে সন্ধানী চোখে তাকাল।

র‍্যালফের চোখ ঝিকমিক করে উঠল উত্তেজনায়। 'তাড়াতাড়ি, কিশোর, একটা জাহাজ আসছে।' চেঁচিয়ে বলল সে।

মুগ্ধ হয়ে বিশালকায় জলযানটা দেখল কিশোর। যেন নদীর ওপর

বিরাট একটা খামার বাড়ি। 'ওরা আমাদেরকে জাহাজে উঠতে দেবে, র‍্যালফ?'

র‍্যালফ পকেটে হাত ঢুকিয়ে টাকাগুলো স্পর্শ করল। বলল, 'কেন দেবে না? আমরা তো আর বিনেপয়সায় উঠছি না। চলো, যাই।'

পাহাড় থেকে নেমে এল দু'জনে। দৌড়াতে শুরু করল সামনের দিকে। একটু পরেই ছোট একটা শহরে হাজির হলো ওরা। দামী পোশাক পড়া লোকজন আস্তে ধীরে হাঁটছে রাস্তায়; বেশ কিছু লোক একটা জেনারেল স্টোরের সামনে জটলা পাকিয়েছে। বুড়োরা কাঠের বেঞ্চে বসে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে অলস চোখে দেখছে পথিক আর খেলাধুলায় ব্যস্ত শিশুদের। তবে এতকিছু লক্ষ করার সময় র‍্যালফ আর কিশোরের নেই। হাঁটতে হাঁটতে ওরা জাহাজঘাটায় চলে এল। জাহাজটা যাত্রী নেয়ার জন্য জেটিতে এসে থেমেছে। দম বন্ধ করে ওরা অপেক্ষা করতে লাগল ক্যাপ্টেনের জন্য।

গোঁফওলা, সুদর্শন, বয়েসী এক ভদ্রলোকের দিকে চোখ আটকে গেল র‍্যালফের। উনি পকেট থেকে সোনার ঘড়ি বের করে কী যেন দেখছেন। লোকজনের ভিড় থেকে তাঁকে সম্পূর্ণ আলাদা মনে হলো র‍্যালফের। সাহস করে এগিয়ে গেল ওরা।

র‍্যালফ গোড়ালি উঁচু করে বলল, 'ফ্রায়ার পয়েন্টে যেতে কত ভাড়া দিতে হবে, স্যার?'

এক কেরানী এগিয়ে এল ওদের দিকে। 'কোন্ ক্লাস, খোকা?'

'স্যার?' কথাটা বুঝতে পারেনি র‍্যালফ।

ব্যাখ্যা করলেন ক্যাপ্টেন। 'কেবিনে গেলে পাঁচ ডলার দিতে হবে। তিন ডলার লাগবে বয়লারে গেলে আর ডেকের জন্য দুই ডলার ভাড়া।'

র‍্যালফ তার মানিব্যাগ খুলে কয়েকটা টাকা বের করে গুণল। বলল, 'দুটো ডেকের টিকেট, প্লীজ।' চার ডলার এগিয়ে দিল সে ক্যাপ্টেনের দিকে। 'আমার আর ওর জন্য।'

একটু দূরে দাঁড়ানো এক লোক র‍্যালফকে টাকা দিতে দেখল। তার চতুর মুখে এক টুকরো বাঁকা হাসি ফুটল। ক্যাপ্টেন টাকাটা পকেটে ঢোকালেন। কেরানী র‍্যালফকে দুটো টিকেট দিল। ক্যাপ্টেন বললেন, 'তোমরা, ওই ডেকের দিকে যাও।' আঙুলের ইশারায় জায়গাটা দেখালেন তিনি। 'ওখানে সুবিধেমত একটা জায়গা বেছে নাও।' হাসিমুখে তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন। ব্যস্ত হয়ে পড়লেন অন্য যাত্রীদের নিয়ে। একটু পর র‍্যালফদের কথা তাঁর মনেই থাকল না।

র‍্যালফ এবং কিশোর প্যাসেজ ধরে এগোল, আগ্রহ ভরে চারপাশ লক্ষ করছে। কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'উনি কোথায় থাকেন, ফ্রায়ার পয়েন্টে?'

র‍্যালফ বুঝল কিশোর তার চাচার কথা বলছে। 'জিমি চাচা কোথাও একসঙ্গে বেশিদিন থাকেন না। শেরী ফুফুকে সর্বশেষ চিঠিতে তিনি ফ্রায়ার পয়েন্টে থাকার কথাই লিখেছিলেন। ফুফু চাচাকে তো একেবারে দেখতে পারেন না। সবসময় বলেন অপদার্থ একটা!'

ওরা জানালা দিয়ে উঁকি দিল। স্তূপ করা তুলোর গাদা চোখে পড়ল। 'তোমার চাচা তোমাকে সাহায্য করবেন, র‍্যালফ?'

সজোরে মাথা ঝাঁকাল র‍্যালফ। 'অবশ্যই! অবশ্য তিনি যদি কাজে খুব বেশি ব্যস্ত না থাকেন।' কাঠের বিরাট একটা খাঁচার মধ্যে পশুপাখি আর মুরগীর বিষ্ঠা দেখে ঘৃণায় মুখ কোঁচকাল সে। 'আমার বিশ্বাস আমার চাচা সব পারেন।'

'সব?' অবাক হলো কিশোর।

'হ্যাঁ, তাই। সব।'

প্রাণীগুলোর প্রায় গা ঘেঁষে ওদেরকে চলতে হচ্ছে। গরুগুলো তারস্বরে হাম্বা ডাক ছাড়ছে, একটা খড়ের গাদার ওপরে মুরগীগুলো কক্কর কো করতে ব্যস্ত, একটা ছাগলকে দেখা গেল মহানন্দে একটুকরো কাঠ চিবোতে। পুরো জায়গা গোলাবাড়ির দুর্গন্ধে বোঝাই। র‍্যালফ নাকে হাত চাপা দিল, 'ক্যাপ্টেন কি আমাদেরকে এই জায়গাটার কথাই বলেছেন?' বিপুল বিতৃষ্ণায় চারপাশ দেখতে দেখতে মন্তব্য করল সে।

হাসল কিশোর, একটা তুলোর বস্তার ওপর লাফিয়ে বসল। 'আমি এরচেয়েও কত খারাপ জায়গায় ঘুমিয়েছি!' হঠাৎ তার চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল। হাত ক'য়েক দূরে, তুলোর বস্তাগুলোর মাঝখানে হামাগুড়ি দিয়ে বসে আছে বিয়ের পোশাক পরা অপূর্ব সুন্দরী এক তরুণী। এমন রদ্দিমার্কা জায়গায়, এই পোশাকে এরকম রূপবতী একটি মেয়েকে দেখবে কল্পনাও করেনি কিশোর। 'হেই।' চিৎকার করে উঠল সে, হাত তুলে র‍্যালফের মনোযোগ আকর্ষণ করল।

মেয়েটাকে দেখে বিস্ময়ে চোয়াল ঝুলে পড়ল র‍্যালফের। স্বর্ণকেশী, নীল নয়না মেয়েটা, লরা প্যাক্সটনও ওদেরকে দেখে যারপরনাই বিস্মিত হলো। কিন্তু বিস্ময়ের ভাবটুকু গোপন করে মুখের ওপর থেকে ঘোমটা সরিয়ে কঠিন গলায় বলল, 'ভাল ছেলেরা কখনও তুলোর বস্তায় বসে ভদ্রমহিলাদের ওপর স্পাইগিরি করে না।'

প্রতিবাদ করল কিশোর। 'না, না তা কেন করব আমরা।'

'আমরা জানতামই না আপনি এখানে আছেন,' বলল র‍্যালফ।

তরুণী কড়াচোখে দু'জনের দিকে তাকাল, কী যেন বলতে যাবে, এইসময় দূর থেকে কয়েকটি পুরুষকণ্ঠ ভেসে আসতে চুপ হয়ে গেল সে। ঠোঁটে আঙুল রাখল, ওদের চুপ করে থাকতে ইশারা করল। কী যেন শোনার চেষ্টা করল সে। দু'জন লোককে দেখা গেল প্যাসেজওয়ে দিয়ে এগিয়ে আসছে। পেছনে ক্যাপ্টেন উইলিয়াম। ওদের পরনে বিয়ের পোশাক, মাথায় টপ হ্যাট। সামনের জন লম্বা এবং সুদর্শন। তাকে খুব ক্রুদ্ধ দেখাচ্ছে। দ্বিতীয় জন মোটাসোটা, মুখখানা রাঙা, সঙ্গীর সঙ্গে হাঁটার তাল মেলাতে গিয়ে ঘেমে উঠেছে, ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাস ফেলছে।

ক্যাপ্টেনের চোখ ধারাল হয়ে উঠল। 'এক মিনিট, ভদ্র মহোদয়গণ,' পেছন থেকে ডাকলেন তিনি। 'আমি ক্যাপ্টেন উইলিয়াম। আপনাদের ভাড়া, প্লীজ!'

হাঁটার গতি একটুও মন্থর করল না লম্বা লোকটা, ঘাড় ঘুরিয়ে জবাব দিল, 'আমার বোনকে খুঁজতে এসেছি। ও এই জাহাজে আছে। বিয়ের পোশাক পরনে ছিল ওর। লম্বা সাড়ে পাঁচ ফিটের মত হবে।'

র‍্যালফ এবং কিশোর বিস্মিত চোখে চাইল লরার দিকে। তরুণীর চেহারায় শঙ্কার ছাপ।

'বিয়ের পোশাকে কোন মেয়ে আমাদের জাহাজে ওঠেনি সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত,' বললেন ক্যাপ্টেন।

লরার ভাই বিরক্ত গলায় বলল, 'বোকার মত কথা বলবেন না। ও টিকেট না করেই উঠেছে। ওর কাছে একটা ফুটো পয়সাও নেই। এই জাহাজেরই কোথাও আছে লুকিয়ে সে। নিউ অর্লিন্সে পালাবার প্ল্যান করেছে।'

প্যাক্সটনের ব্যবহারে খুবই ক্ষুব্ধ হলেন ক্যাপ্টেন। বললেন, 'ওনাকে যদি দেখি আমি তা হলে বিনা ভাড়ায় জাহাজে ওঠার দায়ে তাঁকে তীরে নামিয়ে দেব। এখন দয়া করে আপনারা নামুন। জাহাজ ছাড়ার আর দশ মিনিট বাকি।'

ঘেউ ঘেউ করে উঠল প্যাক্সটন। 'ওর খোঁজ না পাওয়া পর্যন্ত এই জাহাজ ছেড়ে আমি কোথাও যাচ্ছি না।' হাঁটতে হাঁটতে তিনজন দূরে চলে গেল।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল লরা। র‍্যালফ জিজ্ঞেস করল, 'ওই মোটকুটা

আপনার স্বামী?'

তুলোর বস্তার পেছনে আরও যেন সেঁধিয়ে গেল লরা। 'না! ওই মোটু জীবনেও আমার স্বামী হবে না। আমার ভাই ওর কাছ থেকে যত টাকাই খাক না কেন আমি মোটেও গ্রাহ্য করি না।'

মেয়েটার জন্য দুঃখ হলো র‍্যালফ এবং কিশোরের। ক্যাপ্টেন যদি এদিকে খুঁজতে আসেন তা হলে মেয়েটা নির্ঘাত ধরা পড়বে। হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল কিশোর, 'ওরা আপনার সন্ধানে এখানে যখন এসেছে তখন যে করেই হোক খুঁজে বের করবেই।'

কাঠের খাঁচাগুলো দেখাল র‍্যালফ। 'আপনাকে আমরা ওখানে লুকিয়ে রাখতে পারব।'

লরা ঘৃণায় কেঁপে উঠল। বিস্ফারিত চোখে চেয়ে দেখল মলমূত্রে ঠাসা মেঝে আর তার ওপর গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে থাকা খচ্চর, গরু, ছাগল আর মুরগীদের। 'ওখানে যাব না আমি।' দৃঢ় গলায় বলল সে।

কাঁধ ঝাঁকাল কিশোর। 'সে আপনার ইচ্ছে। ওখানে না লুকালে তো আপনাকে বিয়ে করতেই হবে।'

নাক কোঁচকাল লরা। মোটুকে বিয়ে করার চেয়ে গরু-ছাগলদের সঙ্গ ওর কাছে অনেক বেশি স্বস্তিদায়ক মনে হলো। সাবধানে খোঁয়াড়ে ঢুকল সে, খড়ের একটা গাদার নীচে যথাসম্ভব গা বাঁচিয়ে বসল। মুরগীগুলো ক্যাঁকর কোঁ করে প্রতিবাদ জানাল এহেন অনুপ্রবেশে। পুরুষ কণ্ঠ আবার শুনতে পেল লরা। কাছিয়ে আসছে পায়ের শব্দও।

'লরা নিশ্চয়ই তার মত পরিবর্তন করেছে, ডেভিড,' রাঙামুখ বলল। গরমে ঘামতে ঘামতে সে ভাবল ডেকে খোঁজাখুঁজি করাটা নিতান্তই মর্যাদাহানির ব্যাপার হবে। একটা কথা ভেবে সে স্বস্তি পেল, এরকম লেজে-গোবরে অবস্থায় তাকে তার কোন বন্ধুর মুখোমুখি পড়তে হয়নি। তার বাগদত্তা স্ত্রী শেষমুহূর্তে বিয়ের আসর থেকে ভেগে গেছে শুনলে তারা যে কী হাসাহাসি করবে!

ডেভিড পাক্সটনের মুখ হাঁড়ি হয়ে আছে। ভেবেছিল বোনটার বিয়ে দিয়ে নগদ যে টাকাটা পাবে তাতে অনেকদিন কোন কাজ না করে হেসেখেলে কাটিয়ে দেয়া যাবে। ধনী হওয়ার এই সহজ রাস্তাটাকে লরা এভাবে গুবলেট করে দেবে কল্পনাও করেনি সে। মেয়েটা ভারী অকৃতজ্ঞ তো! 'গাধার মত কথা বোলো না!' ধমকে দিল সে রাঙামুখকে। 'লরা খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছিল। বিয়ের দিন সব মেয়েই এরকম নার্ভাস হয়।'

গলায় আওয়াজ কাছিয়ে আসছে, র‍্যালফ আর কিশোর মুরগীগুলোর গায়ে আদর করে চাপড় দিতে লাগল যেন ওদের মনোযোগ এদিকে কেন্দ্রীভূত হয়। প্যাক্সটন দেখল ওদের। দ্রুত এগিয়ে এল সে, র‍্যালফের একটা হাত কঠিন মুঠোয় চেপে ধরে বলল, 'বিয়ের পোশাকে কোন মেয়েকে এদিকে আসতে দেখেছ?' ঝাঁকি দিল সে র‍্যালফকে। 'জবাব দাও।'

র‍্যালফ হাত ছাড়াবার চেষ্টা করল। 'এখানে মেয়ে আসবে কোথেকে? ছাড়ুন আমাকে!' মোচড় দিয়ে নিজেকে মুক্ত করল সে। প্যাক্সটন বড় বড় পিপে আর তুলোর বস্তার মধ্য দিয়ে আড়াআড়ি ভাবে এগোল। 'আমাদের বোধহয় ফিরে যাওয়া উচিত।' করুণ গলায় বলল বর বেচারা। 'অতিথিদের বলব অনিবার্য কারণে বিয়েটাকে কয়েকদিন পিছিয়ে দেয়া হয়েছে।'

'বলে কেলেঙ্কারি বাধাই আর কী।' আবারও ধমক দিল প্যাক্সটন। জন্তু জানোয়ারদের খোঁয়াড়ের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল সে। 'ওখানে কী?'

ক্যাপ্টেন উইলিয়াম অনেক কষ্টে মেজাজ ঠাণ্ডা রাখলেন। 'জন্তু জানোয়ারের খোঁয়াড়ের মধ্যে কোন বধূ লুকাবে জীবনেও শুনিনি আমি...'

ক্যাপ্টেনের বক্রোক্তি গায়ে মাখল না প্যাক্সটন, ঘোঁত ঘোঁত করে উঠল সে। একটা খোঁয়াড়ের ওপর চড়ে বসল। ভয়ানক প্রতিবাদ করে উঠল একটা খচ্চর, একপা পিছিয়ে গেল ওটা।

ঢোক গিল র‍্যালফ। লরা যে খড়ের গাদার আড়ালে লুকিয়ে আছে সেখান থেকে খড় খেতে শুরু করেছে একটা ছাগল। একটু পরেই লরার ঘোমটাটা চোখে পড়ল ওটার। মুখে পুরে চিবোতে শুরু করল। খুবই সুস্বাদু ঠেকল তার কাছে জিনিসটা। লরার সঙ্গে যে ফুলের তোড়াটা ছিল ওটাও দেখে ফেলল ছাগলটা। ফুলগুলো তার কাছে এতই লোভনীয় ঠেকল যে সঙ্গে সঙ্গে তোড়ায় মুখ দিল সে। এখন যে কোন মুহূর্তে লরার উপস্থিতি প্রকাশ হয়ে যেতে পারে।

কিন্তু প্যাক্সটন ছাগলটার দিকে তাকাল না। 'ওপরে যাব। চলো।' গোমড়ামুখে বলল সে।

ক্যাপ্টেন উইলিয়াম এই গাধাগুলোর পেছনে অনর্থক অনেক সময় নষ্ট করেছেন। ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল তাঁর। কর্তৃত্বের সুরে তিনি বললেন, 'কোয়াহামার টিকেট না কেনা পর্যন্ত আপনাদের আর কোথাও সার্চ করতে দেয়া হবে না। নয়তো আপনাদের এক্ষুণি তীরে নামিয়ে দেয়া হবে।'

প্যাক্সটন আর তার সঙ্গী জোরাজুরি করে আর লাভ হবে না বুঝতে পেরে বিরসবদনে ফিরে চলল।

'ওরা চলে গেছে,' কিশোর উঁচু গলায় ঘোষণা করল। দু'জনে মিলে লরাকে তার লুকানো জায়গা থেকে দ্রুত বের করে আনল। ক্ষুধার্ত ছাগলটাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল একপাশে।

লরা সোজা হয়ে দাঁড়াল, চুল আর পোশাক থেকে খড়কুটো ঝাড়তে লাগল। ঘোমটাটা অর্ধেক খেয়ে ফেলেছে ছাগলটা, কিন্তু সে ওটাকেই ঠিকঠাক করে হ্যাটের মত মাথায় পরল। তার ঠাণ্ডা, নিরুদ্বেগ আচরণ মুগ্ধ করল ছেলেদের। গ্যাংওয়েতে এসে দাঁড়াল লরা। চোখের ওপর থেকে একটা চুল সরিয়ে বলল, 'এই মুহূর্তে লেডিস কেবিনে না যাওয়া ছাড়া আমার কোন উপায় নেই।' কিশোরদের বিস্মিত চোখের সামনে লম্বা পা ফেলে সে এগোল সামনে। একবারও পেছন ফিরল না।

র‍্যালফ এবং কিশোর পরস্পরের দিকে চাইল, মেয়েটার ব্যবহারে ভয়ানক অবাক দু'জনেই। 'ছাগলটা তো তাঁর তেমন কোন ক্ষতি করতে পারেনি,' বিড়বিড় করে বলল কিশোর। 'উনি আমাদের একটা ধন্যবাদ অন্তত দিতে পারতেন।' আধ খাওয়া ফুলের তোড়াটা মেঝে থেকে তুলল সে, শুঁকল, তারপর ছুঁড়ে দিল ছাগলটার দিকে।

জাহাজের এঞ্জিনের শব্দ শুনতে পেল ওরা এইসময়, আবার যাত্রা শুরু করেছে সী এঞ্জেল। অবশেষে তারা দেখা করতে চলেছে তাদের জিম চাচার সঙ্গে!

তিন

চিমনি দিয়ে কালো ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সী এঞ্জেল রাজকীয় চালে এগিয়ে চলল সাদা জল কেটে। প্রচণ্ড গরম পড়েছে। র‍্যালফ কিশোরকে নিয়ে ওপরের ডেকে চলে এল। কৌতূহল—মেয়েটা কোথায় গেছে দেখবে। ফার্স্টক্লাসের যাত্রীদের কেউ কেউ ছোট দলে ভাগ হয়ে গল্প করছে, কেউ রেলিং-এ ভর দিয়ে নদী তীরের দৃশ্য দেখছে। তীরে প্রচুর গাছপালা, যেন গভীর জঙ্গল। লম্বা ঘাসের মধ্যে হরিণ দেখা গেল, ছোটাছুটি করছে। মাঝে মাঝে ওগুলো কিনারায় এসে অবাক চোখে চাইছে সীমাহীন বিস্তৃত জলরেখার দিকে। একটা কচ্ছপ আরামে রোদ পোহাচ্ছে তীরে, বিচিত্র বর্ণের পাখিরা কিচিরমিচির করতে করতে উড়ে যাচ্ছে মাথার ওপর দিয়ে,

পোকামাকড়দের গুঞ্জন; সব মিলে প্রকৃতির সঙ্গে মিশে যাওয়ার মত একটি পরিবেশ বটে।

যাত্রীদের দামী, রঙচঙে পোশাক কৌতূহলী করে তুলল র্যালফ আর কিশোরকে। চোখ ফেরাতে পারছে না ওরা। কিন্তু কিশোর র্যালফের হাত ধরে টান দিল, 'এখানে আরও বেশিক্ষণ থাকলে বিপদ হতে পারে, র্যালফ।' সতর্ক করল সে বন্ধুকে।

'ধরা পড়লে ওরা বড়জোর আমাদেরকে নীচে নামিয়ে দেবে, এই তো!' বলল র্যালফ। হঠাৎ গোড়ালি উঁচু করল সে, উঁকি দিল একটা জানালায়। উত্তেজিত গলায় বলল, 'এই কিশোর, দেখ!'

দুই বন্ধু মুখ ঠেকাল জানালার কাঁচে। জানালার ওপাশে বড় একটা গ্যাম্বলিং রুম। সুদৃশ্য পোশাক পরা পুরুষরা কয়েকটা টেবিল ঘিরে বসে আছে, সবার হাতে কার্ড। একটা টেবিলে বেশ ভিড়। পেশাদার এক জুয়াড়ী জুয়ো খেলছে ওখানে। চ্যালেঞ্জ করছে সে অন্য জুয়াড়ীদেরকে। পারলে যেন তারা তাকে হারায়। ক্যাপ্টেন উইলিয়াম দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন। চোখ বোলাচ্ছেন যাত্রীদের ওপর। র্যালফের চোখ বড় বড় হয়ে উঠল ক্যাপ্টেনের পাশে দাঁড়ানো তরুণীকে দেখে। এতদূর থেকেও মেয়েটাকে চিনতে পারল সে।

'এই, উনি সেই মহিলা, না?' জিজ্ঞেস করল কিশোর। মাথা ঝাঁকাল র্যালফ। 'হ্যাঁ। কিন্তু এখানে উনি কী করছেন?'

ওরা দেখল মেয়েটা ইতস্তত ভঙ্গিতে গ্যাম্বলিং রুমে ঢুকল। বিনীত হেসে এগিয়ে গেল পেশাদার জুয়াড়ীর টেবিলের দিকে, চেহারায় ভারী নিষ্পাপ ভাব। এত সুন্দরী একটি মেয়েকে এরকম একটি জায়গায় দেখে অবাক হয়ে গেল সবাই। খেলা বন্ধ করে কৌতূহলী চোখে তাকাল। কিন্তু লরা তাদের দৃষ্টি অগ্রাহ্য করে টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল। পেশাদার জুয়াড়ী বাতাসে শব্দ তুলে ডিল করছে কার্ড। উপস্থিত লোকজনদের উদ্দেশ্য করে বলল, 'চলে আসুন। আমি আপনাদের টাকা মারব না। আমি শুধু দেখব আমি যেন জিততে পারি।'

লালমুখো এক কৃষক পকেট থেকে কয়েকটা রুপোর ডলার বের করল। 'চমৎকার, স্যার,' বলল জুয়াড়ী। 'এখন মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করুন এই আমি "বেবি" কার্ড থেকে দুটো টেক্কা তুলে নিলাম। আবার টেবিলেই কার্ড দুটো রেখে দিচ্ছি।' উৎসাহ দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল সে। 'এখন আপনাকে বলতে হবে কোনটা "বেবি" কার্ড।' ইতস্তত করল কৃষক,

তারপর মাঝখানের কার্ডটার দিকে আঙুল দেখাল। খুব কষ্ট পাবার ভান করল জুয়াড়ী, কার্ডটা তুলে নিল হাতে। বলল, 'দুঃখিত স্যার। আপনি একটুর জন্য ফস্কে গেছেন। এটা নয়, ওটা ছিল "বেবি" কার্ড।' খেলায় হেরে বিরস মুখে চলে গেল কৃষক।

ডলারগুলো পকেটে পুরে আবার হাঁক ছাড়ল জুয়াড়ী। 'ভয় পাবেন না, ভাইসব। আপনারা যদি আগেই ভয় পেয়ে যান, ভাবেন জিততে পারবেন না, তা হলে তো সত্যি জিততেও পারবেন না। কিন্তু ভাইসব, একটা কথা সবসময় মনে রাখবেন, আমি কখনও ভিখিরি, পঙ্গু কিংবা বৃদ্ধা দাদী-নানীদের কাছ থেকে টাকা নেই না।' খুব যেন রসাল একটা মন্তব্য করেছে এমন ভান করে জুয়াড়ী হাসতে হাসতে চারপাশে নজর বোলাল, পরবর্তী শিকার খুঁজছে।

লরা মনস্থির করে ফেলল। 'যদিও আমি জুয়ো খেলি না, কিন্তু যদি এখন বাজি ধরি, অনুমতি পাব কি?' মধুর একটি হাসি উপহার দিল সে ক্যাপ্টেন উইলিয়ামকে। 'অবশ্য ক্যাপ্টেন উইলিয়াম যদি না আপনার কোন আপত্তি থাকে।'

ক্যাপ্টেন উইলিয়াম কোনই আপত্তি করলেন না। লরার প্রস্তাব তাঁকে বিস্মিত করলেও, চেহারায় ভাবটা ফুটতে দিলেন না। বললেন, 'না, না আপত্তি কীসের? আমাদের এই টেক্সাস গ্যাম্বলিং ডেকে আপনাদের মত সম্ভ্রান্ত মহিলারা তো আসেনই না, খেলা দূরে থাক।'

মাথা দোলাল লরা, তারপর ঘুরে দাঁড়াল ক্যাপ্টেনের দিকে পিঠ ফিরে। 'কী ধরনের খেলা এটা?' জিজ্ঞেস করল সে জুয়াড়ীকে।

জুয়াড়ী বিস্ময়ে ভ্রূ ওপরে তুলল, অভিজাত চেহারার এই তরুণীকে বোধহয় সে এখানে আশা করেনি। 'ওহ্, খেলাটা খুব সোজা,' ব্যাখ্যা করল সে। 'আমরা এটাকে তিনকার্ডের খেলা বলি। প্রথমে আমি তিনটে কার্ড এভাবে মেলে দেখাই। দুটো টেক্কা আর অন্যটা "বেবি" কার্ড।' কার্ডগুলো ওপরে তুলে ধরল সে।

লরা লোকটার নড়াচড়া লক্ষ করছে। 'আমি কার্ডগুলোকে এবার উপুড় করে টেবিলে রাখলাম।' বলে চলল জুয়াড়ী। 'তারপর আবার ওগুলোকে এলোমেলো করে দিচ্ছি। খেয়াল করুন, এরমধ্যে কিন্তু কোন জোচ্চুরি নেই। জেতাটা স্রেফ ভাগ্যের ব্যাপার। আপনাকে এই তিনটে কার্ড থেকে "বেবি" কার্ডটাকে খুঁজে বার করতে হবে। যদি পারেন তা হলেই আপনি বাজি জিতবেন।'

লরা উৎসাহী হয়ে বলল, 'বাঃ, বেশ মজা তো!' টেবিলের দূরপ্রান্তে বসা জুয়াড়ী জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কত টাকা বাজি ধরতে চান? ভেবেচিন্তে বলুন, ভদ্রমহোদয়া।'

লরা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বসে পড়ল। বলল, 'আসলে এ ব্যাপারে আমার কোন আইডিয়া নেই। আ...আচ্ছা...পাঁচশো ডলার ধরলে চলবে?'

খাবি খেলো জনতা। জুয়াড়ীকে হতবুদ্ধি দেখাল। র‍্যালফ আর কিশোর জানালা দিয়ে দেখছে গোটা দৃশ্যটা, নিজেদের কানকে যেন বিশ্বাস করতে চাইল না। ফিসফিস করল কিশোর, 'ওনার কাছে পাঁচশো ডলার দূরে থাক পাঁচ সেন্টও নেই বলেই তো জানতাম!'

জুয়াড়ীর চেহারায় সন্দেহের ছায়া। এত বড় বাজির খেলা জীবনে খেলেনি সে। বলল, 'কিন্তু ভদ্রমহোদয়া, আপনার টাকাটার চেহারা যে আমাকে আগে দেখাতে হবে। আর মনে রাখবেন, জেফ ডেভিসের টাকা কিন্তু অন্য লোকের পকেটে যেতে চায় না।' তার কথায় হেসে উঠল সবাই।

ঝট করে উঠে দাঁড়াল লরা, রাগে মুখ লাল। কঠিন গলায় বলল, 'ভদ্রমহোদয়, আপনি দক্ষিণের এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা বলছেন, মনে রাখবেন। আমার সত্যবাদিতা সম্পর্কে আজ পর্যন্ত কেউ কোন কথা তুলতে পারেনি।'

কিশোর আর র‍্যালফ খুবই অবাক হলো। মেয়েটা পাগল হয়ে যায়নি তো! ক্যাপ্টেন উইলিয়াম এবার হস্তক্ষেপ করলেন, 'বাজিতে যিনি হারবেন তাকে বাজির টাকা পরিশোধ করতেই হবে। যদি কেউ শঠতা করেন, তিনি যেই হোন না কেন, আমি তাঁকে আমার জাহাজ থেকে নামতে বাধ্য করব।'

শান্ত থাকল লরা, ক্যাপ্টেনের হুমকি তাকে স্পর্শই করেনি। কিশোর আর র‍্যালফের খুব অস্বস্তি লাগছে। পেশাদার জুয়াড়ীটা একটা প্রতারক। তার পা আর চেয়ারের মাঝখানে লুকানো কার্ডটা দেখেই যা বোঝার বুঝে নিয়েছে ওরা।

কিশোর খসখসে গলায় বলল, 'দেখেছ ওটা?'

মাথা ঝাঁকাল র‍্যালফ। 'ওটা নিশ্চয়ই "বেবি" কার্ড। ভদ্রমহিলা জীবনেও ওর ঠগবাজি ধরতে পারবেন না।'

কিশোর খুব হতাশ হলো। 'টাকা দিতে না পারলে উনি খুবই ঝামেলায় পড়বেন।'

সেলুনের ভেতরের বাতাস যেন উত্তেজনায় স্থির হয়ে আছে। পেশাদার জুয়াড়ী বিদ্যুৎগতিতে তাস শাফল্ করল। তারপর বলল, 'ঠিক আছে,

এখন···এখন ভাল করে এদিকে নজর দিন, আমি খুব আস্তে কাজটা করব। কারণ শত হলেও আপনি সুন্দরী এক নারী। এই যে দেখুন! তাসগুলো সব আস্তে করে উল্টে রাখলাম। এখন আপনাকে বলতে হবে: "বেবি" কার্ড কোনটা?'

ইতস্তত করল লরা। 'আচ্ছা, আমাকে একটু ভাবতে দিন।' তার আঙুলগুলো আলতোভাবে ছুঁয়ে গেল প্রথম কার্ডটা, তারপর দ্বিতীয়টা। 'আহ্, ওইটা···না, আহ···এইটা!' মাঝখানের কার্ডটা সে শক্তহাতে চেপে ধরল। জুয়াড়ী হাত বাড়াল কার্ডটাকে উল্টে দেখার জন্য কিন্তু লরা আঙুল চেপেই রাখল, ভারী সরল মুখ করে সে বলল, 'ইস্, আমি ওটার দিকে তাকাতেই পারব না। আপনি অন্য কার্ড দুটো কেন তুলছেন না?'

জুয়াড়ীর মুখ অন্ধকার হয়ে গেল। কঠিন গলায় সে বলল, 'এটা···এটা ওভাবে খেলা হয় না, ভদ্রমহোদয়া।' লরা তার সুন্দর চোখ তুলে তাদেরকে ঘিরে দাঁড়ানো ভিড়টার দিকে একবার চাইল, তারপর দৃষ্টি ফেরাল টেবিলে! হাত দিয়ে চেপে রাখা কার্ডটার দিকে চেয়ে সে বিড়বিড় করে বলল, 'আচ্ছা, এটা যদি একটা টেক্কা হয়···' দ্রুত বাঁ পাশের কার্ডটা ওল্টাল সে, '···আর এটাও যদি আরেকটা টেক্কা হয়,' এবার ডানধারের কার্ডটা সে তুলল, '···তা হলে এই তৃতীয়খানা অবশ্যই "বেবি" কার্ড হবে। যুক্তি তো তাই বলে, তাই না?'

সায় দিল সবাই, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক তাই।'

উঠে দাঁড়াল লরা, মাঝখানের কার্ড থেকে হাত সরাল, জানে জুয়াড়ী নিজের স্বার্থেই ওটা ওল্টাবে না। কারণ এই কার্ডটাও আসলে একখানা টেক্কা। এই কার্ডখানা ওল্টানো মানে তার জোচ্চুরি ধরা পড়া। লরা লোকটার মুখের দিকে সরাসরি তাকাল, 'জনাব, খেলাটা যদি আমি বুঝে থাকি, তা হলে আপনার কাছে আমার এখন পাঁচশো ডলার পাওনা হয়েছে।' হাত বাড়াল সে। মনে মনে নিজেকে অভিশাপ দিল জুয়াড়ী, কল্পনাও করেনি একটা মেয়ের কাছে এভাবে ফেঁসে যাবে। মুখ কালো করে সে হাত ঢোকাল পকেটে, একমুঠো ডলার বের করল।

লরাকে অভিনন্দন জানালেন ক্যাপ্টেন উইলিয়াম। জনতাও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল তার প্রশংসায়। জানালার শাটারের পেছনে দাঁড়ানো র‍্যালফ আর কিশোর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। শুধু জুয়াড়ীর চেহারা পেঁচার মত হয়ে থাকল। তার কাছে পাঁচশো ডলার নেই। ক্যাপ্টেন তাকে আচ্ছামত ধোলাই করলেন। জুয়াড়ী বাধ্য হলো তার মূল্যবান একটি আংটি দিয়ে টাকা শোধ

করতে। 'হীরের এই আংটিটার দাম একশো ডলারেরও বেশি।' বলল সে লরাকে, 'আপনার বাকি টাকা এতেই শোধ হয়ে যাবে।'

লরা আংটি নিল বটে কিন্তু সন্দেহের চোখে ওটাকে পরখ করল। 'না, না এভাবে আংটি নেয়ার আমার কোন ইচ্ছে ছিল না।' নাটকীয় গলায় বলল সে। 'তবে কিনা টাকা শোধ না করার দায়ে আপনাকে নির্জন সৈকতে নামিয়ে দেয়া হবে এটাও আমার পছন্দ নয়।' দুষ্টু হাসি ফুটল তার ঠোঁটে। 'আচ্ছা, আমরা কেন এই ভদ্রলোকদের "বেবি" কার্ডটা দেখাই না?' হাত বাড়াল সে টেবিলের দিকে, যেন কার্ডটা তুলবে।

আর্তনাদ করে উঠল জুয়াড়ী। 'না...না। ওটাকে আর দেখাতে হবে না।' দ্রুত সে সবগুলো কার্ড একত্র করল, তারপর ঢোকাল পকেটে। 'আচ্ছা, ভদ্রমহোদয়গণ, আজকের মত খেলা এখানেই শেষ। শুভ দিন!' যেন পালিয়ে বাঁচল সে।

খুশিমনে লরা ক্যাপ্টেনকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'ক্যাপ্টেন, আমার থাকার ব্যাপারে একটা কথা বলতে চাইছিলাম।' হাসল সে। 'আমার জন্য ভাল একটা কেবিনের ব্যবস্থা করুন।'

'অবশ্যই, অবশ্যই!' বললেন ক্যাপ্টেন। তাঁর চোখ আটকে গেল লরার লম্বা গাউনে। 'আচ্ছা, কিছু মনে করবেন না, আপনি কী...'

ক্যাপ্টেন কী বলতে চাইছেন বুঝতে পেরেছে লরা, দ্রুত সে প্রসঙ্গটার পরিসমাপ্তি টানল। 'না, আপনি যা ভাবছেন সে সব কিছু নয়। বাই, বাই.' পায়ের কাছে গাউন উঁচু করে সে গটগট করে এগোল ডেকের দিকে। কিশোর আর র‍্যালফ হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে থাকল। কিন্তু বেশিক্ষণ ডেকে দাঁড়াতে সাহস পেল না। না জানি আবার ক্যাপ্টেন উইলিয়ামের চোখে পড়ে যায়। ওরা একটা স্ন্যাক খেয়ে আবার খোঁয়াড়ে গিয়ে ঢুকল। কোনমতে গাদাগাদি করে শুয়ে পড়ল। কিন্তু ক্লান্তিতে ঘুম এসে গেল খানিক পরেই। জানলও না বিপদ আসছে নিঃশব্দে।

রাত। র‍্যালফ আর কিশোর যেখানে ঘুমিয়ে আছে সেখানে এক লোক এসে হাজির হলো। তার হাতে খোলা ছুরি। ঘুমন্ত র‍্যালফের ওপর ঝুঁকল সে, মশালের আলোয় ঝিকিয়ে উঠল ধারাল ব্লেড। একটানে সে র‍্যালফের পকেট কেটে ফেলল, বের করল মানিব্যাগ। খোঁয়াড়ে সে ঢুকেছিল নিরাপদেই, কিন্তু মানিব্যাগ নিয়ে পালানোর সময় তুলোর একটা বস্তার ওপর দিয়ে নীচে লাফিয়ে পড়তেই একটা ঘোড়া ভয়ে চিঁহিঁহিঁ করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে জেগে গেল র‍্যালফ। অন্ধকারেও সে পলায়নপর আগন্তুককে

আবছাভাবে দেখল। বিদ্যুৎগতিতে তার হাত চলে গেল পেছনের পকেটে, হাহাকার করে উঠল। নেই! মানিব্যাগ নেই!! শুধু টাকা নয়-মূল্যবান ম্যাপটাও ওটার মধ্যে ছিল।

একলাফে উঠে দাঁড়াল র‍্যালফ। 'হেই! আমার জিনিস ফেরত দাও!'

চোখ মুছতে মুছতে উঠল কিশোর। র‍্যালফ তার দৃষ্টিসীমার প্রায় বাইরে চলে গেছে, চিৎকার করছে তারস্বরে, 'বাঁচাও! চোর! চোর!'

আগন্তুক একটা সিঁড়ি লক্ষ্য করে ছুটল। দৌড়াতে দৌড়াতে মানিব্যাগ থেকে টাকা বের করে পকেটে পুরল। র‍্যালফ ধরে ফেলল ওকে। কিন্তু প্রচণ্ড ধাক্কায় ছিটকে পড়ল ডেকে। লোকটা ওর দিকে তাকাল। আধো আলোতে লোকটাকে চিনতে পারল র‍্যালফ। টিকেট করার সময় একে জাহাজের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে সে। ডকে কাজ করে লোকটা, একটা ছ্যাঁচোড়। লোকটা বাইরে তাকাল, মনে হচ্ছে মানিব্যাগটা নদীতে ফেলে দেবে।

র‍্যালফ ছুটে গেল চোরটার দিকে। ম্যাপটা তার চাই, কোনমতেই ওটাকে হাতছাড়া করা যাবে না। 'বাঁচাও! বাঁচাও!' চিৎকার করতে লাগল সে। 'আমার টাকা চুরি করেছে। চোর!'

চিৎকারে কাজ হলো। লরাকে দেখা গেল বেরিয়ে এসেছে তার কেবিন থেকে। চোরটা ছুটে পালাবার জন্য পা বাড়াল কিন্তু লরা তার পথ রোধ করে দাঁড়াল। 'এই দাঁড়াও ওখানে!' বলল সে। 'দাঁড়াও বলছি।'

'চোর!' ডেক ধরে ছুটে আসতে আসতে চিৎকার করল র‍্যালফ।

'এখানে কী করছ?' ধমকে উঠল লরা। 'এখানে কী করছ শুনি?'

কৈফিয়ৎ দেয়ার সময় কিংবা ইচ্ছে কোনটাই লোকটার নেই। ধরা পড়ার ভয়ে মরিয়া হয়ে উঠেছে সে। লরাকে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে চাইল সে। কিন্তু লরা পথ ছাড়ল না। হিংস্র হয়ে উঠল আগন্তুক, দাঁত বেরিয়ে পড়ল। মুখ দিয়ে বিশ্রী একটা শব্দ করে জাপটে ধরল সে লরাকে। এক ঝটকায় মাথার ওপর তুলে ফেলল, পরক্ষণে ছুঁড়ে দিল বাইরে। 'প্লপ': ভোঁতা একটা আওয়াজ ভেসে এল নীচ থেকে, নদীতে পড়ে গেছে লরা।

রাতের অন্ধকার চিরে ভেসে এল তার তীব্র আর্তনাদ। 'বাঁচাও! বাঁচাও!'

আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে উঠল র‍্যালফের চোখ। রেলিং-এর দিকে ছুটে গেল, ঝুঁকে নীচের দিকে তাকাল। ঢেউয়ের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে লরা, অবস্থা দেখে মনে হলো ডুবে যাবে। 'ভয় পাবেন না। আমি আসছি!' চিৎকার করে বলল ও, পরক্ষণে লাফিয়ে পড়ল নীচের কালির মত কালো

জল লক্ষ্য করে।

কিশোর র‍্যালফের পিছু পিছু আসছিল। বন্ধুকে নদীতে লাফিয়ে পড়তে দেখে ভয়ে বুক শুকিয়ে গেল তার। এখনও চোখে ঘুম কিশোরের, পিট পিট করে নীচে চাইল। অনেক নীচ দিয়ে ফোঁপানির মত আওয়াজ ভেসে আসছে। রেলিং বেয়ে উঠল কিশোর, চোখ বুজল, নিঃশ্বাস বন্ধ করে দিল লাফ।

লাফানোর পর ডুবে গিয়েছিল র‍্যালফ। ভেসে উঠেই পাগলের মত খুঁজতে শুরু করল লরাকে। হঠাৎ তাকে দেখতে পেল সে। লরার দিকে সাঁতার শুরু করতেই কিশোরের চিৎকার ভেসে এল, 'র‍্যালফ, সাবধান!' কিছু বুঝে ওঠার আগেই বিশাল এক ঢেউ গ্রাস করল র‍্যালফকে। পাহাড় সমান ঢেউটার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল সে। র‍্যালফ যেখানে অদৃশ্য হয়ে গেছে সেই দিক লক্ষ করে সাঁতরাতে শুরু করল কিশোর।

একটু পরেই আবার ভেসে উঠল র‍্যালফ। 'ও ও ও...' মুখ হাঁ করে শ্বাস টানল সে। মাথা ঘোরাতেই কিশোর আর লরাকে পাশেই দেখতে পেল। আতঙ্কিত তিনজন এবার তীর লক্ষ্য করে সাঁতরাতে শুরু করল।

চার

তার সকল সৌন্দর্য নিয়ে রাতের আঁধার কেটে জেগে উঠল ভোর। নদীর ওপর মস্ত সাপের মত ঝুলে থাকল কুণ্ডলী পাকানো ধূসর কুয়াশা। সকালের প্রথম মিষ্টি আলো আলিঙ্গন করল লরাকে। র‍্যালফ আর কিশোরের কাছ থেকে খানিকটা দূরে, একটা ঝোপের সামনে দাঁড়িয়ে জামাকাপড় নিংড়ে জল বের করছে সে। তেতোমুখে অসংখ্য ভাঁজ পড়া পোশাকটা সমান করার ব্যর্থ চেষ্টা চালাল লরা। নোংরা আর কাদায় মাখামাখি গাউনটা এখন আকৃতিহীন একটা কম্বলে পরিণত হয়েছে।

ঝোপটার সামনে, একটা কাঠের গুঁড়ির ওপর বসে আছে কিশোর আর র‍্যালফ, লরার গালমন্দ শুনছে কুণ্ঠিত মনে। সত্যি তো লরার এই অবস্থার জন্য তারাই দায়ী।

হাত ওপরের দিকে তুলে বিস্ফোরিত হলো লরা, 'জাহাজ ঘাটা থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে এই পোশাকে আমার মত একটা সুন্দরী, স্মার্ট মেয়ে।

ওহ্, ভাবাই যায় না!'

র‍্যালফ আর কিশোর মাটির দিকে চেয়ে রইল। র‍্যালফ মিনমিন করে বলল, 'শুধু আপনার একার অবস্থা তো খারাপ নয়। আমারও তো চারশো ডলার চুরি গেছে।'

দাবড়ে উঠল লরা। 'আরে রাখো তোমার টাকা। তোমাদের জন্যেই তো আজ আমার এই অবস্থা।' ঢোক গিলল র‍্যালফ। ভীরু গলায় বলল, 'আমরা তো আপনাকে বাঁচাতে গিয়েছিলাম।'

লরা চেঁচিয়ে উঠল। 'বাঁচাতে গিয়েছিলে, না? এরচে' মানুষখেকোরাও আমাকে ভালভাবে বাঁচাতে পারত। যাকগে, তোমরা ওই জাহাজে কি করছিলে?'

'আমরা ইয়েতে যাচ্ছিলাম...' বলল র‍্যালফ।

'মানে ফ্লোরিডা যাচ্ছিলাম।' যোগ করল কিশোর।

'জ্বী জ্বী, তাই।' চোখ ইশারায় কিশোরকে সতর্ক করল র‍্যালফ।

বিরক্ত মুখে লরা তার শতচ্ছিন্ন পোশাক ঝোপের ওপর মেলে দিল শুকাবার জন্য। একই সঙ্গে তার মুখ চলছে। এখন তার পরনে শুধু অন্তর্বাস। তাও কয়েক জায়গায় ছেঁড়া। ছেলেরা লজ্জায় রাঙা হয়ে অন্য দিকে মুখ ফেরাল। ওদের দুইবাহু চেপে ধরে লরা গর্জে উঠল। 'অনেক ঢঙ হয়েছে। এখন আমার দিকে চাও! আমি চাই তোমরা আমার দিকে তাকিয়ে যা জিজ্ঞেস করব তার সরাসরি জবাব দেবে।'

র‍্যালফ লাজুক গলায় বলল, 'আপনি যদি গায়ে কিছু দিতেন তা হলে আমরা আপনার দিকে ফিরতে পারতাম।'

ওদের বিনীত ভাবকে পাত্তাই দিল না লরা। বলল, 'অত লজ্জা পেতে হবে না। এখন বলো, তোমরা ওখানে কী করছিলে?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল কিশোর। অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে এখন এই একরোখা মেয়েটার কৌতূহল নিরসন না করে উপায় নেই। লরা ওদের সাহায্য করতে পারে এই আশায় সে ঘটনাটা বলতে শুরু করল। লরার মুখ থেকে বিরক্তির কুঞ্চিত রেখা দূর হয়ে ফুটে উঠল প্রকৃত বিস্ময়। গভীর মনোযোগে সে পুরো গল্পটা শুনল। তারপর অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। ধীর পায়ে তিনজন হাঁটতে লাগল নদী তীর দিয়ে। কিশোর শেষ করল... 'তারপর আমরা শয়তান রিডলারের চোখ ফাঁকি দিয়ে বুড়ো স্নাইডারের নৌকা চুরি করে পালিয়ে আসি।'

'তোমাদের কাছে ম্যাপটা এখনও আছে?' গল্পটা লরার এখনও বিশ্বাস

হচ্ছে না।

'চোরটা ওটাকে নদীতে ফেলে দিয়েছে।'

'ওই ম্যাপে কি ছিল?'

মাথা নাড়ল কিশোর। 'সে কথা আমরা আপনাকে বলতে পারব না, ম্যাম।'

'আপনার ভালর জন্যেই কথাটা আপনাকে আমরা বলব না।' লরা রেগে যাচ্ছে দেখে তাড়াতাড়ি বলল র‍্যালফ।

'কিন্তু আপনি যেহেতু আমাদের সাহায্য করেছেন,' বলল কিশোর, '...আর টাকা পয়সা, জামাকাপড় সব আমাদের কারণেই খুইয়েছেন, ঠিক আছে, আমরা যা খুঁজছি সেটা পেলে আপনার সব ক্ষতিপূরণ দিয়ে দেব।'

লরা একটা ভুরু তুলল। ঠাট্টার সুরে বলল, 'সে তোমাদের দয়া!' বলল বটে কিন্তু ওদের একটা কথাও সে বিশ্বাস করেনি।

হাঁটতে হাঁটতে ওরা সরু, আঁকাবাঁকা একটা রাস্তায় চলে এল। এই বিষয়টা নিয়ে কিশোরের আর কথা বলতে ভাল লাগছিল না। সে দ্রুত অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল। 'আপনি তো কখনও তিনকার্ড খেলেননি। তা হলে কী করে জিতলেন?'

হাসল লরা। 'আমার ভাই'র কাছ থেকে একটা জিনিস অন্তত আমি শিখেছি। আর তা হলো কী করে প্রতারক চেনা যায়।'

ধুলোর একটা মেঘ দেখতে পেল ওরা দূরে। সম্ভবত কোন গাড়ি আসছে। ওদের অনুমান সত্য। একটু পরেই ক্যাঁচ কোঁচ করতে করতে দু'চাকার একটা গাড়ি এসে থামল ওদের সামনে লরা হাত তুলতেই। গাঁইয়া এক লোক, খোঁচা দাড়ি, মাথায় কোঁচকানো, পুরানো টুপি। 'ওয়াও' মুখ দিয়ে অদ্ভুত একটা শব্দ করে খচ্চরটার লাগাম টেনে ধরল সে।

'সবচেয়ে কাছের শহরটা এখান থেকে কতদূর?' গলায় মধু ঢেলে জিজ্ঞেস করল লরা।

বুড়ো আঙুল দিয়ে কাঁধের পেছনে নির্দেশ করল লোকটা। 'সবচেয়ে কাছের শহর কোহোমা মাইল সাতেক দূরে।'

'সাত মাইল! আপনি কি আমাদের দয়া করে ওখানে পৌঁছে দিতে পারবেন?'

নাক কোঁচকাল গাড়োয়ান। 'আমি মাগনা কোন কাজ করি না।'

লরার চেহারা মুহূর্তের জন্য কঠিন আকার ধারণ করল। লোকটা ভারী নীচ প্রকৃতির তো! পরক্ষণে নিজেকে সামলাল সে। বলল, 'আপনার খচ্চর

আর গাড়িটা যদি আমি কিনি?'

'আপনার কাছে টাকা আছে?' লোভে চকচক করে উঠল লোকটার চোখ।

হাসল লরা। 'এই মুহূর্তে অবশ্য নেই। বিশেষ করে এত সুন্দর একটা প্রাণী কেনার টাকা।' খচ্চরটার ওপর চোখ রেখে বলল সে। ওটার চোখের ওপর থেকে একটা আঁশ সরাল, সূর্যের আলোয় ঝিকিয়ে উঠল হীরের আঙটি। গাড়োয়ানের চোখ ছোট হয়ে এল। 'তবে জামানত হিসেবে একটা জিনিস আপনাকে দিতে পারি। এই আঙটিটা।'

'লেনদেনের কথা বলছেন?' দাঁত বের করে হাসল গাড়োয়ান। 'আর বলতে হবে না। এখন ঝটপট গাড়িতে উঠে পড়ুন তো।'

হাসিমুখে লরা র‍্যালফ আর কিশোরকে নিয়ে গাড়িতে উঠে বসল। বুড়ো গাড়োয়ান 'লেনদেন'-এর হিসেব বুঝে পেয়ে সন্তুষ্টচিত্তে বিপরীত দিকে হাঁটা শুরু করল। গাড়ি ছোটাল লরা।

আকাশটা গাঢ় নীল। তামার মত ঝকঝকে সূর্য রুক্ষ তাপ ছড়াচ্ছে। এতখানি পথ খিদে পেটে হেঁটে যেতে হচ্ছে না বলে র‍্যালফ খুবই খুশি। কিছুক্ষণের মধ্যে ওরা ছোট শহরটাতে ঢুকে পড়ল, এগিয়ে চলল ধুলো বোঝাই বড় রাস্তা দিয়ে। যেতে যেতে রাস্তার দুইপাশে সাদা রঙের ঘরবাড়ি, একটা চার্চ এবং একটা জেনারেল স্টোর চোখে পড়ল।

'ওয়াও' মুখ দিয়ে বিদঘুটে শব্দটা করল লরা। লাল ইঁটের একটা দালান, মাথায় 'কোহোমা শেরিফ অফিস' লেখা সাইনবোর্ড টাঙানো, এটার সামনে আসতেই খচ্চরের লাগাম টেনে ধরল সে।

'এখানে থামলেন কেন?' জানতে চাইল কিশোর।

'কাজ আছে। এসো।' গাড়ি থেকে নামল সে। ছেলেরা নামা পর্যন্ত অপেক্ষা করল, তারপর ওদেরকে নিয়ে ঢুকল শেরিফের অফিসে।

শেরিফ তার ডেস্কে বসে আছে, খবরের কাগজ পড়ছে। ডেস্কের ওপর আধখালি একটা মদের বোতল, পাশেই বড় একটা হ্যাট। ওদেরকে দেখে বিস্ময় ফুটল শেরিফের চোখে। মদের বোতল আর পেপারটা তাড়াতাড়ি ড্রয়ারে ঢুকাল সে। টেনে টেনে বলল, 'কী ব্যাপার, ম্যাম?'

লরা কিশোর আর র‍্যালফকে সামনের দিকে ঠেলে দিয়ে ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'ঘর পালানো এই ছেলে দুটোকে আপনার জিম্মায় রাখতে এসেছি।'

'কী?' চিৎকার করে উঠল র‍্যালফ। কল্পনাও করেনি মেয়েটা ওদের সঙ্গে এভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করবে।

লরা নির্বিকার মুখে ওদের রেগে বেগুনী হওয়া চেহারা দেখল। তারপর বলল, 'তোমরা নিশ্চয়ই আশা করোনি আমি তোমাদের ম্যাপ সম্পর্কিত গাঁজাখুরি গল্পটা বিশ্বাস করেছি।'

'কিন্তু, মিস প্যাক্সটন।' প্রতিবাদ করল র‍্যালফ।

'তোমাদের ভালর জন্যই কাজটা করেছি। বাবা মা-র কাছে যখন ফিরে যাবে তখন তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা অনুভব করবে।' হঠাৎ একটা অপরাধবোধে ছেয়ে গেল লরার মন। ও কি খুব বেশি তাড়াহুড়ো করে ফেলল? ছেলে দুটোর মুখ করুণ এবং হতভম্ব দেখাচ্ছে। কাঁধ ঝাঁকাল সে। যাক যা হবার হয়েছে।

কঠিন চোখে শেরিফ কিশোর আর র‍্যালফের দিকে চাইল। 'তোমাদের বাড়ি কোথায়?'

র‍্যালফ নীচের ঠোঁট কামড়াল আর কিশোর পা ঘষতে লাগল। 'ওই উত্তরে,' একটু ইতস্তত করে জবাব দিল র‍্যালফ। '...কিন্তু আমরা ঘর পালাইনি, বিশ্বাস করুন। আমরা মানে, ইয়ে...' কী বলবে ঠিক বুঝতে পারল না ও। আমতা আমতা করতে লাগল।

'ওরা কোত্থেকে পালিয়ে এসেছে যদি না বলে তা হলে আপনি ওদের বাড়ি পালাবার খবর দিয়ে ছবিসহ পোস্টার টাঙিয়ে দিন রাস্তায়,' পরামর্শ দিল লরা। 'কেউ না কেউ নিশ্চয়ই ওদের চিনতে পারবে।'

'না না, দয়া করে তা করবেন না।' বলল র‍্যালফ, তার চোখ ফেটে জল আসার জোগাড়। 'রিডলার তা হলে আমাদের ঠিক চিনে ফেলবে।'

মেঝেতে জোরে পা ঠুকল লরা। 'আমি আবার যদি ওই রিডলারের কথা শুনি...'

শেরিফ ডেস্ক ঘুরে ওদের সামনে এসে দাঁড়াল। 'ব্যস, ব্যস। এবার ছোকরারা আমার সঙ্গে চলো।' সে ওদেরকে একটা সেলের দিকে নিয়ে যেতে শুরু করল।

'আপনি নিশ্চয়ই আমাদের বিনা অপরাধে এভাবে জেলে পুরতে পারেন না,' কাঁপা গলায় প্রতিবাদ করল র‍্যালফ।

'তোমাদের জেলে পুরব না।' নরম গলায় বলল শেরিফ। 'এটা জেল নয়। এটাকে আমরা নিরাপত্তা কুঠুরি বলি। চলো হে ছেলেরা, কেউ তোমাদের খোঁজে না আসা পর্যন্ত এখানেই থাকবে।' র‍্যালফ আর কিশোর তর্ক করতে চাইল, কিন্তু কোন লাভ হলো না। ওদের সেলে পুরে দিল শেরিফ।

শেরিফ লরাকে বলল, 'ম্যাম, এখন যদি আপনি দয়া করে ছেলে দুটো সম্পর্কে দু'একটা স্বীকারোক্তি দিতেন··· মানে ওদের সম্পর্কে আপনি যা জানেন, ওদের কোথায় দেখেছেন, বয়স, ইত্যাদি।'

লরা একটুকরো কাগজ আর পেন্সিল নিয়ে ডেস্কের দিকে এগোল, লিখতে শুরু করল। হঠাৎ তীব্র একটা আর্তনাদ ভেসে এল বাতাসে। শেরিফ এবং সে দৌড়ে সেলের সামনে চলে এল। ডকশোর, বাঙ্কের ওপর বসা, একটা হাত চেপে ধরে আছে, যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত। 'বাঁচান! বাঁচান। আমার হাত গেছে।' ককিয়ে উঠল সে।

র‍্যালফ মুখ করুণ করে বলল, 'ওকে একটা মাকড়সা কামড়েছে।'

শেরিফ দ্রুত সেলের তালা খুলে ভেতরে ঢুকল। লরা তাকে অনুসরণ করল। 'ওটা টেরানটুলা মাকড়সা। খুব বিষাক্ত। দেখেছি আমি।' গুঙিয়ে উঠল ডকশোর, ভয়ে চোখ বিস্ফারিত। 'ওটা এত্ত বড়···একটা জগের সমান। ওখানে ছিল।' র‍্যালফ বাঙ্কের কোনার দিকটা দেখাল। 'আট পায়ের ভয়ঙ্কর দানব একটা!'

লরার কেমন সন্দেহ হলো। বলল, 'তাই?'

ওর চেহারা পাল্টে যাচ্ছে দেখে ডকশোরের যন্ত্রণা যেন আরও বেড়ে গেল। 'ও মাগো। বিষে মরে গেলাম গো!' চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করল সে।

'দাঁড়াও দেখি। আমাকে দেখতে দাও।' লরা কিশোরের হাত দেখতে চাইল। আর শেরিফ বাঙ্কের নীচে ঢুকল মাকড়সা খুঁজতে।

বিদ্যুৎগতিতে কাজটা করল ওরা। র‍্যালফ এক ধাক্কায় শেরিফকে বাঙ্কের ভেতর দিকে পাঠিয়ে দিল। যেন কামানের গোলা ফাটল, শেরিফের মাথা দেয়ালের সঙ্গে প্রচণ্ড জোরে বাড়ি খেলো। একই সঙ্গে ঝট করে বাঙ্ক থেকে নেমে পড়ল ডকশোর, চোখের পলকে লরাকে তুলে ওখানে বসিয়ে দিল। 'দুঃখিত, ম্যাম,' চিৎকার করে কথাটা বলে সে আর র‍্যালফ সেল থেকে বেরিয়ে এল, দরজার বল্টু টেনে ওদেরকে ভেতরে বন্দী করে ছুটল।

'র‍্যালফ রজারস, ফিরে এসো বলছি,' লরা গরাদ ধরে জোরে ঝাঁকাল, গনগন করছে মুখ। 'তোমাদের কপালে কিন্তু খারাবি আছে।'

এক সেকেন্ডের জন্য থামল র‍্যালফ। বলল, 'ম্যাম, এমনিতেই গত তিনদিন ধরে আমাদের কপাল খারাপ যাচ্ছে। এখানে আটকে থেকে আরও কপাল খারাপ করতে চাই না।' সশব্দে অফিসের দরজা বন্ধ করে সে আর ডকশোর রাস্তা দিয়ে ছুটল, দুটো কুকুর ঘেউ ঘেউ করতে করতে পিছু নিল

ওদের।

ওরা পালিয়ে যাবার বেশ অনেকক্ষণ পর রেগে লাল হওয়া শেরিফ আর লরাকে সেলের তালা ভেঙে উদ্ধার করল স্থানীয় এক কামার। শেরিফ দুই পিচ্চির কাছে নাস্তানাবুদ হয়ে নিজেই নিজের সেলে বন্দী হয়েছেন, এই মুখরোচক সংবাদটা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। লোকজন রীতিমত ভিড় জমাল শেরিফের অবস্থা দেখতে, তারা ফিসফিস করছে আর চোখ ঠেরে হাসছে।

শেরিফ আর লরা সেলের বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই উপস্থিত জনতা বিস্ফোরিত হলো অট্ট হাসিতে। 'ওই বিচ্ছু দুটোকে যে করে হোক আমার হাতে চাই-ই চাই।' রেগে বোম হয়ে বলল লরা। কিন্তু চাইলেই কি আর 'বিচ্ছু'দের ধরা যায়? তারা এতক্ষণে কোথায় ভেগেছে তার কোন খবর আছে! রাস্তার দিকে তাকাল লরা। যাক বাবা, অন্তত গাড়ি আর খচ্চরটা আগের জায়গাতেই আছে।

'ধন্যবাদ, হোমার,' কামারের দিকে চেয়ে চেষ্টাকৃত একটা হাসি উপহার দিল শেরিফ, কাঁধ ঝাঁকিয়ে ঘুরে দাঁড়াল, আবার ঢুকে পড়ল অফিসে।

'ওরা আসলে নিতান্তই বাচ্চাছেলে। নিজেদের কর্তব্য সম্পর্কে এখনও সচেতন নয়।' লরাকে বলল সে, যেন কিশোর আর র‍্যালফের অপরাধ সে ক্ষমা করে দিয়েছে।

'নাক টিপলে দুধ বেরোয়। কিন্তু কিরকম বাঁদর দেখেছেন!' লরার রাগ এখনও যায়নি। 'ওরা গোপন ম্যাপ, খুনোখুনি ইত্যাদি ছাইপাঁশ নিয়ে অনেকক্ষণ আমার কাছে ঘ্যানঘ্যান করেছে। কিন্তু একটা কথাও বিশ্বাস করিনি আমি। নিজের চোখেই তো দেখলেন কত মিথ্যুক ওরা!' হতাশ ভঙ্গিতে মাথা দোলাতে দোলাতে রাস্তায় নামল লরা, উঠল গাড়িতে।

এই ভিড়ের মধ্যে একটা লোক অনেক আগে থেকে সবকিছু চুপচাপ লক্ষ করে চলছিল। সে এবার শেরিফের কাছে গেল। র‍্যালফ যদি তাকে এখন দেখত নির্ঘাত হার্টফেল করত। লোকটা আর কেউ নয়, স্বয়ং রিডলার। শেরিফের সামনে গিয়ে সে বলল, 'এই যে শেরিফ, মারকুট্টে দুটো কোথায় যেতে পারে বলে আপনার ধারণা?'

শ্রাগ করল শেরিফ। 'নদীর দিকে যেতে পারে। বেশিরভাগ পলাতকরা এই কাজটাই করে।'

র‍্যালফ আর ডকশোর এদিকে জেলখানা থেকে পালিয়ে শহর ছেড়ে ঢুকে পড়েছে জঙ্গলে। উত্তেজনা আর ভয়ে এখনও বুক ধড়ফড় করছে

ওদের। লরার বিশ্বাসঘাতকতাকে এখনও যেন মন থেকে মেনে নিতে পারছে না কেউই। অথচ ওরা লরাকে তাদের বন্ধু ভেবেছিল। ছুটতে ছুটতে ওরা দম নিতে একটা বড় গাছের নীচে এসে দাঁড়াল। জঙ্গলের এই শান্ত পরিবেশে নিজেদের এখন অনেক নিরাপদ মনে হচ্ছে। সাহস ফিরে পাচ্ছে নতুন করে। পাখিরা গান গাইছে মাথার ওপরে, সোনালী সূর্যরশ্মি খেলা করছে গাছের সবুজ পাতায়।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে দুই বন্ধু উঠে দাঁড়াল। যাত্রা শুরু করল নদীর দিকে। অনেকখানি পথ চলার পর জলের প্রবহমান মিষ্টি কুলকুল ধ্বনি ভেসে এল কানে। একটু পরেই ওদের সামনে বিশাল মিসিসিপি নদীর একটা খাঁড়ি উদ্ভাসিত হলো। উজ্জ্বল রঙ করা একটা কীল বোট নজরে পড়ল। নৌকাটা নদী তীরে বাঁধা, ওটার পাশে এবং পালগুলোতে অসংখ্য বিজ্ঞাপন লাগানো। অবাক হয়ে কিশোর এবং র‍্যালফ বিভিন্ন ওষুধের গালভরা গুণাগুণের বর্ণনা পড়ল। ড. পিলম্যান স্পুজু জুস এবং সোয়াম্প রুট এলিক্সির: ড. পিলম্যান ভারমিফুজ এবং ডিওয়ারমার পিল। মশামাছির কামড়, চোখে কম দেখা, রক্তক্ষরণ বন্ধ, গেঁজ, প্রমেহ ইত্যাদি হরেক রকম রোগ এবং ক্ষতের মহৌষধের নাম পড়তে পড়তে ক্লান্ত হয়ে গেল দু'জনেই। হঠাৎ দেখল পাকাপোক্ত, গাট্টাগোট্টা চেহারার এক লোক, ধূসর রঙের ঢেউ খেলানো চুল, মুখভর্তি দাড়ি, বেরিয়ে আসছেন কীল বোটের ছইয়ের নীচ থেকে। ভদ্রলোকের মাথায় লম্বা, বিভার হ্যাট। এতদূর থেকেও তাঁর ঝকমকে চাউনি নজর এড়াল না ওদের। তিনি তীরে উঠে ভরাট গলায় গান ধরলেন:

যখন লাগল তার ঠাণ্ডা আর পড়ল শুয়ে বিছানায়
ঠাণ্ডার চোটে খাবি খেয়ে প্রাণটা যে তার যায় যায়;
যেই না তখন ডাকা হলো পিলম্যান ডাক্তারকে
ডাক্তারী পিল খেয়ে তার হাসিমুখ আর দেখে কে।
এক বড়িতেই রোগী আহা সক্কাল বেলায় সুস্থ যে
পিলম্যানের পিলের গুণ বড় মস্ত হে!
এই হলো গল্প আমার সুরে আর গানে
ব্যর্থতা বলে শব্দ নেই পিলম্যানের অভিধানে।

হঠাৎ বুড়ো দেখতে পেলেন ওদেরকে। র‍্যালফ আর ডকশোরকে উদ্দেশ্য করে হ্যাটের কোনা স্পর্শ করলেন তিনি, 'আ, স্বাস্থ্যরক্ষার নিমিত্তে হন্টনের জন্য চমৎকার একটি দিন আজ। এরকম দিন রক্তের নিয়মিত

চলাচল বৃদ্ধি করে, এবং শারীরিক দুর্বলতা দূর করে।'

বুড়োর কথা বুঝতে পারল না র‍্যালফ। বোকার মত বলল, 'জ্বী, স্যার?'

ডা. পিলম্যান ভ্রূ কোঁচকালেন, নদীতীরে দ্রুত, এক পলক চোখ বোলালেন। জানতে চাইলেন, 'তোমরা একা?'

মাথা দোলাল র‍্যালফ। 'জ্বী। শুধু আমি আর কিশোর পাশা।'

সন্তুষ্ট ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন ডাক্তার। ঝর্ণার দিকে এগিয়ে গেলেন। একটা কাঁচের নল দিয়ে ওষুধের বোতলগুলোতে জল ভরলেন। কয়েকটা ডালপালা জড়ো করে আগুন জ্বাললেন। শিখা দাউদাউ করে উঠতেই তিনি আগুনের তাপে লাল টকটকে একটা সিরাপ গরম করলেন। বোতলটার নীচে একটা ব্যাঙাচি খলবল করছিল, এক ঝটকায় তিনি ওটাকে বের করলেন। বিরাট এক লাফে ব্যাঙাচিটা নদীতে গিয়ে পড়ল।

ডকশোর আর কৌতূহল দমাতে না পেরে জিজ্ঞেস করেই ফেলল, 'আপনি কি তৈরি করছেন?'

'ধন্বন্তরি ওষুধ,' বললেন ডাক্তার। 'এটা অ্যাজটেকদের একটি প্রাচীন ফর্মুলা।'

'এটা দিয়ে কী হবে?'

'কী হবে না তাই বলো! খোসপাঁচড়া, ছউদ, দাউদ, পেট কামড়ানি, খুশখুশে কাশি থেকে শুরু করে সর্বপ্রকার চর্মরোগের মহৌষধ এটি।' খুব সাবধানে ডাক্তার বোতলের সিরাপ পরীক্ষা করলেন, তারপর ওটার ভেতরে প্রচুর জল ভরলেন।

'এই একটা মাত্র ওষুধে এত রোগ সারবে?' ডকশোরের চোখ গোল আর বড় হয়ে গেল।

'ওগুলো তো বটেই আরও অনেক অসুখ সারবে। তোমরা বড় ভাগ্যবান হে। সারা পৃথিবীতে শুধু তোমরাই এটার প্রস্তুতিপর্ব দেখার সুযোগ পেয়েছ।'

ধন্বন্তরি ওষুধ নয়, র‍্যালফের আগ্রহ নৌকাটার প্রতি। সে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি ভাটির দিকে যাবেন?'

ডাক্তার ওর দিকে তাকালে ও তাড়াতাড়ি বলল, 'আমাদের একটু দয়া করে ফ্রায়ার পয়েন্টে পৌঁছে দেবেন?'

বুড়োর ভ্রূ আবার কুঁচকে গেল, এক মুহূর্ত কি যেন ভাবলেন তিনি, তারপর বললেন, 'তোমরা কি বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছ?'

নিজেদের অজান্তে ওরা টানটান হয়ে গেল, সমস্যা দেখা দিলেই দৌড়

দেবে। 'সে অনেক ঘটনা,' বলল র‍্যালফ। '...আপনি হয়তো আমার কথা বিশ্বাসও করবেন না।'

'করব না?' একটা বোতলে শক্ত করে ছিপি পরাতে পরাতে বললেন ডাক্তার।

'অনেকেই করেনি।' বলল র‍্যালফ।

সিধে হলেন ডাক্তার। 'ঠিক আছে। আমি তোমাদের সঙ্গে নিতে রাজি আছি। তবে বেতন কিন্তু বেশি দিতে পারব না। হপ্তায় দশ ডলার পাবে, থাকা আর খাওয়া বাবদ। তবে হ্যাঁ, তার আগে তোমাদেরকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ডাক্তারের সেবা করতে হবে।'

'কে তিনি?' সরল মুখ করে জানতে চাইল কিশোর।

ডা. পিলম্যান ওর দিকে অসন্তুষ্ট দৃষ্টিতে তাকালেন। 'কেন আমি! ডাক্তার আহ্... আমি কি নিজের পরিচয় এখন দিতে পারি? আমি ডাক্তার ইউইং টি. পিলম্যান, এম.সি. পি.এম, পিএইচ. ইউ।' মেরুদণ্ড টান টান করলেন তিনি, মাথা থেকে বিভার হ্যাটটা খুলে বাউ করলেন। তারপর কাঁচের নলটা ঝাঁকিয়ে কি যেন নিক্ষেপ করলেন আগুনে। শিখাগুলো লাফিয়ে উঠল দপ করে।

ডকশোর আর র‍্যালফের বেশ মজা লাগছে। ডাক্তারকে ওদের বেশ ভাল লেগেছে। তিনি শুধু বন্ধুবৎসল এবং মজারই নন, হপ্তায় ওদের দশ ডলার আয়ের সুযোগও করে দিচ্ছেন। 'চলো তা হলে ডাক্তারী শাস্ত্রের ছেলেরা,' ঘোষণার সুরে তিনি বললেন, 'আমার ব্যাগগুলো নিয়ে এসো।'

আগের গানটা গুনগুন করে গাইতে গাইতে নৌকার দিকে এগোলেন ডাক্তার। পেছনে ওরা দুই বন্ধু। মেটকাম্বের গুপ্তধনের সন্ধানে এসে নতুন এবং অদ্ভুত আরেক অভিযানে অংশগ্রহণের উত্তেজনায় দু'জনের বুক ঢিবঢিব করতে লাগল। কিন্তু জানে না কোন্ ভয়ঙ্করের হাতছানিতে ওরা ভয়াবহ সব বিপদে পড়তে যাচ্ছে শীঘ্রিই।

পাঁচ

ওইদিন দুপুর নাগাদ ডা. পিলম্যান তাঁর দুই নতুন সাগরেদকে নিয়ে বস্কিডেল নামে একটি গ্রামে হাজির হলেন। এই গ্রামে ভিনদেশীরা আসে না

বললেই চলে। তাই ডা. পিলম্যান নদীতীরে বিচিত্র রঙের একটি তাঁবু টাঙালে গ্রামবাসীরা সবাই ওদেরকে ভিড় করে দেখতে এল। তাঁবুর গায়ে রঙবেরঙের ছবি, রেড ইণ্ডিয়ান সর্দার আর তাগড়া ঘোড়াদের চিত্রই বেশি। আর প্রচুর বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপনের কথাগুলো এরকম: ডা. পিলম্যানের ওষুধে পৃথিবীর হেন কোন রোগ নেই যা নিরাময় সম্ভব নয়।

লোকজনের ভিড় দেখে অতিশয় আনন্দিত হলেন ডা. পিলম্যান। মনে মনে লাভের দ্রুত একটা হিসেব কষেও ফেললেন। রঙিন তাঁবুর বাইরে, কাঠের নিচু একটা চৌকিতে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। তাঁর পরনে ইন্ডিয়ান সর্দারদের পোশাক, মাথায় পালক গোঁজা টুপি। র‍্যালফ আর কিশোর তাঁর সঙ্গেই রয়েছে, ওরাও মুখে রঙ মেখে, ইন্ডিয়ান পোশাক পরে নকল ইণ্ডিয়ান সেজেছে। ডাক্তার হাত তুললেন, বিদঘুটে গলায় কি যেন বিড়বিড় করছেন। জনতা হাঁ করে তাঁকে দেখতে লাগল। কিছুক্ষণ আকাশের দিকে হাত তুলে, যেন ঈশ্বরের কৃপা লাভ করছেন এমন ভঙ্গি করে ডা. পিলম্যান এরপর ঠিক ইন্ডিয়ানদের মত নাচের অঙ্গভঙ্গি করলেন। তারপর শ্রোতাদের উদ্দেশে ভাবগম্ভীর গলায় বলতে শুরু করলেন।

'বস্কি ডেলের ভাল মানুষের সন্তানগণ। তোমরা নিজেদের যা মনে করো তারচে' অনেক বেশি তোমরা অসুস্থ!' খাবি খেলো জনতা। 'কিন্তু আর চিন্তা নেই। আমি এসেছি তোমাদের রোগ মুক্তির জন্য, তোমাদের চির সুস্থ এবং সবল রাখতে। আর সেই অত্যাশ্চর্য ওষুধ আমি তৈরি করেছি যুগযুগ সাধনার পর। এই ধন্বন্তরি ওষুধের এক ফোঁটা খেলে তোমাদের আর কোন রোগ-বালাই থাকবে না। প্রতি বোতল মাত্র এক ডলার। নেবে কেউ? এক ডলার! এক ডলার! এক ডলার!'

ডা. পিলম্যান চতুর বিক্রেতা। তার বক্তৃতায় মুগ্ধ জনতা পকেট হাতড়াতে শুরু করল টাকার জন্য। ডলারের টিংটিং শব্দ যেন মধুবর্ষণ করল ডা. পিলম্যানের কানে। তিনি উৎসাহিত হয়ে বললেন, 'আমার দুই চোকতা ইণ্ডিয়ান শিষ্য দ্রুতগামী হরিণ এবং সাহসী ভল্লুককে পাঠাচ্ছি তোমাদের প্রয়োজনের কথা শুনতে।' তিনি র‍্যালফ এবং কিশোরের দিকে চেয়ে নড করলেন।

সঙ্কেত পেয়ে উঠে দাঁড়াল ওরা দু'জন, দুটো বড় বাক্স হাতে নিয়ে ভিড়টার দিকে এগোল। 'নিয়ে নাও, ভাই! যার যা প্রয়োজন নিয়ে নাও!' হাঁক ছাড়লেন ডাক্তার।

'আমাকে একটা দেন!' জীর্ণ পোশাক পরা এক মহিলা হাত বাড়াল।

'আমাকে একটা,' চিৎকার করে বলল আরেক লোক।

'আমাকে একটা...আমি একটা নেব,' চেঁচাল আরেকজন। 'এই যে টাকা!' প্রায় হুড়োহুড়ি পড়ে গেল কে কার আগে 'ধন্বন্তরি' ওষুধ নেবে তাই নিয়ে। র‍্যালফ আর ডকশোর এক হাতে ওষুধের বোতল বিলোচ্ছে, অন্য হাতে নিচ্ছে টাকা। ব্যবসার অগ্রগতি দেখে ডা. পিলম্যানের হাসি দু'কানে গিয়ে ঠেকল। তিনি বিপুল উৎসাহে বলতে লাগলেন, 'বন্ধুগণ, তোমরা যদি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বিপুল শক্তিতে, নতুন উদ্দীপনায় উজ্জীবিত না হতে পারো তা হলে তোমাদের আমি ডবল টাকা ফেরত দেব... আবারও বলছি আমার ওষুধে সব সারে। ম্যালেরিয়া, অজীর্ণ রোগ, গাঁটে ব্যথা...'

কিশোর একটা লোককে ওষুধ দিচ্ছে, সে জিজ্ঞেস করল, 'এই, তোমরা কোন জাতের ইন্ডিয়ান বললে?'

'কেন...চোকতা,' হালকা গলায় কিশোরের হয়ে জবাব দিলেন ডা. পিলম্যান।

'কী?'

'শুনলেনই তো উনি কী বলেছেন।' জড়ানো গলায় বলল কিশোর। 'চোকতা!' সে আরেক ক্রেতার দিকে এগিয়ে গেল।

এইসময় একটা ওয়াগন এসে থামল ভিড়টার কাছে। গাড়ির ড্রাইভার, সুন্দরী এক মহিলা অলস দৃষ্টিতে তাকাল লোকজনের দিকে...হঠাৎ কিশোরের গলা শুনতে পেল সে। উঁকি দিল মহিলা, তিক্ত হাসিতে বেঁকে গেল ঠোঁট। রঙ মেখেও চেহারা গোপন করতে পারেনি কিশোর। হ্যাঁ, ওখানে র‍্যালফও রয়েছে দেখছি। এখানে ওরা কী করছে? কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ডা. পিলম্যানের বক্তৃতা শুনল সে। তারপর গাড়ি ঘোরাল। যা দেখার দেখা হয়ে গেছে তার। শিগগিরই আরেকজন শেরিফ খুঁজে বের করতে হবে তাকে। তারপর প্রথম সুযোগেই ছেলে দুটোকে লকআপে পুরবে। ওদের ভালর জন্যেই।

শেষ বিকেলে লরা সবচেয়ে কাছের শহরটিতে পৌঁছুল, প্রচণ্ড গরমে ধুলোমাখা রাস্তা দিয়ে আসতে তার যারপরনাই কষ্ট হলেও সে গ্রাহ্য করল না। সোজা হাজির হলো শেরিফের অফিসে। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। জোরে কড়া নাড়ল লরা। কোন সাড়া নেই। জানালা দিয়ে উঁকি দিল লরা। শেরিফ ফ্রেড একটা সুইভেল চেয়ারে বসে দিব্যি নাক ডাকছে, মুখের এক কোণে একটা দাঁত খোঁচা কাঠি ঝুলছে। পা দুটো ডেস্কের ওপর। রেগে গেল লরা। দুমদাম আওয়াজ করতে লাগল দরজায়। গুঙিয়ে উঠল শেরিফ,

ধীরে ধীরে চোখ মেলল। ভুরু কুঁচকে উঠে দাঁড়াল। অসময়ে বিরক্ত করায় খুবই ক্ষুব্ধ সে।

'এই কে রে ওখানে?' খিটখিটে গলায় বলল সে। 'ওভাবে দরজা ধাক্কায় কে?'

শেরিফ দরজায় চাবি ঢোকাল, ঝট করে খুলে ফেলল। লরাকে দেখে থতমত খেলো। 'জ্বী, ম্যাম?'

'আপনি কি এই শহরের শেরিফ?' বিস্ফোরিত হলো লরা।

টুথপিক কামড়াতে কামড়াতে নিজের ব্যাজের দিকে ইঙ্গিত করল শেরিফ। 'তা হলে কি এটা গাছ থেকে পড়েছে?'

শীতল গলায় বলল লরা, 'ঠিক আছে, শেরিফ। আপনি এখানে আরাম করে ঘুমাচ্ছেন অথচ ওদিকে দুটো ঘর পালানো ছেলে রেডইন্ডিয়ানদের ছদ্মবেশে এক পাগলা ডাক্তারের নেতৃত্বে সরল লোকজনের কাছে কি সব আজেবাজে ওষুধ বিক্রি করছে সে খবর রাখেন?'

শেরিফ হঠাৎ যেন সতর্ক হয়ে উঠল। 'লোকটার নাম কি পিলম্যান?'

'হ্যাঁ, সেই লোকই।'

বিজয়ীর হাসিতে উদ্ভাসিত হলো শেরিফ ফ্রেডের চওড়া মুখ। 'ওই লোকটাকে ধরার জন্য এতদিন তক্কেতক্কে ছিলাম আমি। এবার আর ওর রক্ষা নেই। কোথায় সে?' অফিসে ঢুকল সে, একটা বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে।

'শহরের বাইরে ছোট নদীটার কাছে। ওকে দেখার আগেই ওর গলা আপনি শুনতে পাবেন, শেরিফ।' একটু থামল লরা, তারপর বলল, 'আচ্ছা শেরিফ, আমি আমার এই গাড়ি আর খচ্চরটা বিক্রি করে জাহাজের টিকেট আর কিছু জামাকাপড় কিনতে চাই। সম্ভব হবে?' কাদামাখা পোশাকটার দিকে সে প্রবল বিতৃষ্ণা নিয়ে তাকাল।

শেরিফ লরার সমস্যাটা বুঝতে পারল। বলল, 'ফ্রাঙ্ক কাটারনি খচ্চরের ব্যবসা করে। ওখানে জানোয়ারটাকে বিক্রি করতে পারবেন। আর যদি জাহাজের টিকেট করতে চান তা হলে আপনার নিজেকেই নদীতে গিয়ে পিস্তলের গুলি ছুঁড়তে হবে। গুলির শব্দে ওরা কখনও কখনও জাহাজ থামায়...আবার কখনও কখনও থামায় না!' চোখের ওপর হ্যাটটা টেনে নামাল সে, গানবেল্ট ঠিকমত বাঁধল। 'রাস্তার ওপাশে একটা মনোহারী দোকান দেখতে পাচ্ছেন? আমি না আসা পর্যন্ত ওখানে অপেক্ষা করুন। আমি ডাক্তার ব্যাটাকে পাকড়াও করে আনছি। এবার ঠিকই ওকে ধরব

আমি।' দৃঢ় পা ফেলে সে রাস্তা ধরে এগোল।

ছেলে দুটোর একটা সুরাহা অবশেষে হতে চলেছে ভেবে সন্তুষ্ট লরা তার ওয়াগনের উদ্দেশ্যে হাঁটা শুরু করল।

ডা. পিলম্যানের তাঁবুতে ভিড় এখনও লেগেই আছে। ডাক্তার একটা খোলা বাক্সের দিকে বারবার তাকাচ্ছেন। ওটার মধ্যে অনেকগুলো চশমা। চশমাগুলো বক্কিডেল বাসীদের কাছে বিক্রির পাঁয়তারা কষছেন তিনি। 'তোমাদের দৃষ্টিশক্তি ঠিক আছে তো?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি। 'বাক্সটা সবাই দেখতে পাচ্ছ তো?' লোকজন সামনের দিকে ঝুঁকল। 'চশমাগুলো এখন দেয়া হবে শুধু তাদেরকে যাদের চোখের অবস্থা খুবই খারাপ। আর এটাই আমার আজকের মত শেষ সওদা।'

শেরিফ ফ্রেড এই সময় ভিড় ঠেলে সামনে এসে দাঁড়াল। 'এই যে, ডাক্তার!' কর্কশ গলায় ডাকল সে।

বহু ঘাটের পানি খাওয়া ডা. পিলম্যান অসময়ে শেরিফকে দেখে ভেতরে ভেতরে ভয়ানক চমকে গেলেও চেহারায় সেটা মোটেও ফুটতে দিলেন না। উৎসাহের গলায় বললেন, 'শেরিফ ফ্রেড! সত্যি, আপনি দূরদর্শী!'

শেরিফ চৌকিতে পা রাখল। রূঢ় কণ্ঠে বলল, 'আর আমাকে দূরদর্শীতা দেখাতে হবে না। গতবার আপনি আমাকে একটা ইলেকট্রিক বেল্ট দিয়ে বললেন ওটা আমার পৌরুষ বৃদ্ধি করবে। কিন্তু ওই বেল্টে এখন ছাতা ধরেছে। কিছু কাজ হয়নি।' বলতে বলতে বন্দুক বের করল সে।

'আমি তাই বলেছিলাম?' শান্ত গলায় বললেন ডাক্তার, আস্তে করে পেটের ওপর থেকে বন্দুকের নলটা সরালেন। 'ওহ্, শেরিফ ফ্রেড!' ওপরে ওপরে সাহস দেখালেও ভেতরে খবর হয়ে গেছে তাঁর। জানেন যে কোন সময় মারাত্মক ঘটনাটা ঘটে যেতে পারে। তবে এখানে নয়, ঘটনাটা ঘটল তাঁবুর কাছে, মাঠের কোণের লম্বা গাছটার নীচে।

কিশোর আর র‍্যালফকে আগেই শেখানো ছিল র‍্যালফ গাছে উঠে ধপাস করে মাটিতে পড়ে যাবে, আর উঠবে না, ডাক্তার পিলম্যান দৌড়ে এসে ওর মুখে 'মৃত্যুঞ্জয়ী সালসা' ঢেলে দেবেন। র‍্যালফ আবার 'বেঁচে উঠবে'। বলা বাহুল্য, 'মৃত্যুঞ্জয়ী সালসা' নামে আরেকটা আজগুবী ওষুধ বিক্রির এটা আরেক ফন্দি।

শেরিফ ডাক্তারের দিকে বন্দুক তাক করে আছেন দেখে আর দেরি করল না র‍্যালফ, অবস্থা বেগতিক বুঝে আগেভাগেই গাছে উঠে পড়ল সে।

'ও মাগো' বলে বিকট চিৎকার করে পরক্ষণে পপাত ধরণীতল। জনতা 'কী হলো, কী হলো' বলে দৌড়ে গেল ওদের কাছে।

'মারা গেছে!' কৃত্রিম কান্নায় ডুকরে উঠল ডকশোর। 'গাছ থেকে পড়ে মারা গেছে আমাদের সাহসী ভল্লুক।' হায় হায় করে উঠল সবাই।

'মারা গেছে!' শোকে করুণ দেখাল ডাক্তারের চেহারা। 'না, আমার সাহসী ভল্লুক মরতেই পারে না। দেখি বন্ধুগণ, আমাকে শেষ চেষ্টাটা করতে দাও!' কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন তিনি। র‍্যালফের পাশে গিয়ে উবু হয়ে বসলেন। কিছুক্ষণ মিছামিছি ওর পালস পরীক্ষা করে, চোখ উল্টে দেখে, বিদঘুটে সেই ভাষায় বিড়বিড় করলেন। তারপর পকেট থেকে ছোট একটা বোতল বের করলেন। লাল রঙের একটা পদার্থে বোঝাই বোতলটা। 'ভাইসব!' ভাবগম্ভীর গলায় বললেন তিনি, 'এটা আমার সর্বশেষ আবিষ্কার। এর নাম মৃত্যুঞ্জয়ী সালসা। এখনও কোন মৃত্যুপথযাত্রী লোকের ওপর এই ওষুধ প্রয়োগ করিনি আমি। কল্পনাও করিনি প্রিয় শিষ্য সাহসী ভল্লুকের ওপরেই আমার ওষুধটা প্রয়োগ করতে হবে। যাহোক, আপনারা আমার জন্য দোয়া করবেন!'

বোতলের ছিপি খুলে ঘন তরল পদার্থটা এক চামচ ঢেলে দিলেন তিনি র‍্যালফের ঠোঁটে। জনতা শ্বাস বন্ধ করে রইল। হাঁ করে তাকিয়ে আছে র‍্যালফের দিকে। র‍্যালফ পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী সময় হিসেব করছে। ঠিক ত্রিশ সেকেন্ড পর চোখ খুলল সে। চোখ খুলেই দেখল…কী দেখল? রিডলার আর তার দলের লোকেরা সোজা তার দিকে চেয়ে আছে। ঝট করে চোখ বন্ধ করে ফেলল র‍্যালফ। আবার ফাঁদে পড়েছে ওরা। এখন সে কী করবে?

'তোমার কি এখন একটু ভাল লাগছে, পুত্র?' গলায় এক বোতল মধু ঢেলে জানতে চাইলেন ডা. পিলম্যান। শিষ্য তাঁর প্রত্যাশা মত কাজ করছে না। ওকে চোখ মেলতে দেখে লোকজনের মধ্যে সাড়া পড়ে গিয়েছিল। ডা. পিলম্যানও মনে মনে খুশি হয়ে উঠেছিলেন তাঁর 'মৃত্যুঞ্জয়ী সালসা' বিক্রির একটা সুরাহা হলো ভেবে। কিন্তু র‍্যালফ এ কী করছে? মরার মত দেখি পড়েই আছে। চোখ খোলার নামই নেই।

কিশোর রিডলারদের দেখেনি। র‍্যালফকে আবার চোখ বুজতে দেখে সে শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। অনেক সময় পার হবার পরেও র‍্যালফ চোখ মেলছে না দেখে সে ভয় পেল। তা হলে কি গাছ থেকে পড়ে ও সত্যি আহত হয়েছে? এ তার ভান নয়! 'র‍্যালফ!' আর্তনাদ করে উঠল সে। 'র‍্যালফ ওঠো!'

ডা. পিলম্যানের কপালে ভাঁজ পড়ল। তিনি র‍্যালফের দিকে ঝুঁকলেন। ছেলেটার চোখের পাতা শক্ত করে বন্ধ, যেন অজ্ঞান হয়ে গেছে। 'আহা…আহা, আমি যা ভেবেছি তার চেয়ে দেখি ওর অবস্থা আরও বেশি খারাপ। ওঠো হে, ছোকরা!' র‍্যালফের হাত ধরে নাড়া দিলেন তিনি, কণ্ঠে স্পষ্ট বিরক্তি। ছোকরা এসব কী শুরু করেছে? সব কিছু গুবলেট করে ছাড়বে তো! 'আমার "মৃত্যুঞ্জয়ী সালসা"র তেজ তুমি নিশ্চয়ই শিরায় শিরায় টের পাচ্ছ, পাচ্ছ না?' গনগনে মুখে বললেন তিনি। 'জিনিসটা অবশ্যই এতক্ষণে কাজ শুরু করে দিয়েছে।' প্রচণ্ড জোরে নাড়া দিলেন তিনি র‍্যালফকে। 'ঈশ্বরের দোহাই, ছোকরা, আমার কথা শুনতে পেলে কথা বলো। কথা বলো। নাম কি তোমার, বলো?'

জনতা চুপ করে ডাক্তার আর র‍্যালফকে দেখছে। র‍্যালফ জানে না মরার ওপর খাঁড়ার ঘা হতে লরা বস্কি ডেল গ্রামে ফিরে এসেছে, খুঁজছে ওদেরকে। জনতার ভিড় ঠেলে সে সামনে এল, মাটিতে শোয়া নিশ্চল র‍্যালফকে দেখেই চিলের গলায় বলে উঠল, 'এই তো র‍্যালফ রজারস! কেনটাকির ঘর পালানো ছোড়াটা!'

যেন ইলেকট্রিক শক খেলো র‍্যালফ। পলকে তার চোখ মেলে গেল, বুনো ঘোড়ার মত লাফিয়ে উঠল সে, কিশোরের উদ্দেশ্যে চিৎকার দিল, 'রিডলার, কিশোর! শিগগির ভাগো!' ওর ধাক্কায় ডা. পিলম্যান মাটিতে পড়ে গিয়েছিলেন, তাঁকে মাড়িয়েই ত্রস্ত হরিণের গতিতে ছুটল র‍্যালফ। র‍্যালফকে এত দ্রুত সুস্থ হতে দেখে চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল বস্কিডেল বাসীদের। ডকশোরও তার বন্ধুকে অনুসরণ করতে যাচ্ছিল, কিন্তু লরা ওর পথ আটকে দাঁড়াল। বাইনমাছের মত তার হাত থেকে পিছলে গেল ডকশোর, ছুটল র‍্যালফের পিছু পিছু।

রিডলার এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছিল। সময় হয়েছে বুঝে ইশারা করল সে তার লোকদেরকে, ধাওয়া করল ওদেরকে। র‍্যালফের এবার বাঁচোয়া নেই, প্রতিজ্ঞা করল সে। ডা. পিলম্যান টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালেন। জনতার ভাবগতিক সুবিধের ঠেকছে না তাঁর কাছে, খারাপ কিছু ঘটার আগে ভেগে পড়াই শ্রেয় মনে হলো। দ্রুত টাকা বোঝাই হ্যাট আর সুটকেসটা নিয়ে তিনি নদীর দিকে, কীলবোটের উদ্দেশ্যে জোর কদমে হাঁটা দিলেন।

র‍্যালফও লম্বা পা ফেলে ছুটে চলেছে নদীর দিকে। রিডলারের লোকেরা ওর পেছনে ছুটে আসছে। লরা এতক্ষণ সবকিছু চুপচাপ লক্ষ করছিল।

হঠাৎ ওকে অজানা একটা ভয় গ্রাস করল। আতঙ্কিত হয়ে উপলব্ধি করল বিরাট একটা ভুল করে ফেলেছে সে; র‍্যালফের প্রতি অবিচার করেছে ওর গল্পটাকে মনগড়া ঠাউরে। ছেলেটা সত্যি বিপদের মধ্যে আছে–ভয়ঙ্কর বিপদে, অন্তত এখনকার ঘটনা তাই প্রমাণ করে। বুদ্ধিমতী লরার মাথা কাজ করল বিদ্যুৎগতিতে। শেরিফ ফ্রেডের কাছে গিয়ে সে সাহায্য চাইল। কিন্তু শেরিফের এখন ওদিকে নজর নেই। ডাক্তার পিলম্যান তাঁকে আবারও ঠকিয়েছেন বুঝতে পেরে সে রেগে কুমড়ো হয়ে গেল। শয়তান ডাক্তারটাকে এবার আর ছাড়াছাড়ি নেই, কোমরে গোঁজা বন্দুকটা বের করার জন্য হাত বাড়াল শেরিফ। কিন্তু ওটা ইলাস্টিক স্ট্র্যাপে আটকে গেছে। ছাড়াতে গিয়ে স্ট্র্যাপটা ঠাস করে তার ডান পায়ে বাড়ি খেলো। ব্যথায় হাউমাউ করে উঠল শেরিফ, ডান পা তুলে ত্রাহি চিৎকার শুরু করল। লরা অধৈর্য হয়ে উঠল। শেরিফের এক ঠেঙে নাচ দেখার সময় নেই তার। সে বন্দুকটা শেরিফের কোমর থেকে ছিনিয়ে নিয়ে রিডলারের দলটা যেদিকে গেছে সেদিক পানে দিল দৌড়।

এদিকে জনতা বুঝতে পেরেছে তাদেরকে ঠকানো হয়েছে। ছেলেটার 'অজ্ঞান' হয়ে যাবার ঘটনাটা আসলে সাজানো। রাগে মারমুখী হয়ে উঠল সবাই, ক্রুদ্ধ গরুর দলের মত নদীর দিকে ছুটল তারা ডাক্তারকে ধরার জন্য।

র‍্যালফ ক্লান্তির চরমে পৌঁছে গিয়েছে। মুখ হাঁ করে শ্বাস করছে, হাঁটু কাঁপছে থরথর করে। ভীত চোখে সে নীচের দিকে চাইল। এই গিরিখাত থেকে নদী কমপক্ষে একশো হাত নীচে। ওখানে পৌঁছুতে হলে এখান থেকে লাফ না দেয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। ফাঁদে পড়েছে সে। রিডলারের লোকেরা ক্রমশ কাছে চলে আসছে। ভয়ে র‍্যালফের চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল। ওর জীবন তা হলে আজকেই শেষ! অর্ধবৃত্ত করে চারটে লোক ওকে ঘিরে ফেলতে শুরু করল।

রিডলারের ধাতব কণ্ঠ নির্দয় এবং নিষ্ঠুর শোনাল। 'তোমার কাছে যে জিনিসটা আছে ওটা আমাকে দাও।'

র‍্যালফ ঢোক গিলল। হাতের লম্বা লাঠিটা দিয়ে রিডলার ওর বুকে খোঁচা দিল। 'জিনিসটা বের করো, খোকা!'

র‍্যালফ এক পা পিছু হঠল। খাড়া গিরিখাতের শেষ মাথায় পৌঁছে গেছে ও। খাদের নীচে প্রবাহিত জলরাশি বিস্ফোরণের মত কানে বাজছে। হাত মুঠো করল র‍্যালফ, সাদা হয়ে গেল গাঁট। ঠিক এমন নাটকীয় মুহূর্তে একটা

পাখি তীক্ষ্ণ এবং ভয় ধরানো গলায় চিৎকার করে উঠল।

'সবাই হাত তোল!' পরিষ্কার নারী কণ্ঠটি কানে যেতেই লাফিয়ে উঠল সবাই। 'আমার কথা কানে গেছে?'

লরা প্যাক্সটনকে ঢাল বেয়ে ওপরে উঠতে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল র‍্যালফ। লরা দুই হাতে ধরে আছে ভয়ঙ্কর দর্শন একটা বন্দুক। লোলুপ দৃষ্টিতে ওটা তাকিয়ে আছে দস্যুদের দিকে।

'তোমাদের লজ্জা করে না?' ভৎর্সনা করল সে। 'বাচ্চা একটা ছেলের বিরুদ্ধে এতগুলো দামড়া পুরুষ। ছিঃ!' র‍্যালফ চট করে খাদ থেকে সরে এল লরার পাশে।

ইতিমধ্যে সব ক'টা দুর্বৃত্ত তাদের অস্ত্র ফেলে দিয়েছে, শুধু রিডলার ছাড়া। সে এক পা এগিয়ে এল লরার দিকে। 'না, ম্যাম। আপনি ভুল বুঝেছেন। আমরা ছেলেটার কোন ক্ষতি করতে চাইনি। ও আমার একটা জিনিস নিয়েছে। সেটাই ওর কাছ থেকে ফেরত চাইছি। অন্য কোন ব্যাপার নয়!'

লরার মুখ পাথরের মত শক্ত। রিডলারের কথা বিশ্বাস করল না সে, ওকে কোন কৌশলের আশ্রয় নেয়ার অবকাশও দিল না। 'ব্রিম্‌ম্‌ম্‌' বিস্ফোরিত হলো ব্যারেল, রিডলারের পায়ের কাছে ছিটকে উঠল মাটি। লাফিয়ে পিছিয়ে গেল দস্যুদের সর্দার।

'আমি আপনাদের সঙ্গে ইয়ার্কি করতে আসিনি, জনাব,' লরা আবার বন্দুক কক করল পরবর্তী অ্যাকশনের জন্য। 'তোমরা সবাই মাথার ওপর হাত তুলে ঘুরে দাঁড়াও।'

কঠিন এই আদেশ অমান্য করার সাহস হলো না দস্যুদের। 'জলদি ঘোরো!' কঠিন সুরে বলল লরা। 'এখন··· ছেলেটাকে যেখানে দাঁড় করিয়েছিলে সেখানে গিয়ে সবাই লাইন করে দাঁড়াও।'

লোকগুলো ইতস্তত করল। মেয়েটা আসলে তাদেরকে নিয়ে কী করতে চাইছে? 'আমি বলেছি হাঁটতে!' লরার গলায় নিষ্ঠুর কর্তৃত্ব। লোকগুলো হেঁটে খাদের মুখে দাঁড়াল, উঁকি দিল নীচে।

'এবার বাঁদরমুখোরা, লাফ দাও।' আদেশ করল লরা। 'তোমরা এই জায়গাটাকে অপবিত্র করেছ।'

ভয়ে জমে গেল সবাই। ছুটে পালাবার ইচ্ছেটাকে বহুকষ্টে দমন করল। দক্ষিণী এই বীরাঙ্গনার অব্যর্থ বুলেটের নিশানা হওয়ার চেয়ে খাদে ঝাঁপ দেয়া অনেক ভাল। উপায় না দেখে লাফাল ওরা। এবার রিডলারের পালা।

সে দোনামোনা করছে দেখে আবারও গুলি ছুঁড়ল লরা। পায়ের কাছে আবারও ধুলো উড়ল। তীব্র ঘৃণা নিয়ে লরার দিকে তাকাল রিডলার।

'খাদের নীচে একবার তাকান!' ভয় এবং রাগে কেঁপে উঠল তার গলা।

হাসল লরা, তার চেহারায় সন্তুষ্টি। র‍্যালফ একবার তার দিকে তাকাল তারপর খাদের মুখে গিয়ে উঁকি দিল। লরা নাক সিটকাল, 'ওখানে তোমার স্বার্থ উদ্ধারের মত কিছু নেই। লাফাও বলছি!'

রিডলার খাদের গভীরে অদৃশ্য হতেই লরা এক বগলের নীচে ভারী বন্দুকটা চেপে ধরে অন্য হাতে র‍্যালফকে জড়িয়ে ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল। গন্তব্য–ডা. পিলম্যান এবং তাঁর কীলবোট।

ছয়

ক্রুদ্ধ জনতার রোষ থেকে রক্ষা পেতে ডা. পিলম্যানের নাভিশ্বাস উঠে গেল। ওদের হাত থেকে বাঁচার জন্য তিনি সরু একটা রাস্তা ধরে প্রথমে দৌড়াতে শুরু করলেন। তারপর ফাঁকতালে আত্মগোপন করলেন ঘন একটি ঝোপের আড়ালে। কয়েক সেকেন্ড পরেই ওখানে এসে হাজির হলো কিশোর। ভয়ে তার চোখ কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে, যেন শয়তান তাড়া করেছে। র‍্যালফকে সে হারিয়েছে, জনতা হাতের কাছে তাকে পেয়েছিল। ধাওয়া খেয়ে দিগ্বিদিক্ শূন্য কিশোর কোন দিকে ছুটেছে নিজেই জানে না। জঙ্গলের মধ্যে ঢুকতেই গাছের শেকড়ে হোঁচট খেল সে। সঙ্গে সঙ্গে ঝোপের আড়াল থেকে একটা হাত বেরিয়ে এল, ঝট করে তাকে টেনে নিল ভেতরে। মুখ হাঁ হয়ে গেল কিশোরের, চিৎকার করবে, কিন্তু ডা. পিলম্যান ওর হাঁ-টা বন্ধ করে দিলেন হাতচাপা দিয়ে। পরমুহূর্তে জনতা ঝড়ের গতিতে পেরিয়ে গেল জায়গাটা।

ঝোপের আড়ালে ডকশোরকে নিয়ে ডা. পিলম্যান একঘণ্টা একঠায় বসে থাকলেন। সূর্য মাঝ আকাশে উঠল, বাতাসে আন্দোলিত হতে থাকল ডালপালা। সূর্যের আলো এক সময় ক্ষীণ হয়ে এল, আকাশ ধারণ করল উজ্জ্বল জাফরান রঙ। ঝোপের আড়ালে দ্রুত বাঁধতে লাগল হালকা অন্ধকার। ডকশোর ব্যস্ত হয়ে পড়ল চলে যেতে, কিন্তু ডাক্তার ঝুঁকি নিতে চাইলেন না! অন্ধকার যখন ঘন হয়ে এল, নিরাপদ সময় বুঝে তিনি

ডকশোরকে নিয়ে লুকানো জায়গা থেকে বেরিয়ে পড়লেন।

পরদিন সকাল। ডা. পিলম্যান, র‍্যালফ, লরা এবং কিশোরকে দেখা গেল ডাক্তারের কীলবোটের ডেকে। অবশেষে লরা তার ছাগলে খাওয়া বিয়ের গাউনের ঝামেলা থেকে মুক্তি পেয়েছে। তার পরনে এখন ফুল আঁকা সুন্দর ব্লাউজ এবং গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা গোলাপী স্কার্ট। সূর্যের ঝলমলে আলোতে উদ্ভাসিত লরাকে অপূর্ব লাগছে। কীলবোট পূর্ণগতিতে ছুটে চলেছে। ডা. পিলম্যান বোটের হাল নিয়ে ব্যস্ত, লরা সাবধানে র‍্যালফের হাতের ক্ষত পরিষ্কার করছে। কিশোর হাতে একটা জলের পাত্র নিয়ে স্থির দাঁড়িয়ে আছে ওদের পাশে। লরা র‍্যালফের হাতে এক টুকরো ব্যান্ডেজ পেঁচাতে পেঁচাতে মৃদু গলায় বলল, 'ধন্যবাদ, ডকশোর।'

ডাক্তার ওদের দিকে গলা বাড়ালেন। 'আমার আসকুলাপিয়াস মলম লাগালেই ওর সমস্ত ক্ষত দূর হয়ে যেত।' বললেন তিনি।

'ওর হাতটা সহ,' শুকনো গলায় বলল লরা। ডাক্তারের ওষুধপত্রে ওর একদম বিশ্বাস নেই।

র‍্যালফের দিকে ঘুরল সে। বলল, 'আমি এখন রিডলারের গল্পটা বিশ্বাস করি, র‍্যালফ। এরকম পাজি লোক জীবনে দেখিনি। মাত্র পাঁচ ডলারের জন্যে ও লোকের গলাও কাটতে পারে!'

র‍্যালফের ব্যান্ডেজ বাঁধা শেষ হলে সে ওকে নিয়ে ডেকে বসল। 'ওরা আসলে কি খুঁজছে?' জানতে চাইল লরা। র‍্যালফ এবং কিশোর অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করল। সাহায্যের জন্য লরার প্রতি খুবই কৃতজ্ঞ থাকলেও ওদের গোপন কথা তাকে জানাতে চায় না ওরা। দীর্ঘশ্বাস ফেলল লরা, বুঝল ওরা এই ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলতে আগ্রহী নয়। 'র‍্যালফ,' বলল সে, 'দোয়া করি তোমাদের সঙ্গে যেন তোমার চাচার দেখা হয়। তোমাদের সমস্যার কথা তাঁকেই বোলো।' জলের পাত্রটা হাতে নিল সে। 'হয়তো উনি তোমাদের সাহায্য করতে পারবেন।'

র‍্যালফ উৎসাহী গলায় বলল, 'জিমি চাচা সব পারেন। একবার তিনি সমুদ্রের পানি দিয়ে লবণ কারখানা দিলেন, কিন্তু বাঁধটা ভেঙে গেল…আর সব লবণ পানিতে ভেসে গেল। আরেকবার তিনি রেলরোড বসালেন, কিন্তু ওটা একটা পুকুর ভরাট করে বানানো কিনা তাই একদিন ট্রেন শুদ্ধ লাইনটাই গেল ভ্যানিশ হয়ে।'

হাসি গোপন করতে পারল না লরা। বলল, 'মনে হয় তোমার চাচা যাদু জানেন।' হাঁটতে শুরু করল সে, হাসছে।

'যাদু জানেন কিনা জানি না,' পেছন থেকে জোর গলায় বলল র‍্যালফ, ...'তবে আমার চাচা কিন্তু খুব কাজের মানুষ!'

সন্ধ্যা নাগাদ বোট এসে পৌঁছুল নদীর মোহনায়। র‍্যালফ বলেছে এখানে তার জিমি চাচার দেখা মিলতে পারে। ডা. পিলম্যান নোঙর করলেন, সবাই নেমে পড়ল তীরে। ডাক্তার বললেন তাদের একজন গাইড দরকার হবে। কারণ শিগ্‌গিরই রাত হয়ে যাবে। মেঠো পথ ধরে খানিক এগোতেই এক বুড়োর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়ে গেল। মজুরীর বিনিময়ে লোকটা তাদের গাইড হতে রাজি। সাঁঝের আঁধার ঘন হয়ে এল, যেন চোখের পলকে কালির মত কালো অন্ধকার গ্রামটাকে গিলে ফেলল। ভাগ্যিস বুড়োর সঙ্গে লণ্ঠন ছিল। নইলে পথ চলতে বেশ অসুবিধে হত।

ডা. পিলম্যান গাইডের সঙ্গে তাল মিলিয়ে হাঁটছেন। 'একটা কথা বলি, ভাইসাহেব,' তোষামদের গলায় বললেন তিনি। 'আমার কাছে একটা আশ্চর্য ওষুধ আছে। মৃত্যুঞ্জয়ী সালসা। এক বোতলেই কম্ম সাবাড়। মানে এক বোতল ওষুধ সেবনেই আপনি, আপনার বাবা-দাদা, গ্রামের জ্ঞাতিগোষ্ঠী সবাই সমস্ত ব্যথা-বেদনা, খোঁস-পাঁচড়া ইত্যাদির হাত থেকে জন্মের মত রেহাই পাবেন।'

কিন্তু বুড়ো তোষামদে গলল না। আশ্চর্য ওষুধের অত্যাশ্চর্য গুণাবলীকে সে পাত্তাই দিল না। বলল, 'জিমি রজারসের সঙ্গে আপনাদের ওখানে সাক্ষাৎ হবে। যদি ওনার সঙ্গে কথা বলতে চান তা হলে জোরে পা চালান।' গাছের নীচে একটা ঢালের দিকে ইঙ্গিত করে সে ঘুরে দাঁড়াল।

'স্যার?' জিজ্ঞেস করল লরা। 'মি. রজারস কি কোথাও যাচ্ছেন?'

ঘোঁত ঘোঁত করে উঠল গাইড। 'এক অর্থে তাই!' আর কোন কথা না বলে বুড়ো বিপরীত দিকের জঙ্গলের উদ্দেশ্যে দ্রুত পা চালাল।

লোকটার আচরণে ওরা খুবই অবাক হলো। মোড় ঘুরল ওরা, একটা রাস্তা দিয়ে আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগল। হঠাৎ ওদের চোখের সামনে, জঙ্গলের মধ্যে ফাঁকা একটা জায়গায় আগুন জ্বলে উঠল। অগ্নিকুণ্ডকে ঘিরে দাঁড়ানো অনেকগুলো লোক।

'সম্ভবত কোন পার্টি হচ্ছে,' বলল র‍্যালফ। দ্রুত পা বাড়াল সে সামনে, পেছনে লরা। ডা. পিলম্যান আর ডকশোর পেছনে থাকলেন। আগুনের উজ্জ্বল আলো চোখ সয়ে যাবার পর ওরা দেখল লোকগুলো মাথায় হুড পরে আছে, শরীর ঢাকা লম্বা গাউনে। ডকশোর ঘোড়ার পিঠে বসা একটা লোককে লক্ষ করল। লোকটার হাত পেছনে মুড়ি করে বাঁধা, গলায় ফাঁস।

'লোকটার ফাঁসি হচ্ছে!' চিৎকার করে বলল কিশোর।

অদ্ভুত পোশাক পরা লোকগুলোর কাছে চলে এসেছে র‍্যালফ। ওর মুখ ভয়ে সাদা, অজানা আশঙ্কায় ধড়াস ধড়াস লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ড। 'উনি কি জিমি চাচা?' আর্তনাদ করে উঠল সে।

পেছন থেকে জবাব দিলেন ডাক্তার। 'আমার তাই মনে হচ্ছে!'

ফাঁকা জায়গাটা লক্ষ্য করে দৌড় দিল র‍্যালফ। 'জিমি চাচা!' চিৎকার করল ও।

'র‍্যালফ…দাঁড়াও,' আদেশ করল লরা। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে।

কিশোরও তার বন্ধুর পেছনে দৌড়াতে শুরু করল। 'না, র‍্যালফ। ওখানে তোমার যাওয়া চলবে না। ওটা তোমার জায়গা নয়।' কিন্তু কিশোরকে যেতে দিলেন না ডাক্তার, একটা হাত খপ করে ধরে ফেললেন।

'জিমি চাচা…জিমি চাচা…তুমি কি আমার জিমি চাচা?' বলতে বলতে র‍্যালফ ফাঁস পরানো লোকটার কাছে চলে এল। লরাও ওর সঙ্গে এসেছে। দু'জনেই মুখ তুলে অসহায় লোকটার দিকে তাকাল। হুডপরা দুটো লোক রাগে চেঁচাতে চেঁচাতে দৌড়ে এল।

'কে তুমি?' ঠাণ্ডা গলায় জিজ্ঞেস করল জিমি রজারস।

'গ্রাসি থেকে এসেছি আমি। আমার নাম র‍্যালফ রজারস।'

'র‍্যালফ?' অবাক হলো জিমি। ওকে ফাঁসিতে ঝোলানোর জন্য গাছে রশি বাঁধা হচ্ছে, ব্যাপারটাকে পাত্তাই দিল না সে।

'জ্বি, চাচা!'

'র‍্যালফ! হায়রে, এমন একটা সময় তোমার সঙ্গে আমার দেখা হলো। ফ্রায়ার পয়েন্টে তুমি কী করতে এসেছ?'

একটু ইতস্তত করল র‍্যালফ। তারপর বলল, 'আমরা নিউ অর্লিন্সে যাচ্ছিলাম। পথে তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্য নেমেছি। তোমাকে আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাব বলে।'

জিমি চাচার গলা করুণ শোনাল। 'যাওয়ার যে অবস্থা নেই তা তো দেখতেই পাচ্ছ। কিন্তু "আমরা"টা কে?'

'আমি, কিশোর, মিস প্যাক্সটন এবং আরও একজন।' বলল র‍্যালফ। ওর গলা কাঁপছে। তার চাচা এর আগেও মারাত্মক সব বিপদের হাত থেকে বেঁচে ফিরেছে, জানে সে। কিন্তু এবার…এবার কি শেষ রক্ষা হবে?

লরা জিমি রজারসের দিকে তাকিয়ে মধুর হাসল। আগুনের শিখায় তার

গোলাপী মুখখানা ভারী মিষ্টি দেখাল। 'ম্যাম', সপ্রতিভ গলায় বলল জিমি, 'আপনাকে টুপি খুলে সম্মান দেখানো দরকার ছিল কিন্তু…'

'আউল ফাউল কথা অনেক হয়েছে, আর না!' জিমির ঘোড়ার পাশে দাঁড়ানো লোকটা জড়ানো গলায় বলে উঠল। বোঝাই যায় মদ খেয়ে টাল হয়ে আছে সে। অন্য লোকগুলো এবার চেঁচিয়ে উঠল, 'ঠিক বলেছ, কোলি, এখন কাজ শুরু করা যাক। আর সময় নষ্ট করা যায় না।' খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসতে শুরু করল সবাই। মদ্যপানের কারণে এদেরও টালমাটাল অবস্থা।

কোলি তার মাথার হুড ফেলে দিল, আত্মপ্রকাশ করল নীচ চেহারার একটা লোক। 'রজারস, তোমার লাশটা আশা করি অন্যদের সাবধান করে দেবে।' বলল সে।

'না…না…' হাহাকার করে উঠল র‍্যালফ, লোকগুলোর হাতে ঝাড়া মেরে নিজেকে ছাড়িয়ে ছুটে গেল সে তার চাচার দিকে।

'ভাগ্ এখান থেকে!' কোলি ধাক্কা দিল ছেলেটাকে। মাটিতে ছিটকে পড়ে গেল র‍্যালফ।

ডা. পিলম্যান প্রথম থেকেই ঘটনাটা দেখছিলেন আর কী করবেন ভাবছিলেন। এখন অ্যাকশন দেখানোর সময় উপস্থিত। সুটকেসের ঘন লাইনিং ছিঁড়ে তিনি ওটা কিশোরের হাতে দিলেন। 'লাইনিং ধরে এই জায়গাটা খুলতে থাকো, তাড়াতাড়ি।' নির্দেশ দিলেন তিনি ওকে।

হুড পরা একটা লোক একটা বড় কাঠের ক্রুশে আগুন ধরাল আর কোলি গানের সুরে বলতে লাগল, 'সবগুলো বিশ্বাসঘাতককে ধরে জবাই করো। ধরে ধরে জবাই করো, সকাল বিকাল নাস্তা করো…'

জিমি রজারস বলল, 'কোলি, তোমার ধেড়ে গলা আমার মোটেও শুনতে ইচ্ছে করছে না। দয়া করে চুপ করো।'

রেগে গেল কোলি। খেঁকিয়ে উঠল, 'তুমি চুপ করো।'

লোকগুলো নিজেদের কাজে ব্যস্ত বলে র‍্যালফের দিকে তাদের নজর ছিল না। র‍্যালফ চোরা চোখে তাকিয়ে আছে একটা পাথরের গায়ে ঠেক দেয়া একটা রাইফেলের দিকে। এদিকে রগচটা কোলি তখনও বকবক করে চলেছে। 'জিমি রজারস, আজকের ঘটনাটা তোমার জন্যই শুধু নয়, একটা শিক্ষা হয়ে থাকবে তাদের জন্যও যারা আমার ব্যবসায়ে আবার নাক গলাতে আসবে।'

র‍্যালফ এই সময় বন্দুকটা চেপে ধরল দৃঢ় হাতে। ট্রিগারে চেপে বসল আঙুল। ঠিক তখন কোলি জিমির ঘোড়ার পেছনে সজোরে থাবড়া মারছে।

তড়াক করে লাফিয়ে উঠল ঘোড়া, জিমির মাথার ওপরের দড়িটা, লাখে এরকম ঘটনা একটাই ঘটে, র‍্যালফের বন্দুকের প্রথম গুলিতেই উড়ে গেল। মুক্ত হয়ে গেল জিমি। গুলির শব্দে আবারও লাফিয়ে উঠল ঘোড়াটা, কিন্তু হাত বাঁধা অবস্থাতেই ওটার পেটে পা দিয়ে গুঁতো দিল জিমি। ইঙ্গিতটা চেনা জানোয়ারটার। জোর কদমে ছুটল সে শত্রুপক্ষকে বোকা বানিয়ে। কোলির লোকজনদের ঘোড়াগুলো গাছের সঙ্গে বাঁধা ছিল, ফলে জিমির পিছু নিতে দেরি করে ফেলল ওরা। জিমির ঘোড়ার খুরের আওয়াজ দ্রুত মিলিয়ে গেল দূরে।

ক্রোধে উন্মত্ত মাতালগুলো গায়ের ঝাল মেটাবার জন্য এবার র‍্যালফের দিকে ফিরল। ওকে আজ তারা টুকরো টুকরো করে ফেলবে। লরা ঝট করে ভীত ছেলেটাকে আড়াল করে দাঁড়াল।

'ওর সামনে থেকে সরে যান!' ভয়ঙ্কর গলায় বলল একজন। 'ওকে আমরা চাই।'

'আমার লাশের ওপর দিয়ে তোমাদের যেতে হবে,' বলল লরা, ওর চোখে তীব্র ঘৃণা।

'আপনি তাই চাইলে আমাদের কোন আপত্তি নেই,' বলল মাতাল লোকটা, অসভ্য একটা ইঙ্গিত করল সে। বাকিরা সবাই মজা পেয়ে হাসিতে ফেটে পড়ল।

ডা. পিলম্যান অ্যাকশনের জন্য প্রস্তুত। কিশোরকে ইশারা করলেন তিনি, বাতাসে জ্বলন্ত কী একটা জিনিস ছুঁড়লেন। হুডওয়ালা লোকগুলোর কাছে গিয়ে পড়ল ওটা। 'ওটা ঈশ্বরের ক্রোধ,' বিড়বিড় করে বললেন ডাক্তার। মলোটভ ককটেলের মত দেখতে আরও কয়েকটা জিনিস তিনি ছুঁড়ে মারলেন। প্রতিটি তার নিজের তৈরি। 'আর এগুলো আমার প্রতিশোধ,' লোকগুলোর কাপড়ে আগুন ধরে গেছে দেখে উত্তেজনাবোধ করলেন তিনি। আতঙ্কিত বদমাশগুলো মাটিতে গড়াগড়ি খেতে লাগল, আগুন নেভাতে চেষ্টা করছে। র‍্যালফ আর লরার কথা বেমালুম ভুলে গেছে।

কিশোর তরল পদার্থ বোঝাই একটা জ্বলন্ত বোতল ছুঁড়ল। মাটিতে পড়ে ওটা বিস্ফোরিত হতেই সে আনন্দে লাফাতে লাফাতে বলল, 'যেমন কর্ম তেমন ফল। এখন কেমন লাগছে শয়তানের দল?'

কিন্তু 'শয়তানের দল' আদৌ কিশোরের কথা শুনেছে কিনা সন্দেহ। আগুন নেভাতেই তারা ব্যস্ত। একটার পর একটা আগুনে বোমার বিস্ফোরণে ঘোড়াগুলো যেন পাগল হয়ে গেল। উন্মাদের মত ছোটাছুটি শুরু করল।

ওদের খুরের লাথি খেয়ে দুর্বৃত্তগুলো চোখে রীতিমত সর্ষেফুল দেখতে শুরু করল।

সুযোগ বুঝে দূরে অপেক্ষারত জিমি রজারসকে নিয়ে র‍্যালফদের দলটা পালাল। নিরাপদ একটা জায়গায় এসে কিশোর জিমির হাতের বাঁধন খুলে দিল, জিমি ওর দিকে তাকিয়ে হাসল। জিজ্ঞেস করল, 'কী নাম তোমার?'

'কিশোর পাশা,' লাজুক গলায় উত্তর দিল কিশোর।

'কিশোর? বাহ্, সুন্দর নাম তো!'

লরা ওকে জড়িয়ে ধরল। বলল, 'খুব সাহসী ছেলে তুমি, কিশোর। সত্যি!'

লজ্জায় রাঙা হলো কিশোরের মুখ। লাজুক হাসল শুধু, কিছু বলল না। বিপদ কেটে গেছে। এখন ওর খুব ভাল লাগছে। কিছুক্ষণ পর সবাই কীলবোটে চড়ে বসলে র‍্যালফ তার চাচাকে ম্যাপটা দেখাল। জাহাজে বসে এক্ফাঁকে সে এটার নকল করে রেখেছিল। বোটের হালের কাছে দাঁড়িয়ে আছে লরা। মুগ্ধ চোখে দেখছে সুদর্শন জিমি রজারসকে। জিমির কোঁকড়ানো, বাদামী চুল বাতাসে উড়ছে, শার্টটা সেঁটে আছে শরীরের সঙ্গে, পেশীবহুল শরীরের প্রতিটি ভাঁজ সুস্পষ্ট।

জিমি ভাতিজার কথা শুনছে আর ক্ষণে ক্ষণে তার চোখ ঝিকিয়ে উঠছে। 'এখানে কয়েকটা দ্বীপ রয়েছে...' ম্যাপের গায়ে আঙুল দিয়ে নির্দেশ করল র‍্যালফ, '...নাম কিজ। আর সাইপ্রেসগাছগুলো ঠিক এখানটায়। আর এই "এক্স" চিহ্নটা...আর গুপ্তধন, আমাদের ধারণা, ঠিক এই গাছটার পাশেই লুকানো।'

'হতে পারে।' নদীর দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে জবাব দিল জিমি। 'ওখানে নিশ্চয়ই কিছু একটা লুকানো আছে। নইলে রিডলার এত পাগল হত না।'

'চার্লি বলেছিল জিনিসটা খুব মূল্যবান,' তার চাচার দিকে মিনতি ভরা চোখে চাইল র‍্যালফ। 'ওটা কেউ খুঁজে পেলে তুমিই পাবে। খুঁজবে না, চাচা?'

বিষণ্ণ ভঙ্গিতে হাসল জিমি। 'ব্যাপারটা খড়ের গাদায় সুচ খোঁজার মতই। তবে এই মুহূর্তে এ ছাড়া অন্য কিছু করারও উপায় আমার নেই।'

ডা. পিলম্যান একটা সেইল রোপ নিয়ে কাজ করছিলেন, জিমি তাঁকে ডাকতেই চোখ তুলে চাইলেন। 'ডাক্তার, আপনি আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন? তবে র‍্যালফের অনুমতি সাপেক্ষে, অবশ্যই।'

'কেন নয়!' বলল র‍্যালফ।

প্রস্তাবটা পছন্দ হলো ডাক্তারের। বললেন, 'আঃ, দশ বছর আগে হলে আমি নিতাম...মানে সুযোগটা হারাতাম না আরকী, কিন্তু এখন...ঠিক আছে, এখনও নদীতে অ্যাডভেঞ্চারের সুযোগ পেলে আমি সেই সুযোগ হারাতে চাই না। আমি যাব আপনাদের সঙ্গে।'

'চমৎকার!' খুশি হলো জিমি চাচা। 'তা হলে আমরা শীঘ্রিই টাম্পার উদ্দেশে যাত্রা শুরু করব।'

ডাক্তার পিলম্যান একটু ইতস্তত করে বললেন, 'কিন্তু মি. রজারস, আমার মনে হচ্ছে আপনারা খুব ঝুঁকি নিতে যাচ্ছেন। যদি গুপ্তধনের দেখা আপনারা পানও, রিডলার আপনাদের খুন করে ওটা হাতিয়ে নেবে। আর জলাভূমিতে কোন আইন-কানুনের বালাই নেই, আপনি জানেন। তা ছাড়া রহস্যময় জলাভূমিতে যে একবার যায় সে আর ফিরে আসে না!'

ওইদিন বিকেলে তীরে নোঙর করল কীলবোট। জিমি আর ডাক্তার রান্নাবান্নার জন্য জঙ্গলে কাঠ কাটতে গেল। র‍্যালফ থুতনিতে হাত রেখে আনমনা চোখে তাকিয়ে আছে দূরে কোথাও। কী যেন ভাবছে সে। র‍্যালফের এই হঠাৎ উদাসীনভাব বিস্মিত করে তুলল কিশোরকে। সে ডাকল, 'এই, র‍্যালফ।'

'উঁ,' বলল র‍্যালফ।

'মাছ ধরবে?'

'না।'

কিশোরের কপাল কুঁচকে গেল। কী হয়েছে ওর? 'এই, র‍্যালফ কী ভাবছ তুমি? মিস প্যাক্সটনের কথা ভাবছ বুঝি?'

মুখ লাল হয়ে গেল র‍্যালফের। 'ধ্যাত, কী যে বলো তুমি! ওনার কথা ভাবতে যাব কেন আমি?'

কিশোর চোখ বড় বড় করে বলল, 'আমার মনে হয় কী জানো, উনি তোমার প্রেমে পড়েছেন।'

র‍্যালফ খুব মজা পেল কথাটায়। জানতে চাইল, 'কি করে মনে হলো তোমার?'

'ফ্রায়ার পয়েন্টে উনি যেভাবে তোমাকে জড়িয়ে ধরেছিলেন! অনেকক্ষণ জড়িয়ে ছিলেন দেখলাম তো!'

র‍্যালফ কথাটাকে গুরুত্ব না দেয়ার ভান করে বলল, 'আমি ওনাকে

আঘাত দিতে চাইনি বলে নিজেকে ছাড়িয়েও নিইনি।'

মুচকি হাসল কিশোর। 'তবে উনি যে তোমাকে ভালবাসেন তার প্রমাণ আমি তোমাকে দিতে পারি।'

সামনের দিকে ঝুঁকে এল র‍্যালফ। 'কীভাবে?'

কিশোর রহস্যময় গলায় বলল, 'তুমি যদি কোন মেয়ের হাত ঘুমন্ত অবস্থায় জলের মধ্যে ফেলতে পারো, তা হলে সে তোমাকে তার ভালবাসার মানুষটির কথা বলে দেবে।'

নাক সিটকাল র‍্যালফ। 'ধ্যাত, ওরকম কাজ আমি জীবনেও করব না।'

কিন্তু কিশোর হাল ছাড়ল না। 'উনি এখন ঘুমাচ্ছেন,' ওকে মিষ্টি কথায় ভুলাতে চাইল সে। 'এটাই চান্স। এসো, ব্যাপারটা পরীক্ষা করে দেখি।'

শেষ পর্যন্ত কৌতূহলেরই জয় হলো। সব ভানভণিতা ভুলে উৎসাহী হয়ে উঠল র‍্যালফ। 'একটা গামলা নিয়ে এসো জলদি।' তাড়া দিল সে কিশোরকে। দু'জনে ছুটল গামলা আনতে।

প্রায় তীর ঘেঁষে একটা স্টিমবোট এগিয়ে চলেছে, ওটার বো-তে দাঁড়িয়ে আছে রিডলার! পাশে হোলার। বেড়ালের যদি নয়টা জীবন তো, রিডলারের আরেকটা বেশি। খাদে লাফিয়ে পড়েও সামান্য আহত হওয়া ছাড়া আর কোন শারীরিক ক্ষতি হয়নি তার। অবশ্য সরাসরি পানিতে পড়েছিল বলেই রক্ষা। কিন্তু মৃত্যুর হাত থেকে ফিরে এসেও শিক্ষা হয়নি দস্যু সর্দারের। বরং রোখ চেপে গেছে আরও। র‍্যালফকে যে করে হোক পাওয়া চাই-ই। একটা পুঁচকে ছেলে ওকে এভাবে নাকানি চোবানি খাওয়াচ্ছে, বারবার হাত ফস্কে চলে যাচ্ছে, ভাবলেও কান দিয়ে ভাপ বেরুতে থাকে রিডলারের। তারপর রয়েছে স্বর্ণকেশী ওই মেয়েটা। ওকে খাদে লাফ দিতে বাধ্য করে সে অমার্জনীয় অপরাধ করেছে। এর শোধও তাকে নিতে হবে। ওদের দু'জনকেই এখন হন্যে হয়ে রাতদিন খুঁজে বেড়াচ্ছে রিডলার।

হোলার রিডলারের হাতে ঠেলা দিল। 'তীরে দেখুন, ক্যাপ্টেন।'

রিডলার পেতলের টেলিস্কোপটা চোখে লাগাল। ডা. পিলম্যানের বোটটাকে দেখেই চিনতে পারল ওটার পালে ডাক্তারী বিজ্ঞাপনের সমারোহের কারণে। তার চোখ সরু হয়ে এল। 'ওই তো ওরা!'

'ছেলেটাকে দেখতে পাচ্ছেন?' জিজ্ঞেস করল হোলার।

'ডেকে কাউকে দেখছি না, ওটা সেই হাতুড়ে ডাক্তারের বোট।' এক ক্রুর উদ্দেশে হাঁক ছাড়ল সে। 'স্পীড বাড়াও।'

'জী, স্যার!'

'এবার আর ওদের রক্ষা নেই,' শপথবাক্য উচ্চারণ করল রিডলার।

র‍্যালফ আর কিশোর, জানেও না কী বিপদ ঘনাচ্ছে মাথার ওপর, খুব সাবধানে লরার কেবিনের দিকে এগিয়ে চলল। নরম, সোনালী চুল ঘিরে রেখেছে তার চাঁদ মুখখানাকে, সৃষ্টি করেছে এক আশ্চর্য দীপ্তি। ওর আঁখি পল্লবগুলো বড়বড়, কাস্তের মত বাঁকানো, গালজোড়া গোলাপী। র‍্যালফ হাঁ করে অনেকক্ষণ এই ঘুমন্ত সৌন্দর্যের দিকে তাকিয়ে থাকল। এত সুন্দর মিস প্যাক্সটন! এত সুন্দর! বাঙ্কের এক কোনায় লরার একটা হাত ঝুলে আছে। জল ভরা গামলাটা ধরে থাকল কিশোর, র‍্যালফ খুব আস্তে লরার হাত ধরল। চম্পক আঙুলগুলো মৃদু কাঁপল। আস্তে, শ্বাস বন্ধ করে, র‍্যালফ লরার হাতখানা গামলার মধ্যে রাখল।

ফিসফিস করল কিশোর, 'কান পেতে শোনো। উনি এখনই তাঁর ভালবাসার মানুষটির কথা বলবেন।'

লরার প্রতিক্রিয়া হলো দেখার মত। হাতে ঠাণ্ডা জলের ছোঁয়া লাগতেই তীক্ষ্ণ গলায় চিৎকার করে সে লাফিয়ে উঠল। ধাক্কা লেগে গামলা গেল উল্টে, ওকে ভিজিয়ে একসা করে দিল। 'ডুবে যাচ্ছি আমরা!' গুঙিয়ে উঠল লরা। চোখ পুরোপুরি মেলে গেল, সম্পূর্ণ জেগে গেল সে। পলায়নপর বিচ্ছুদুটোকে দেখেই ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। 'আমাকে নিয়ে ইয়ার্কি হচ্ছিল, না?' বলতে না বলতে বাইন মাছের মত ওর হাত থেকে পিছলে গেল দু'জনেই। 'ফিরে এসো, কিশোর আর র‍্যালফ...' চিৎকার করতে লাগল লরা, ভেজা জামা উঁচু করে ধরে আছে, 'ফিরে এসো বলছি! আজ তোমাদের একদিন কি আমার একদিন!'

কিন্তু যাদের উদ্দেশে হুমকি প্রদর্শন তারা ততক্ষণে পগারপার। লরাও রাগে কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে এল ডেকে। ঝড় তুলে সে ওদের খুঁজতে শুরু করল।

রিডলার এদিকেই তাকিয়ে ছিল। 'ওখানে কী যেন হচ্ছে,' বিড়বিড় করে বলল সে।

লরা কিশোর আর র‍্যালফকে ডেকের এক কোনায় গুটিসুটি মেরে বসে থাকতে দেখল। 'এখন বলো তোমরা আমার ওখানে কী করছিলে?' রেগে আগুন হয়ে জিজ্ঞেস করল সে।

গোলমাল আর চেঁচামেচি শুনে জিমি বেরিয়ে এল জঙ্গল থেকে। বোটের দিকে এগুল, তার হাতে লাকড়ির ছোট পাঁজা। 'কী হয়েছে?' জানতে চাইল

সে।

'কিচ্ছু হয়নি,' মুখ কালো করে জবাব দিল র‍্যালফ। ওর আফসোস হচ্ছে কেন কিশোরের কথা মত অমন বোকামি করতে গেল।

'কিচ্ছু হয়নি!' ওকে ভেঙচাল লরা। 'দেখি, আমার দিকে তাকাও।' ভেজা ব্লাউজ আর স্কার্টের দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'ওরা আমাকে ঘুমের মধ্যে ডুবিয়ে মারার তাল করেছিল।'

'না, না তা কেন।' আমতা গলায় বলল র‍্যালফ। 'আমরা অল্প একটু জল ফেলেছি শুধু।'

ডা. পিলম্যান হাতে অনেকগুলো লাকড়ি নিয়ে হাজির হলেন বোটে। ঘেমে লাল হয়ে গেছেন তিনি। এ ধরনের কাজে মোটেও অভ্যস্ত নন ভদ্রলোক। লরা কিংবা র‍্যালফ নয়, তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করল স্টিমবোটটা। খুব দ্রুত ওটা ছুটে আসছে তাদের দিকে। 'আরে, ওটা সোজা আমাদের দিকেই আসছে কেন?' অবাক হলেন তিনি। 'র‍্যালফ আমার স্পাইগ্লাসটা এনে দাও তো, লক্ষ্মী সোনা। ওই যে ওখানে।' তাঁর ছোট কেবিনের দিকে নির্দেশ করলেন তিনি। র‍্যালফ গ্লাসটা তাঁর হাতে দিলে তিনি ওটা চোখে দিয়েই মুখ অন্ধকার করে ফেললেন। 'আশা করি ওটা রিডলার নয়,' ঠোঁট কামড়ালেন তিনি। 'নাকি সেই ব্যাটাই?' আইগ্লাসটা তিনি র‍্যালফকে দিলেন।

'আরে ওই তো!' কেঁপে উঠল র‍্যালফের গলা।

জিমি কাঠের পাঁজাটা ছুঁড়ে ফেলল মাটিতে। 'ওরা এক্ষুণি আমাদের ধরে ফেলবে। আমার সঙ্গে এসো। শিগ্‌গির!'

লরা কিশোর এবং র‍্যালফ লাফিয়ে নামল বোট থেকে, সবাই মিলে দৌড় দিল জঙ্গল লক্ষ্য করে।

রিডলার ওদের দেখতে পেল, পিস্তল হাতে নিল সে। 'ফায়ার!' নির্দেশ দিল সে। গুলির আঘাতে ছিটকে উঠল জল, ছড়িয়ে পড়ল নদী তীরের শুকনো পাতায়।

'ও ও ও ও ও...' গলা ফাটিয়ে চিৎকার দিল লরা, একটুর জন্য ওর পায়ে গুলি লাগেনি।

স্টিমবোটটা তীরে, ডাক্তারের বোটের কাছে ভিড়ল। রিডলারের লোকেরা নেমে পড়ল মাটিতে। 'খোঁজো ওদেরকে!' গর্জে উঠল গুণ্ডা সর্দার। 'খুঁজে বার করো!' ছড়িয়ে পড়ল দলটা, ঝোপঝাড় আর জঙ্গলে ঢুকল কয়েক জন, বাকিরা ছোট একটা পাহাড় বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করল।

জিমি, ডাক্তার আর অন্যরা একটা ঝোপের আড়ালে হামাগুড়ি দিয়ে বসে থাকল। ডাক্তারের হাতে খোঁচা দিল জিমি, 'আপনি স্টিমবোট চালাতে জানেন?'

'আমি স্টিমবোট চালাতে পারি?' এমনভাবে কথাটা তিনি বললেন যে সবাই বুঝল তাকে বোকার মত প্রশ্নটা করা হয়েছে। জিমি ঠোঁটে আঙুল দিল। পরক্ষণে হোলার ওদের লুকানো জায়গার কয়েক হাত দূর থেকে ছুটে গেল।

'ও করছেটা কী?' বিড়বিড় করে বলল র‍্যালফ। কে যেন একটা শুকনো ডালে পা দিয়েছে। গুলির মত ফটাশ শব্দে ওটা ভাঙল। বিদ্যুৎ গতিতে ঘুরে দাঁড়াল হোলার, হাতে উদ্যত রাইফেল।

এভাবে বন্দী অবস্থায় মরিয়া হয়ে উঠল ওরা। জিমি দ্রুত একটা প্ল্যান এঁটে ফেলল। ডাক্তারকে ইশারা করল সবাইকে নিয়ে বোটে ফিরতে। তারপর বিপরীত দিকে একটা কাঠের টুকরো ছুঁড়ে সেদিকে ছুটে গেল সে নিচু হয়ে। প্ল্যানটায় কাজ হলো। হোলার জিমের পিছু পিছু ছুটল। ডাক্তার লরা আর ছেলে দুটোকে নিয়ে গা বাঁচিয়ে এগোলেন তাঁর বোটের দিকে।

'ওদিকে,' চিৎকার করে রিডলারের দৃষ্টি আকর্ষণ করল হোলার।

'ও ঈশ্বর না!' গুঙিয়ে উঠল লরা জিমি যেদিকে ছুটে পালিয়েছে সেদিকে গুলি বর্ষিত হতে দেখে।

ডাক্তার ওর হাত চেপে ধরলেন। 'বোটে চলো...জলদি!'

চাচাকে বিপদে ফেলে যেতে মন চাইল না র‍্যালফের। কিন্তু ডাক্তার ওকে ধাক্কাতে ধাক্কাতে নিয়ে চললেন। 'পেছনে তাকিও না, র‍্যালফ। দেরি করলে ওরা আমাদের ধরে ফেলবে। জলদি পা চালাও। আমরা ওদের বোট নিয়ে পালাব। তাড়াতাড়ি! তাড়াতাড়ি!'

তীরে এসে ডাক্তার লরা, র‍্যালফ এবং কিশোরকে স্টিমবোটে উঠিয়ে দিয়ে নিজের বোটে গিয়ে উঠলেন তিনি। 'আমি এক্ষুণি আসছি,' চেঁচিয়ে বললেন তিনি, কিন্তু তার কথা শেষ হওয়ার আগেই একঝাঁক বুলেট ছুটে এল তাঁর দিকে। ডাক্তার তাড়াতাড়ি তাঁর কেবিনে ঢুকে পড়লেন। কয়েক মিনিট যাওয়ার পর ভীত র‍্যালফ চিৎকার করে উঠল, 'ডা. পিলম্যান, জলদি আসুন, প্লীজ!'

'আপনি ওখানে কী করছেন?' লরা নার্ভাস গলায় বলল।

ডাক্তার তাঁর কীলবোটে যেসব জামাকাপড় ছিল সবগুলোতে কী একটা তরল পদার্থ ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিলেন। যখন তাকে পালাতেই হচ্ছে তখন

তার জীবনের সঞ্চিত সেরা সম্পদ যাতে দুর্বৃত্তদের হাতে না পড়ে সেই ব্যবস্থাই করে যাচ্ছেন। 'দুঃখিত!' এতদিনের বিশ্বস্ত কীলবোট, যেটা তাঁর বাড়ির মতই ছিল সেটার কাছে যেন করুণ গলায় ক্ষমা চাইলেন ডা. পিলম্যান।

'তাড়াতাড়ি, ডাক্তার!' অধৈর্য এবং ভীত স্বরে ডাকল লরা। রিডলার এবং তার লোকেরা ছুটে আসছে তীরের দিকে। আর কয়েক গজ দূরে আছে মাত্র।

চোখ বন্ধ করে ডাক্তার লাফিয়ে নামলেন স্টীমবোটে। 'ঠিক আছে, চলো এখন।' র‍্যালফ ব্যাকুল চোখে চেয়ে আছে তীরের দিকে। ওর চাচাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

ডাক্তার ছোট এঞ্জিনরুমে গিয়ে ঢুকলেন। স্টিমবোট কখনও চালাননি তিনি। কিন্তু একটা লিভার টেনে ধরে 'চল্ বাপ' বলতেই তাঁকে আশ্চর্য করে দিয়ে স্টার্ট হয়ে গেল এঞ্জিন। লরা ছুটে এল ভেতরে। ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল, 'আপনি জানেন তো কীভাবে এটা চালাতে হয়?'

কাঁধ ঝাঁকালেন ডাক্তার। 'সামান্য ধারণাও নেই।' স্বীকার করলেন তিনি। 'এর আগে কখনও চেষ্টা করিনি।' কন্ট্রোলের ভার লরাকে দিলেন তিনি। 'তুমি একবার চেষ্টা করে দেখো!'

'জিমের কী হলো?' জিজ্ঞেস করল লরা।

'কোন উপায় নেই,' আন্তরিক দুঃখিত গলায় বললেন ডাক্তার।

'না! না! চাচাকে এভাবে ফেলে রেখে যাব না!' কেঁদে ফেলল র‍্যালফ।

ওর কাঁধে হাত রাখলেন ডাক্তার। 'প্ল্যানটা এরকমই উনি করেছিলেন, র‍্যালফ। সিদ্ধান্তটা তাঁরই।'

রিডলার তার দলবল নিয়ে নদীতীরে হাজির হয়ে গেল। 'থামো!' রাগে ফেটে পড়ল সে।

কিন্তু স্টিমবোট থামল না। লরার হাতে যেন জাদু আছে। ধীরে ধীরে ওটা ঘুরে গেল, ক্রমশ তীর থেকে দূরে সরে যেতে লাগল। সবাই গভীর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

একটা বুলেট এসে লাগল স্ট্রাকচারে। 'সাবধান!' সতর্ক করে দিলেন ডাক্তার। 'ওরা গুলি ছুঁড়ছে।' ফ্লোর আর কেবিনে গুলি ছুটে আসতেই ওরা সবাই নিচু হয়ে বসল।

'কীলবোট,' চিৎকার করল রিডলার। ওদেরকে এত সহজে ছাড়বে না সে। ধাওয়া করবে।

রিডলারের লোকেরা কীলবোটের দিকে এগোতেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ হলো বাতাসে। ছোট কীলবোটটা টুকরো টুকরো হয়ে গেল চোখের পলকে, জ্বলন্ত ভাঙা অংশগুলো ছিটকে পড়ল নদীতে। রিডলার আর তার দলের লোকেরা বিস্ফোরণের ধাক্কায় মাটিতে চিৎপাত হয়ে পড়ে গেল।

'জিমি চাচা…ওহ্, জিম চাচা…' আর্তনাদ করে উঠল র‍্যালফ প্রবল হতাশায়।

খুদে স্টিমবোটটা নদীপথে ছুটে চলল। কিন্তু জিমি রজারসের কোন চিহ্ন দেখা গেল না কোথাও।

সাত

পরদিন ছোট দলটা নিউ অরলিন্সে পৌছুল। সুন্দর শহরটাতে দেখার মত অনেক জিনিস আছে। কিশোর চিত্তাকর্ষক জায়গাগুলোতে চরকির মত ঘুরে বেড়ালেও র‍্যালফের মন বেজায় খারাপ বলে সে কোথাও গেল না। আবার যাত্রা করার প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে কেনাকাটার জন্য বাজারে গেলেন ডা. পিলম্যান। লরা একাই ঘুরতে বেরুল। জিমি চাচার আর কোন খোঁজ না পেলেও র‍্যালফ হাল ছেড়ে দেবে না ঠিক করল। ওদের বাড়িটা তাকে রক্ষা করতেই হবে।

ডা. পিলম্যান বাজার থেকে ফিরে এসে ওদেরকে বললেন তিনি প্ল্যান করেছেন এরপর স্থলপথে যাত্রা শুরু করবেন রিডলারদের ফাঁকি দেয়ার জন্য। শয়তানটা হয়তো জাহাজঘাটাগুলোতে পাহারা বসাবে। পরিকল্পনামত ওরা সেই রাতেই ট্রেনে চেপে শহর ত্যাগ করল। কিন্তু জানল না এত সাবধানতা অবলম্বন করেও কাজ হয়নি। ওদের উপস্থিতি গোপন থাকেনি।

কুয়াশাঢাকা, মিটমিটে বাতিজ্বলা এক চোরাগলির একটা পোড়ো দালানের দিকে মলিন পোশাক পরা ভিখিরি শ্রেণীর এক লোক দ্রুত এগোচ্ছে, দালানটার পেছন থেকে যেন ভূতের মত উদয় হলো দুই ব্যক্তি। 'দাঁড়াও এখানে,' আগন্তুককে আদেশ করল একজন। এ আমাদের পূর্ব-পরিচিত সেই হোলার। কুঁতকুঁতে চোখের দৃষ্টি কঠিন করে সে জানতে চাইল, 'খবর কী?' হোলারের পাশে দাঁড়ানো দীর্ঘদেহী রিডলারকে দেখে

আগন্তুক নার্ভাস বোধ করল। বলল, 'ওদেরকে আমি স্টেশন হাউজে দেখেছি। ট্রেনে চেপে ওরা চলে গেছে।'

'কী করে বুঝলে ওরাই সেই লোক?' ঘেউ ঘেউ করে উঠল রিডলার।

'আপনি যেভাবে বর্ণনা করেছেন,' মিনমিনে গলায় বলল সে।

'বুড়ো, সুন্দরী এক মহিলা আর দুটো ছোট ছেলে। একজন সাদা, অন্যজন বাদামি।'

হোলারকে উল্লসিত দেখাল। 'ওরাই ক্যাপ্টেন!' লোকটার দিকে ঘুরল সে। 'কতক্ষণ আগে দেখেছ?'

থুতনিতে তালু ঘষতে ঘষতে লোকটা বলল, 'এই তো কিছুক্ষণ আগে। আমি মাত্র ওখান থেকে এলাম।'

সন্তুষ্ট মনে হলো রিডলারকে। 'তারমানে ওরা উলি রেল রোড ধরে টাম্পার দিকে চলেছে। ওরা ভেবেছে স্থলপথে গেলে আমার চোখ ফাঁকি দিতে পারবে।'

'হয়তো পারবে যদি আমরা এখুনি ওদের পিছু না নেই।'

'আস্তে, হোলার।' খিকখিক করে হাসল রিডলার।

'ওরা এখনও জানে না যে ওরা যে রাস্তার টিকেট কিনেছে সেখান থেকে আর ফিরে আসা যায় না।' অবহেলায় সে ইনফরমার লোকটার দিকে একটা কয়েন ছুঁড়ে দিল। টাকাটা পেয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল সে।

পরদিন সকাল। ডা. পিলম্যান সবাইকে নিয়ে টাম্পা পৌঁছলেন। প্রথম দর্শনেই জায়গাটাকে অপছন্দ হলো। সারা টাম্পায় একটাই মাত্র পাকা দালান–টাম্পা ট্রেডিং পোস্ট। লোকজন অলস এবং জীবন সম্পর্কে কেমন উদাস। বাতাসে মাছের আঁশটে গন্ধ। জেলেরা রাতে পাতা জাল তুলছে, মাছগুলো ছুঁড়ে ফেলছে নৌকায়।

টাম্পা থেকে ওদের পরবর্তী গন্তব্য ফ্লোরিডার জলাভূমি। জায়গাটা অচেনা এবং বিপজ্জনক। ডা. পিলম্যান একজন গাইড নেবেন ঠিক করলেন। আলোচনা পর্বের এক ফাঁকে লরা কিছু জামাকাপড় কিনে আনল কাছের এক স্টোর থেকে। ফুলেল একটা বড় হ্যাট আর লিনেন জ্যাকেট কিনল সে। অবশ্য জ্যাকেটটার খুবই দরকার ছিল। কারণ চামড়া পোড়ানো খরতাপ আর মশামাছিতে ভরা জলাভূমিতে কাঁধখোলা পোশাক চলে না।

ডা. পিলম্যান গাইড খুঁজতে বেরিয়েছিলেন। হেভী মুড নিয়ে তিনি ফিরলেন। সঙ্গে এক লোক। নাম বিলি বিগস। লোকটা নাকি তার হাতের তালুর মতই জলাভূমির সব শাখা-প্রশাখা চেনে। লরা লোকটাকে দেখেই

নাক কোঁচকাল। বোটকা গন্ধ আসছে গা দিয়ে। ঈশ্বর মালুম কতদিন সে গোসল করে না। লোকটার মাথায় কাকের বাসা, গায়ে এত ময়লা যেন চিমটি দিলেই উঠে আসবে। সে বিশ্রীভাবে লরার দিকে তাকিয়ে থাকল। বিরক্ত লরা মুখ ঘুরিয়ে নিল। অবাক হয়ে ভাবল ডাক্তারের বলিহারি পছন্দের কথা। গাইডটাকে তার মোটেও ভাল লাগেনি। কেমন শয়তানি চাউনি!

স্থানীয় একটা গানের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে গাইড টাম্পা ট্রেডিং পোস্টে ঢুকল। কিছু খাবার দাবার কিনল। প্যাকেটগুলো সে আর ছেলেরা মিলে সাজিয়ে রাখল লম্বা, সরু নৌকায়। কাঠের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি ক্যানোটায় অনেকগুলো বৈঠা বাঁধা। কাজটাজ শেষ করার পর ডা. পিলম্যান এলেন। তাঁকে দেখে বিলি বলল, 'আমরা এখন যাত্রার জন্য প্রস্তুত, ডাক্তার সাহেব!'

ডাক্তার মাথা ঝাঁকিয়ে লরার দিকে ফিরলেন। 'এখানকার চার্চের রেভারেণ্ড মাকলেরয়ের সঙ্গে অনেক কথা হলো। রিডলার কিংবা তার দলের কাউকে এখানে দেখা যায়নি বললেন তিনি। আমি আগেই ওদের সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে বলেছিলাম ভদ্রলোককে। বোঝা যাচ্ছে আমাদের কৌশলটা কাজে লেগেছে।'

বিলি কাজের ভান করলেও তার কান ঠিকই খাড়া থাকল এদিকে। ডাক্তারের সব কথা শুনেছে সে। 'নৌকা কি ছাড়ব, ডাক্তার সাহেব?' জিজ্ঞেস করল ও।

'হ্যাঁ, ছাড়।' বললেন ডা. পিলম্যান।

নৌকায় ঠিকঠাক মত বসে লরা ছাড়া অন্য সবাই হাতে বৈঠা নিয়ে প্রস্তুত হলো। 'সবাই রেডি তো?' জিজ্ঞেস করলেন ডাক্তার, 'ঠিক আছে! এক, দুই, তিন। মার টান হেইয়ো।' একসঙ্গে, সমান ছন্দে বৈঠা পড়তে লাগল পানিতে। তরতর করে এগিয়ে যেতে লাগল ক্যানো। শুরু হলো অভিযানের পরবর্তী পর্ব।

এভারগ্লেডস নামের এই জলাভূমিটি অদ্ভুত এবং রহস্যময়। গা শিরশিরে একটা নীরবতা যেন চেপে বসল ওদেরকে। শুধু বৈঠার ছপাৎ ছপাৎ ছাড়া অন্য কোন শব্দ নেই। ঘন কালো জল কেটে এগিয়ে চলেছে নৌকা। লরার কেমন ভয়ভয় করতে লাগল। বাতাস গরম, স্থির। ঘামে নেয়ে গেল সবাই। লরা বারবার পরিষ্কার লিনেন কাপড় দিয়ে মুখ আর গলা মুছতে লাগল। ঘামের গন্ধ দূর করার জন্য সেন্ট স্প্রে করল। র‍্যালফ আর কিশোর বেশ আগ্রহ নিয়ে কিছুক্ষণ লরার কাণ্ডকারখানা দেখল। তারপর

চোখ ফেরাল জলাভূমির দিকে। এমন জলাভূমি জীবনে দেখেনি ওরা। এখানে ওখানে জলের মধ্যে থেকে মাথা উঁচিয়ে আছে আধা ডুবন্ত দ্বীপ, বিশাল জলাভূমির তীর বোঝাই সাইপ্রেস আর গরান গাছের জঙ্গলে। বুনো অর্কিড আর কমলালেবুর কত গাছ যে চোখে পড়ল। একটি হরিণশাবক জল খেতে এসেছিল তীরে, ওদের দিকে ভীরু চোখে তাকাল তারপর সাঁৎ করে ঘন একটা ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। সাদা রঙের খুব সুন্দর একটি পাখি উড়ে গেল ওদের মাথার ওপর দিয়ে।

ডাক্তার উত্তেজিত হয়ে পাখিটার দিকে ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন, 'দেখো দেখো তুষার স্নোগ্রেট। প্রকৃতির এক অপূর্ব সৃষ্টি!'

র‍্যালফ আর কিশোর মুগ্ধ চোখে পাখিটিকে দেখল। বিলি বলল, 'আহা, সত্যি সুন্দর!' লরার দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে হাসল সে। 'ওই পাখির পালকে খুব সুন্দর টুপি হয়, মিস। পরলে আপনাকে দারুণ লাগবে।'

লরা শুকনো গলায় বলল, 'থাক, আমাকে আর দারুণ লাগতে হবে না।'

র‍্যালফ লরার কাঁধের ওপর দিয়ে চট করে একবার বিলির দিকে চাইল। ফিসফিস করে বলল, 'ও আপনাকে পটাতে চাইছে।'

লরা ঠোঁট কামড়াল। 'জানি। কিন্তু লোকটাকে আমার পছন্দ হচ্ছে না। ওকে বিশ্বাস করতে পারছি না।'

হঠাৎ হাঁ হয়ে গেল লরার মুখ, চিৎকার বেরিয়ে এল গলা চিরে। ওর চোখ দুটো বিস্ফারিত, তাকিয়ে আছে তীরের দিকে। ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে অন্যেরা ওদিকে চাইল। সঙ্গে সঙ্গে কেঁপে উঠল ভয়ে। তীরে দাঁড়িয়ে আছে লম্বা এক রেড ইন্ডিয়ান। ওদের দিকে তাকিয়ে আছে সে, সরু মুখটা ভাবাবেগ শূন্য। তার কাঁধে একটা বানর। লোকটা একচুল নড়লও না কিংবা কিছু বললও না। কিন্তু ওর আচরণে এমন কিছু আছে যা সত্যি ভয়ঙ্কর। ইন্ডিয়ানটাকে পাশ কাটাল ক্যানো, লরা ভয়ে ভয়ে ঘাড় ফেরাল। আগের জায়গায় পাথরের মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। 'ওহ্...ওহ্...' কেঁপে উঠল লরা।

'ওটা একটা সেমিনোল ইন্ডিয়ান,' বলল বিলি। 'বেশ বন্ধুবৎসল...তবে ওদের না ঘাঁটানো পর্যন্ত।'

র‍্যালফ আর কিশোর চোখাচোখি করল। ইন্ডিয়ানটা হঠাৎই নেই হয়ে গেল। কিন্তু ভয় যেন আরও জাঁকিয়ে বসল লরার মনে। বারবার মনে হলো অনেকগুলো চোখ আড়াল থেকে ওদের দেখছে, অনুসরণ করছে। এত

গরমেও ঠাণ্ডা হয়ে গেল তার শরীর।

'বৈঠা আস্তে মারো,' বলল বিলি।

'একটু বিরতি দিলে কি তোমরা কিছু মনে করবে?' বললেন ডাক্তার। দরদর করে ঘামছেন তিনি। 'তোমাদের মত তো আর জোয়ান নই। বয়স হয়েছে। বুঝতেই পারছ!' ক্ষমা-প্রার্থনার ভঙ্গিতে হাসলেন তিনি। জলে রুমাল ভিজিয়ে মুখ মুছলেন।

র‍্যালফ আর কিশোরও বিরতি দিল। এক নাগাড়ে বৈঠা বাইতে বাইতে ওরাও ক্লান্ত। বৈঠার ওপর শুয়ে পড়ল দু'জনেই। কিশোর জলে হাত নাড়তে লাগল। 'হেই!' সাবধান করল বিলি। 'পানি থেকে হাত ওঠাও। এখানে কুমির আছে।'

কাঁচের মত মসৃণ জলের দিকে অবিশ্বাসের চোখে তাকাল কিশোর। 'কই, কোন কুমির দেখছি না তো!'

'হা!' ব্যঙ্গ করল বিলি। 'ঠিক আছে, দেখাচ্ছি তোমাকে।' ঠোঁট দুটো সরু করে অদ্ভুত একটা শব্দ করল সে মুখ দিয়ে। শব্দটা প্রকৃতির নৈঃশব্দ ভেঙে দিল, প্রতিধ্বনি তুলল চারদিকে। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক দৃশ্যটা দেখল ওরা। যেন নদীতীরে ঘাপটি মেরে বসেছিল পেল্লায় দানবগুলো, ঝুপঝাপ লাফিয়ে পড়ল জলে, সাঁ সাঁ করে এগিয়ে আসতে লাগল ক্যানো লক্ষ্য করে। আরেকটা কুমির একটা গাছের গুঁড়ির নীচে বালির সঙ্গে শরীর মিশিয়ে শুয়েছিল, মাথা তুলল।

ভয়ে লাফিয়ে উঠল কিশোর, দুলে উঠল নৌকা। 'আরে, আরে করে কী!' চেঁচিয়ে উঠল বিলি। 'বসে পড়ো ছোকরা। নৌকা উল্টে ফেলবে তো! তা হলে সবাই কুমিরের পেটে চলে যাব।' বসে পড়ল কিশোর, কাঁপছে থরথর করে।

বিলি বলে চলল: 'এখন তুমি যদি ওদের একটাকে ধরতে চাও তা হলে সোজা ওটার শরীরের নীচে চলে যাও। কারণ কুমিররা নীচের চোয়াল নড়াতে পারে না।'

বিলির এসব ফাজলামি মোটেও ভাল লাগছে না লরার। সে তীক্ষ্ণ গলায় বলল, 'উহ্, লোকটা এত বকবক করতে পারে! মাথা ধরে গেল।'

লরার কথা গায়ে মাখল না বিলি।। বলল, 'কুমিরগুলোকে আর বিরক্ত না করাই ভাল। কী বলেন, ডাক্তার সাহেব?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক বলেছ।' ডা. পিলম্যান একটা বৈঠা হাতে নিয়ে কুমিরগুলোর দিকে উঁচিয়ে 'হেই হেই' করতে লাগলেন। কিন্তু ওগুলো ক্রূর

চোখে তাদের নৌকাটাকে অনুসরণ করেই চলেছে। 'কি করলে ওগুলো যাবে, বলো তো?' বললেন তিনি, ভাবলেন বৈঠা দিয়ে একটার মাথায় ঘা বসাবেন। কিন্তু কাজটা খুব বিপজ্জনক হয়ে যাবে ভেবে চিন্তাটা নাকচ করে দিলেন তিনি।

ওরা দ্রুত বৈঠা বেয়ে কুমিরগুলোকে পেছনে ফেলে এল। হঠাৎ সবাইকে চমকে দিয়ে জলের ওপরে ভুস করে ভেসে উঠল বিকট একটা মাথা। একটা জলহস্তী। প্রায় একই সঙ্গে ওদের চোখে পড়ল কুগারটাকে। একটা গাছের ডালে জানোয়ারটা বসে আছে, ক্ষুধার্ত চোখে চেয়ে আছে ক্যানোর যাত্রীদের দিকে। পিলে চমকানো ডাক ছেড়ে উড়ে গেল এক ঝাঁক পাখি।

ভয়ে অজ্ঞান হওয়ার দশা হলো লরার। 'শ্বাস নিতে পারছি না আমি,' করুণ গলায় অভিযোগ করল সে। কিন্তু কেউ ওর কথার জবাব দিল না। প্রত্যেকে ভীত আর সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। লম্বা ঘাসের জঙ্গল দিয়ে ক্যানো চলেছে। বিশাল, কালো গড়ান গাছগুলো জলের ওপর ঝুলে আছে প্রেতের প্রতিচ্ছবি হয়ে। থমথমে একটা ভাব চারদিকে। যেন ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটতে চলেছে।

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ডাক্তার পিলম্যান। এই প্রথম তাঁর মনে হলো এই অভিযানে এসে তিনি ভুলই করেছেন। রুমালে কপালের ঘাম মুছলেন তিনি। হঠাৎ বিস্ময়ে চোখ বড় হয়ে গেল তাঁর, ভাবলেন ভুল দেখছেন। লম্বা একটা গাছে লাল কাপড়ের একটা ফেস্টুন জড়ানো। যেন একটা মার্কার, কিছু একটার সঙ্কেত দিচ্ছে। কিন্তু এমন জায়গায় কে এটা টাঙাল? তিনি কিছু বলার আগেই গাইড বিলি বলে উঠল, 'ঠিক আছে, ছেলেরা। এবার বাঁ দিকে নৌকা ঘুরাও।'

কোন কথা না বলে র‍্যালফ আর কিশোর বাঁয়ে নৌকা ঘুরাল, মূল কোর্স থেকে সরে ঢুকে গেল সরু একটা খাঁড়িতে। কপাল কোঁচকালেন পিলম্যান। 'বাঁয়ে?' অবাক হয়ে বললেন তিনি। 'কিন্তু আমার তো ধারণা ছিল আমাদের দক্ষিণ দিকে যেতে হবে।' যে জায়গাটা থেকে এইমাত্র তারা সরে এসেছেন সেদিকে হাত দেখালেন তিনি।

বিলি ভুরু কুঁচকে কী যেন ভাবল। তারপর বলল, 'জ্বী, জ্বী ডাক্তার সাহেব, আপনি ঠিকই বলেছেন। কিন্তু এদিক দিয়েও আমরা আমাদের গন্তব্যে পৌঁছুতে পারব। বরং এদিক দিয়ে গেলে আরও তাড়াতাড়ি যাওয়া যাবে। ধরুন, আর মাইলখানেক।' জোরে বৈঠা বাইতে শুরু করল সে

এবার। বলল, 'ছেলেরা আরও জোরে! আরও জোরে! হেইয়ো! হেইয়ো!'

বৈঠার ঝপাৎ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। জায়গাটাকে ঘিরে আছে হালকা কুয়াশা, পচা পাতার গন্ধ ধাক্কা দিল নাকে। লরা বসে আছে চুপচাপ। সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে সে। ওর মন বলছে কোথাও মস্ত একটা ঘাপলা আছে। বিপদে পড়তে যাচ্ছে ওরা। সরু খাঁড়িটাকে মনে হলো কালো, মোটা মস্ত এক অজগর। সুযোগ পেলেই ওদের গিলে খাবে।

আরেকটা সরু খাঁড়ির মুখে আসতেই বিলি বৈঠা তুলল। বলল, 'ব্যস, আজ এই পর্যন্তই।'

'কেন?' জিজ্ঞেস করল লরা। অশুভ আশঙ্কায় দুরু দুরু করে উঠল বুক।

'কারণ, সামনের পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে মিঠে পানির আর কোন সংস্থান নেই।' জবাব দিল বিলি। 'এখান থেকে মিঠে পানি নিয়ে আবার আমরা যাত্রা শুরু করব।'

ব্যাখ্যাটা পছন্দ হলো র‍্যালফের। সায় দিয়ে বলল, 'আমি আপনাকে সাহায্য করব, মি. বিলি।'

'ধন্যবাদ, র‍্যালফ।'

তীরে এসে থামল ক্যানো। সিধে হলো র‍্যালফ, লাফিয়ে তীরে নামবে। ঠিক তখন বিস্ফোরিত হলো ঝোপ, দু'জন লোক এসে দাঁড়াল সামনে–রিডলার আর হোলার। যেন এটা খুব মজার একটা ব্যাপার এভাবে হেসে উঠল বিলি। কিন্তু অন্যেরা মোটেও মজা পেল না। বিস্ফারিত চোখে তারা দেখল রিডলারের হাতের বন্দুকটার নীলচে ইস্পাতের ব্যারেল ওদের দিকে হিমশীতল দৃষ্টিতে চেয়ে আছে!

আট

বন্দুক কক্ করার শব্দ বিস্ফোরণের মত বাজল কানে, রিডলার ইঙ্গিত করল, 'নৌকা থেকে নাম সবাই।'

লরা ছাড়া বাকিরা অনিচ্ছাসত্ত্বেও নেমে এল ক্যানো থেকে। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে আছে মেয়েটা, চোখ দিয়ে আগুন ঝরছে, 'তোমাকে দেখেই আমার সন্দেহ হয়েছিল তুমি একটা বিশ্বাসঘাতক!' দাঁতে দাঁত পিষে বলল সে।

ওর রাগ স্পর্শই করল না বিলি বিগসকে। সে খ্যাক খ্যাক করে হাসতে

থাকল। লম্বা পা ফেলে ক্যানোর সামনে চলে এল রিডলার, লরার বুকে বন্দুক ধরল। চোখে খুনের নেশা। এই মেয়েটা তাকে নদীতে লাফিয়ে পড়তে বাধ্য করেছিল! 'এবার মিস অহংকারী বীরাঙ্গণা!' বিদ্রূপের গলায় বলল সে। 'এখন আমার অর্ডার করার পালা।' নিচু গলায় হাসল সে। নোংরা হাসি। গায়ের রোম দাঁড়িয়ে গেল লরার। 'নৌকা থেকে নেমে পড়ুন। আপনি নৌকাটাকে অপবিত্র করে ফেলছেন।'

জেদী ভঙ্গিতে লরা আগের জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল। রিডলার ওর হাত ধরে সজোরে ঝাঁকুনি দিল। 'লাফাও, মেয়ে, লাফাও!' কিন্তু একচুল নড়ল না লরা। আবারও ওকে ধরে নাড়া দিল সে। 'লাফাতে বলি কানে যায় না?'

ইচ্ছের বিরুদ্ধে লরা পা বাড়াল। ওর পা মাটি ছুঁয়েছে কি ছোঁয়নি, রিডলার পেছন থেকে ধাক্কা দিল। ছিটকে পড়ে গেল লরা। আর্তনাদ করে উঠল র‍্যালফ। ডাক্তার ছুটে গেলেন লরার কাছে, ওকে হাত ধরে মাটি থেকে উঠতে সাহায্য করলেন। কিন্তু রিডলার ওদের দিকে ফিরেও দেখল না। তার এখন একমাত্র আগ্রহ র‍্যালফ···এবং ম্যাপ।

ছেলেটার মুখোমুখি হলো সে। 'আমাদের অনেক ভুগিয়েছ, ছোকরা। কিন্তু এখন সব চাতুরী খতম, বোঝা গেছে?' র‍্যালফের দুই ভুরুর মাঝখানে বন্দুক তাক করল সে। র‍্যালফ চোখ পিটপিট করল। 'তোমার ম্যাপটা আমাকে দাও।' বলল রিডলার।

'ওটা আমি হারিয়ে ফেলেছি। কিন্তু গুপ্তধন কোথায় আছে তা জানি। টিমবাকতু, দক্ষিণের একদম শেষে···'

কথা শেষ হওয়ার আগেই মুখে প্রচণ্ড থাবড়া খেল র‍্যালফ, ডিগবাজি খেয়ে পড়ে গেল মাটিতে।

প্রতিবাদ করলেন ডাক্তার, 'অতটুকুন বাচ্চা ছেলেটাকে মারলেন!'

ঠাণ্ডা গলায় রিডলার বলল, 'আমি ওই ম্যাপ চাই।'

রিডলারের নিষ্ঠুরতায় ভয় পেলেও লরা কথা না বলে পারল না। 'ও সত্যি কথাই বলছে। ম্যাপটা সে নদীতে হারিয়ে ফেলেছে।'

রিডলার র‍্যালফের দিকে তাকাল। উঠে বসেছে র‍্যালফ, গাল ঘষছে। 'তা হলে তোমরা সবাই এখানে কী করতে এসেছ?' প্রত্যেককে কঠিন চোখে পর্যবেক্ষণ করল সে। 'ও জানে সোনা কোথায়।' র‍্যালফের চাঁদিতে বন্দুকের মাজল ঠেসে ধরল রিডলার। জমে গেল র‍্যালফ। রিডলার শুধু শুধু হুমকি দিচ্ছে না।

'কথা বলো,' হিসহিস করে উঠল রিডলার, '···নইলে কিন্তু নরকে

পাঠাব।'

আতঙ্কে গা ঠাণ্ডা হয়ে গেল লরার। 'ও যা বলছে তা করবে, র‍্যালফ। তুমি যা জানো সব ওকে বলে দাও।'

'কোথায় ওটা?' আবার জিজ্ঞেস করল রিডলার। মেজাজ খাপ্পা হয়ে যাচ্ছে তার। অনেক কষ্টে এতক্ষণ ধৈর্য ধরেছিল।

র‍্যালফ কিশোরের চোখে চাইল। দু'জনেরই তাদের শপথের কথা মনে পড়ছে। প্রতিজ্ঞা করেছিল কাউকে বলবে না। 'আমি জানি না,' বিড়বিড় করে বলল সে।

পিস্তল কক করল রিডলার। 'না!' চিৎকার করে উঠল লরা।

বাধা দিলেন ডা. পিলম্যান। 'আমার কাছে একটা ম্যাপ আছে।' রাগ গোপন করে বললেন তিনি। বিস্মিত চোখে রিডলার ডাক্তারের দিকে তাকাল, কিন্তু কথাটা তার ঠিক বিশ্বাস হলো না।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ডাক্তার তাঁর রুমাল বের করলেন পকেট থেকে। খুলতেই জীর্ণ একটা মানচিত্র বেরিয়ে পড়ল। এটা সেই নকলটা। র‍্যালফের কাছ থেকে নিয়ে নিজের কাছে রেখে দিয়েছিলেন তিনি। 'উল্টোপাল্টা স্মৃতি হাতড়ানোর চেয়ে ম্যাপ দেখা অনেক সহজ কাজ।' বললেন তিনি।

লরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল একটা। 'থ্যাংকস গড!'

চারকোনা লিনেনের কাপড়টা ছিনিয়ে নিল স্প্যাঙ্গলার। হোলার যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ল তার পার্টনারের ওপর। রিডলার উত্তেজিত হয়ে উঠল আঁকিবুঁকিগুলো দেখতে দেখতে। 'হোয়াইট ওয়াটার কোঙ! হা! মেটকাম্ব কী, এই তো! এই যে গাছগুলো।' সন্তুষ্ট মনে হলো তাকে। 'পেয়েছি! আমি গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছি।' নিজের লোকদের দিকে ঘুরল সে। 'ঠিক আছে, বন্ধুরা। নৌকা রেডি করো। ওদেরটা এবং আমাদেরটা।'

আতঙ্ক বোধ করল লরা। 'আপনি কি আমাদের ফেলে চলে যাচ্ছেন?'

রিডলার বিদ্রূপের ভঙ্গিতে 'বাউ' করল। 'দুঃখিত, ম্যাডাম। কিন্তু আপনাদের নৌকাটা রেখে গেলে আপনারা আ্যার পালাবেন।'

হোলার অশ্লীল হাসল, ওর মুখ নয় যেন শয়তানের মুখোশ। 'তবে আপনাকে না খেয়ে মরতে হবে না, ভদ্রমহোদয়া।' বলল সে। 'তার আগেই মশককুল আপনাকে খেয়ে ফেলবে।'

রিডলারের লোকেরা দুটো নৌকায় ভাগাভাগি করে উঠে পড়ল। বিলি ডাক্তারকে পাশ কাটানোর সময় তাঁর বিভার হ্যাটটা তুলে নিল মাথা থেকে, নিজের মাথায় পরল। 'মাপ করবেন, ডাক্তার সাহেব। তবে আমার ধারণা

এটার আর আপনার প্রয়োজন হবে না, কী বলেন?'

নীরবে, তীব্র হতাশা আর বিপুল বিতৃষ্ণা নিয়ে র‍্যালফ, কিশোর আর লরা এবং ডা. পিলম্যান দেখল লোকগুলো চলে যাচ্ছে দৃষ্টি সীমার বাইরে। কী আর করা ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালেন ডাক্তার, তারপর ঘুরে দাঁড়ালেন।

দ্রুত সন্ধ্যা নামছে জঙ্গলে। একটা ভোঁদর উঁকি দিল আঙ্গুর-লতার ফাঁক দিয়ে। গর্ত দিয়ে সুড়ুৎ করে বেরিয়ে এল একটা খরগোশ। রাত আসছে, আগুন জ্বালবার প্রয়োজন অনুভব করলেন ডা. পিলম্যান। সবাই মিলে শুকনো পাতা, খড় কুটো জড়ো করতে লাগলেন।

দিনের শেষ আলোটুকু দ্রুত ফুরিয়ে যেতে শুরু করল। আকাশের রঙ জাফরান হলুদ। হঠাৎ শব্দটা শুনল সবাই। যেন একটা প্লেন আসছে দূর থেকে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে কালো হয়ে গেল আকাশ, মশার বিশাল একটা ঝাঁক আক্রমণ করল ওদের। হুল বসাতে শুরু করল শরীরের উন্মুক্ত জায়গাগুলোতে।

যেন আগুন ধরে গেল শরীরে। আর্তনাদ করতে করতে গা খামচাতে শুরু করল লরা। বিরাট আকৃতির মশাগুলো সংখ্যায় বেড়েই চলেছে। বাতাসে একটানা বিন বিন শব্দটা প্রচণ্ড জোরাল। ডা. পিলম্যান ইতিমধ্যে খড়কুটোতে আগুন জ্বালিয়েছেন, তালপাতা দিয়ে বাতাস করছেন, ক্রমশ ধোঁয়া উঠছে ওপর দিকে। কিন্তু কোন কাজ হচ্ছে না। লাখ লাখ মশা–আরও আসছে! এ যেন অসম একটা যুদ্ধ। লরা শুয়ে পড়েছে মাটিতে, মাথার ওপর টেনে দিয়েছে জ্যাকেট। র‍্যালফ আর কিশোর মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে, চোখের পাতা শক্ত করে বন্ধ রেখেছে, অন্ধের মত বাতাসে চাপড় মারছে।

অগ্নিকুণ্ডের দিকে ছুটে গেল লরা, কতগুলো শুকনো পাতা ফেলল, দাউদাউ জ্বলে উঠল আগুন। 'সাবধান...শ্বাস বন্ধ হয়ে মরো না যেন!' মুখে আর হাতে ঠাসঠাস চাপড় দিতে দিতে বললেন ডাক্তার।

কিশোর আর র‍্যালফ যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে। শরীরের খোলা মাংসে, যেখানে সুযোগ পাচ্ছে খুদে শয়তানগুলো বিষ ঢুকিয়ে দিচ্ছে। মশা মারতে মারতে হাত লাল হয়ে গেল ডা. পিলম্যানের কিন্তু একটা মারলে সে জায়গায় দশটা এসে হাজির হচ্ছে। এর যেন শেষ নেই, আর ওদের গুঞ্জনধ্বনি ক্রমশ বেড়েই চলেছে।

কামড় খেয়ে যেন পাগল হয়ে গেল লরা। চিৎকার করতে করতে সে আগুনের কাছ থেকে অপেক্ষাকৃত ফাঁকা জায়গাটা লক্ষ্য করে দৌড় দিল।

'আরে, আরে করছ কী?' ওর পিছু পিছু দৌড়ালেন ডাক্তার, পেছন থেকে টেনে ধরলেন। 'না! না! ওখানে গেলে তোমার সর্বনাশ হবে। ওগুলো তোমার নাকে মুখে ঢুকে যাবে। শ্বাস বন্ধ হয়ে মারা যাবে তো!' ডাক্তার তাঁর কোট খুলে ঢেকে দিলেন লরাকে। 'এখানেই থাকো...এ জায়গাটা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ।' লরা গুঙিয়ে উঠে চিৎ হয়ে পড়ে গেল মাটিতে। আর নড়ল না।

মশার অসহ্য গুনগুনানির গুঞ্জন ছাড়িয়ে দূর থেকে হঠাৎ গুরুগম্ভীর একটা শব্দ ভেসে এল। রাতের আকাশের ঘন কালো মেঘের বুকে ঝলসে উঠল সোনালী আলো। শুরু হলো বৃষ্টি...প্রথমে ফোঁটা ফোঁটা, তারপর মুষলধারে। বৃষ্টির কণাগুলো ক্ষুরের মত ধারাল, যেন কেটে যেতে চায় চামড়া। কিন্তু এই অঝোর বর্ষণ স্বর্গের শান্তি নিয়ে এল। বৃষ্টির তীব্র ছাঁটে টিকতে পারল না রক্তপিপাসু শয়তানগুলো, ধুয়ে সাফ হয়ে গেল। ঠাণ্ডা পানির ছোঁয়ায় কামড়ের যন্ত্রণা অনেকটাই দূর হয়ে গেল।

র‍্যালফ মুখ আকাশের দিকে তুলে বৃষ্টির স্পর্শ নিচ্ছে। 'ওগুলো কি মরবে?' জিজ্ঞেস করল সে।

'কিছু মরবে,' জবাব দিলেন ডাক্তার, '...কিন্তু বৃষ্টি থামলেই আবার ফিরে আসবে। কিন্তু তখন আর কোন উপায় থাকবে না। কারণ আগুন জ্বালবার মত কিছুই আমাদের কাছে নেই।'

'আরে, ওটা কীসের শব্দ?' কান পেতে কী যেন শোনার চেষ্টা করল কিশোর।

'কীসের আবার? বৃষ্টির!' বলল লরা। জ্ঞান ফিরেছে তার। ভাল লাগছে জলধারায় সিক্ত হতে!

কিন্তু সন্দেহ দূর হলো না কিশোরের। 'কিন্তু শব্দটা যেন অন্যরকম!'

এবার অন্যরাও কান পাতল। বৃষ্টির ঝমঝম শব্দের মধ্যেও একটা পুরুষ কণ্ঠ স্পষ্ট শুনতে পেল ওরা। লোকটা সম্ভবত এদিকেই আসছে। ওরা সামনের দিকে ছুটে গেল, অন্ধকারে চোখ ফেলল, দেখার চেষ্টা করছে কে আসে।

'শুনতে পাচ্ছি আমি,' চেঁচিয়ে উঠল র‍্যাফেল। 'লোকটা মনে হয় গান গাইছে!' সবাই যেন একটু ক্ষীণ আশার আলো দেখতে পেল।

লোকটি আর কেউ নয়, জিমি রজারস। ক্যানো চালাতে চালাতে উঁচু গলায় গান গাইছে সে। তার সঙ্গী সেই সেমিনোল ইন্ডিয়ান। লোকটার কাঁধে সেই বানরটা। বৃষ্টির বেগ এত বেশি যে চোখ খুলে রাখাই দায়। চোখ

পিটপিট করতে করতে জিমি ইন্ডিয়ানটাকে বলল, 'আমরা যে কাছেপিঠে আছি সেটা জানান না দিলে অন্যেরা কী করে বুঝবে। এসো, একসঙ্গে গান ধরি।' এবার দু'জনে মিলে আরেকটা গান গাইতে শুরু করল গলা ফাটিয়ে।

'বাঁচাও…বাঁচাও…বাঁচাও,' দূর থেকে অস্পষ্ট চিৎকারটা ভেসে এল। কিন্তু শুনতে পেল না জিমি। সে একভাবে গেয়েই যাচ্ছে।

'শ্‌শ্‌শ্‌শ্‌…' কান খাড়া করল সেমিনোল।

'বাঁচাও…বাঁচাও!' এবার চিৎকারটা শুনতে পেল জিমি। তীরের দিকে এগোতে শুরু করল ওরা।

নদী তীরে ডা. পিলম্যান বার বার পা বদল করছেন, অধৈর্য হয়ে উঠেছেন। চিৎকার করতে করতে গলা ভেঙে গেছে তাঁর। 'আমাদের কথা শুনতে পাচ্ছেন?' আবারও চেঁচালেন তিনি। 'আমাদের বাঁচান!'

'বাঁচান…আমাদের বাঁচান,' গলা ফাটাল লরা।

ক্যানোটা ক্রমশ কাছিয়ে আসছে, পৃথিবী আলো করে বিদ্যুৎ চমকাল। তীরে দাঁড়ানো লোকগুলোকে পাগলের মত হাত নাড়তে দেখল জিমি। 'হেই!' হাঁক ছাড়ল সে।

'জিমি!' লরা সঙ্গে সঙ্গে চিনে ফেলল জিমির গলা। স্বস্তির একটা আরামদায়ক স্রোত যেন ছড়িয়ে পড়ল শিরায় শিরায়। মনে হলো আনন্দে কেঁদে ফেলবে।

'জিমি চাচা! তুমি…তুমি…' উত্তেজনায় তোতলাতে শুরু করল র‍্যালফ।

ক্যানোটা তীরে এসে ঠেকল, জিমি লাফিয়ে নামল মাটিতে। 'হ্যাঁ, আমি।' হাসিতে উদ্ভাসিত তার মুখ, জড়িয়ে ধরল র‍্যালফকে। 'আবার আমরা একত্র হলাম, তাই না?'

মিলনের উচ্ছ্বাস একটু কমলে জিমি জিজ্ঞেস করল, 'মনে হচ্ছে বড় ধরনের সমস্যায় পড়েছ। বিলি বিগস কোথায়?'

ডা. পিলম্যান হাত মেলে বললেন, 'আমাদের এখানে ফেলে চলে গেছে শয়তানটা। ও রিডলারের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে।'

'রিডলার?' জানতে চাইল জিমি।

'হ্যাঁ,' বললেন ডাক্তার।

'এখানেও!' অবাক হলো জিমি।

'গুপ্তধনের সন্ধানে গেছে,' বলল র‍্যালফ। মন খারাপ হয়ে গেছে ওর। 'ওরা এখন জানে ওটা কোথায়।'

'কতক্ষণ আগে গেছে?' সিরিয়াস সুরে জানতে চাইল জিমি।

'এই তো বিকেলের দিকে,' বলল কিশোর।

'আচ্ছা! তা হলে হয়তো ওদের ধরতে পারব।' পরাজয় মেনে নিতে রাজি নয় জিমি। বিশেষ করে শয়তান রিডলারটা যখন আছে।

'অঅঅ,' বিড়বিড় করলেন ডাক্তার। ভেবেছিলেন এই ঝামেলায় তাঁকে আর থাকতে হবে না। কিন্তু সভ্য সমাজে এত দ্রুত ফিরে যাওয়া তাঁর কপালে নেই বোঝাই যাচ্ছে।

লরা ক্রুদ্ধ গলায় বলল, 'ওরা আমাদের এখানে ফেলে রেখে গেল। তারপর...এখানকার রাক্ষুসে মশাগুলো আমাদের প্রায় জ্যান্ত খেয়ে ফেলার জোগাড় করেছিল। আর আপনারা তারপরও ওই সর্বনাশা সোনার পিছে ছুটছেন।'

জিমি নরম চোখে লরার দিকে চাইল। ওর গালে লেপ্টে আছে চুল, আগুন ঝরছে চোখে। 'রাগলে কিন্তু আপনাকে আরও সুন্দর লাগে।' হাসল সে।

প্রশংসা গায়ে মাখল না লরা। বলে চলল, 'আপনার কোন খবর না পেয়ে আমরা তো চিন্তায় মরি। ভেবেছিলাম হয়তো কোন সেলুনে...মদ খেয়ে মরে পড়ে আছেন। আপনি যখন বেঁচেই ছিলেন তা হলে কেন...কেন ওই ভয়ঙ্কর লোকটার বোটে আমাদের উঠতে বলেছিলেন?' লরার চোখে রিডলারের নিষ্ঠুর চেহারাটা ভেসে উঠল। স্টিমবোট চুরি করার আইডিয়াটা জিমিরই ছিল। সে রেগে আরও কী যেন বলার জন্য জিমির দিকে এগুতেই যেন অদৃশ্য দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এল। নাক কুঁচকে বলল, 'কী বোটকা গন্ধ!'

হেসে উঠল জিমি। 'ওষুধের গন্ধ। মশা তাড়াবার মহৌষধ। তবে মিস, কথাটা আবারও না বলে পারছি না, রেগে গেলে সত্যি আপনাকে অপূর্ব লাগে। সত্যি বলতে কী যেদিন প্রথম আপনাকে দেখলাম সেদিনই কথাটা বলতে ইচ্ছে করেছিল। কিন্তু গলায় ফাঁসির রজ্জু ঝোলানো অবস্থায়...বুঝতেই পারছেন...' কাঁধ ঝাঁকাল সে।

হেসে ফেলল লরা, যেন সকল নিষ্পাপ সৌন্দর্য নিয়ে ফুটে উঠল ফুল। জিমি এগিয়ে গেল ওর দিকে, জড়িয়ে ধরল। ওর চওড়া বুকে মাথা রাখল লরা, অনুভব করল নিরাপত্তাহীনতার ভয় দূর হয়ে গেছে মন থেকে, বিশ্বাস আর ভালবাসায় কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে অন্তর।

র‍্যালফরা ক্যানোতে উঠে বসেছে অনেক আগেই। তবে সেমিনোল ইন্ডিয়ানের সঙ্গে নিরাপদ দূরত্ব রেখে। ইন্ডিয়ানটা ওদের প্রত্যেককে ঠাণ্ডা

চোখে জরিপ করছিল। ডা. পিলম্যান তীরের দিকে তাকাতেই জিম আর লরাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় আবিষ্কার করলেন। প্রথম দর্শনে প্রেমের ব্যাপারটা তা হলে অতিরঞ্জন নয়, অ্যাঁ? মনে মনে হাসলেন তিনি। 'তোমরা সবাই রেডি তো?' ওদের দু'জনকে শুনিয়ে বললেন তিনি। জিমি আর লরা দ্রুত নিজেদেরকে ছাড়িয়ে নৌকায় এসে বসল। আবার যাত্রা হলো শুরু।

সারারাত নৌকা চলল। ভোর হলো, বিষণ্ন মেঘের আড়ালে হেসে উঠল সূর্য। ঘাসের ওপর ঝিলমিল রূপ নিয়ে উদ্ভাসিত হলো শিশির কণা। আলোক রশ্মি খেলা করতে লাগল জলার পানিতে, ঝুলে থাকা গাছের পাতায় বাতাস জাগাল শিহরণ। তালগাছে ঘেরা ছোট ছোট দ্বীপ ভেসে উঠল চোখের সামনে, যেন খুদে মরুদ্যান, জঙ্গুলে পরিবেশে রহস্যময় এবং বিষণ্ন লাগল। মাঝে মাঝে জলের ওপর লাফ দিল মাছ, ভোঁতা 'প্লপ' শব্দ করে আবার ডুবে গেল। গাছের সারির প্রায় মাথা ছুঁয়ে উড়াল দিল নাম না জানা পাখির ঝাঁক। সারারাত অক্লান্ত নৌকা চালাল দুঃসাহসী দলটা। গুপ্তধন পেতে হলে দুষ্ট রিডলারের আগেই তাদের আসল জায়গায় পৌঁছুতে হবে।

জিমি কী করে টাম্পা থেকে পালিয়ে এসেছে সেই গল্প শোনাচ্ছিল ওদের। 'আমি ঝোপঝাড়ের মধ্যে লুকিয়ে ছিলাম। তারপর হঠাৎ আমার এই পুরানো বন্ধু বিগ বিয়ারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।' হাসল সে লম্বা, চুপচাপ লোকটির দিকে চেয়ে। 'তারপর আমি আর বিগ বিয়ার রিডলার যে পথে গেছে সেই পথ ধরে যাত্রা শুরু করলাম।'

বাধা দিল লরা। 'ওগুলো কী?' ভয়ে কেঁপে গেল তার গলা।

গাছপালার ফাঁক দিয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে বড় এবং বীভৎস কতগুলো মুখ। মুখগুলোয় উজ্জ্বল রঙের মুখোশ, হিংস্র ভঙ্গিতে বেরিয়ে আছে দাঁত। গোটা তীর জুড়ে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে মুখোশধারীরা। বিগ বিয়ার ওদের দিকে এক পলক তাকিয়ে সংক্ষেপে বলল:

'কুগার!'

'কুগার?' প্রশ্ন করল র‍্যালফ।

'ইন্ডিয়ান উপজাতি,' বলল জিমি। 'সেমিনোলদের একটা গোত্র।' জিজ্ঞেস করল সে বিগ বিয়ারকে। 'ওরা কি বন্ধু বৎসল?'

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল সেমিনোল। 'কুগাররা কারও বন্ধু নয়। খারাপ! খারাপ!'

'ওরা আমাদের দেখতে পেয়েছে?' সাবধানে জানতে চাইলেন ডা. পিলম্যান। এইসব দুঃস্বপ্নের শেষ কবে হবে, ভাবলেন তিনি মনে মনে।

'ওরা অনেক আগেই আমাদের দেখেছে।' বলল বিগ বিয়ার।

'আমরা ওদের আগে দেখতে পাইনি কেন?'

'ওরা দেখা না দিলে ওদের কেউ দেখতে পায় না।' বলল জিমি।

আর কোন কথা না বলে সবাই বৈঠা বাইতে শুরু করল। মুখোশধারী ভয়ঙ্কর মুখগুলো অপলক ওদের দিকে তাকিয়ে রইল। যতই সামনে এগুচ্ছে ওরা, জঙ্গল যেন ততই ঘন হয়ে উঠছে। হঠাৎ ওদের বিস্মিত করে মাথার ওপর থেকে উধাও হয়ে গেল সূর্য, বিরাট, কালো মেঘ টুপ করে গিলে ফেলল উজ্জ্বল, স্বর্ণাভ গোল বলটাকে। ঝপ করে আঁধার হয়ে গেল চারদিক। সীমাহীন জঙ্গল, সবুজ গাছের সমুদ্র যেন অকস্মাৎ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করল। কেউ জানে না কেন, সাঙ্ঘাতিক কিছু একটা ঘটার আশঙ্কায় বুক শুকিয়ে গেল সবার। নীলচে কালো মেঘের সারি হু হু করে নেমে এল নীচে। তীব্র, অসহনীয় একটা নীরবতা গ্রাস করল প্রকৃতি। ঘন হয়ে এল অন্ধকার, আকাশে ঝিলিক দিল সোনালী সাপের চেরা জিভ। জিমি আর বিগ বিয়ার আবহাওয়ার এই হঠাৎ পরিবর্তনে ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।

হঠাৎই, যেন ছুটে এল এক ঝাঁক বুলেট, কোয়েল পাখিদের একটা দল বিস্ফোরিত হলো একটা ঝোপ থেকে, উড়ে গেল শূন্যে। একই সঙ্গে যেন পাগল হয়ে গেল সাদা রঙের এবি পাখিগুলো। বিশাল ডানা মেলে কোয়েলদের অনুসরণ করল তারা। ফ্লেমিংগোগুলো সাঁতার বন্ধ করে পাখা মেলল আকাশে। পানির ইঁদুরগুলো প্রাণপণে এগিয়ে চলল তীরের দিকে, অদৃশ্য হয়ে গেল একটা গর্তে। প্রত্যেকটা পাখি আর প্রাণীর আচরণ অদ্ভুত, যেন কোন কিছুকে প্রচণ্ড ভয় পাচ্ছে ওরা। ক্যানোটা শান্ত জলাশয়ে মসৃণ গতিতে এগিয়ে চলল। তবে বিস্মিত হয়ে সবাই লক্ষ করল হঠাৎ করেই বাতাস যেন স্থির হয়ে গেছে।

'কী ভাবছ, বন্ধু?' থাকতে না পেরে জিজ্ঞেস করল জিমি।

ভয়ে কেঁপে গেল ইন্ডিয়ানটার গলা। 'উরিকান!'

'হারিকেন?' প্রতিধ্বনি তুললেন ডা. পিলম্যান। শিউরে উঠলেন তিনি। ওহ্, সহ্যের একটা সীমা আছে!

'এখানেই থামো! ভাল!' পরামর্শ দিল সেমিনোল।

'এখানে থামব কেন?' ভয় আর কৌতূহল নিয়ে জানতে চাইল র‍্যালফ।

জিমি ব্যাখ্যা করল, খোলা সাগর সৈকতে হারিকেনের তীব্রতা কম।

ভয় গ্রাস করল লরাকে। আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে ও…একটার পর একটা দুর্যোগ আসছেই। ভয় মিশ্রিত মুগ্ধতা নিয়ে সে আকাশ আর জলের

রঙের পরিবর্তন লক্ষ করছে।

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল কিশোর, 'কিন্তু রিডলার তো থামবে না!'

'কিন্তু আমরা ঝড়ের কবলে পড়ে জলে ডুবে মরলে তো কোন লাভ হবে না তাই না, কিশোর?' দার্শনিক ভঙ্গিতে বললেন ডা. পিলম্যান।

'চারদিক এত শান্ত!' ফিসফিস করে বলল লরা। একটা পাতাও নড়ছে না।

ঘোঁত ঘোঁত করল সেমিনোল। 'বিগ বিয়ার ভুল বলে না। পাখিরা ভুল বলে না।'

'আমরা গন্তব্যে প্রায় চলে এসেছি, তাই না?' বলল কিশোর। মাথা ঝাঁকাল জিমি। 'ভাগ্য ভাল থাকলে এ যাত্রা বেঁচে যেতেও পারি। এখন সবাই জোরসে বৈঠা মারো।'

সায় দিল বাকিরা। একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল বৈঠার ওপর। বাইতে শুরু করল সর্বশক্তি দিয়ে। এখন শুধু রিডলার নয়, বিধ্বংসী সামুদ্রিক ঝড়ের বিরুদ্ধেও তাদের লড়তে হবে!

নয়

অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। যত তাড়াতাড়ি গন্তব্যে পৌঁছা যায় সেই চেষ্টাই সবার। হঠাৎ বাতাস উঠল, অন্ধকারের একটা পর্দা দ্রুত ওদেরকে ঢেকে ফেলল। শুরু হলো বৃষ্টি। নদীতীর যেন ভাসিয়ে নিয়ে চলল বৃষ্টির প্রবল ধারা, একটানা ঝমঝম শব্দটা যেন ধ্বংসের অশুভ সঙ্কেত। তীব্র বাতাসে গাছের ডালগুলো মটমট করে ভেঙে গেল, কোথায় উড়ে গেল তার হদিস করতে পারল না কেউ। রক্তবর্ণ মেঘ পাগলা ঘোড়ার মত ছুটে বেড়াচ্ছে গোটা আকাশ জুড়ে।

নলখাগড়ার ঝোপের আড়ালে লুকানো ভয়ঙ্করদর্শন মুখোশধারী দুই ইন্ডিয়ান জিমিদের নৌকার ওপর অনেক আগে থেকে চোখ রেখে চলছিল। মাইলের পর মাইল নিঃশব্দে ওরা অনুসরণ করেছে নৌকাটাকে। কিন্তু আকস্মিক ঝড়ে দিশেহারা বোধ করল তারা, আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটে গেল অন্য দিকে। জিমিদের নৌকাটাকে বিরাট ঢেউগুলো ইচ্ছেমত নাচাচ্ছে, ওরা সামাল দিতে পারছে না। একবার প্রচণ্ড বাতাসের ধাক্কায় আরেকটু হলে

উল্টে যাচ্ছিল নৌকা। কোনমতে সামাল দিল ওরা।

জিমি ডাক্তার আর সেমিনোল ইন্ডিয়ানকে ইশারা করল তীরের দিকে বৈঠা বাইতে। যেন ধাক্কা দিয়ে বাতাস ওদের তীরে পৌছে দিল, ক্যানোটা মুখ থুবড়ে পড়ল বালুকাবেলায়। হঠাৎ, যেন ওদের সাহায্য করতেই আলোকিত হয়ে উঠল আকাশ। অবাক হয়ে ওরা দেখল বাতাস ওদের মেটকাম্বের সৈকতে টেনে এনেছে! তীরের গাছপালাগুলোর অস্বাভাবিক আকৃতি দেখেই ডা. পিলম্যান জায়গাটা চিনতে পারলেন।

জিমিও ডাক্তারের সঙ্গে একমত হলো। 'ওই সেই গাছগুলো!' চিৎকার করে বলল সে। উত্তেজনায় ঝড়, বিপদ সব যেন ভুলে গেছে। 'সবাই একসঙ্গে থাকো।' সাবধান করল সে।

ওরা মাত্র এগুতে শুরু করেছে এইসময় বিরাট উঁচু একটা ঢেউ আছড়ে পড়ল গায়ের ওপর, লম্বা, ভারী একটা ডাল যেন উড়ে এল শূন্য থেকে, বিগ বিয়ারকে আঘাত হানল। দড়াম করে পড়ে গেল সে।

'বিগ!' আর্তনাদ করে উঠল লরা।

'বিগ, তুমি ঠিক আছ তো?' বাতাসের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে এগোতে চেষ্টা করল জিমি।

দৌড়ে এলেন ডা. পিলম্যান। 'ডালটা সরান,' বলল জিমি। ভারী জিনিসটাকে বিগ বিয়ারের গায়ের ওপর থেকে সরাতে চেষ্টা করল।

সকলের অমানুষিক চেষ্টার পর ডালটার নীচ থেকে ওকে টেনে বের করা সম্ভব হলো।

তীব্র বাতাস লরাকে মাটিতে প্রায় ফেলে দিচ্ছে এই সময় হাত বাড়াল জিমি, 'আমাকে ধরো,' বলল সে। ওকে জড়িয়ে ধরে সাগর তীর থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেল জিমি।

নৌকা থেকে নামার সময় কয়েকটা বেলচা নিয়ে এসেছে জিমি, চিৎকার করে বলল, 'মাটি খুঁড়তে শুরু করো সবাই।'

ডাক্তার, র‍্যালফ আর কিশোর অদ্ভুত আকৃতির গাছগুলোর নীচে পজিশন নিল, শুরু করবে কাজ। ওদের পিঠে প্রচণ্ড জোরে বৃষ্টি পড়ছে, বাতাসের গর্জন আর বজ্রপাতের শব্দ ক্রমশ বেড়েই চলল। আকাশ সাদা করে ঝিলিক দিল বিদ্যুৎ, মুহূর্তের জন্য আলোয় ভেসে গেল সাগর সৈকত। মাটি খুঁড়তে শুরু করল ওরা। কিছুক্ষণ খোঁড়ার পর হাতে কী যেন ঠেকল র‍্যালফের, সে ওটা খামচে ধরেছে, এই সময় পাহাড় সমান একটা ঢেউ আছড়ে পড়ল ওর গায়ে। স্রোতটা ওকে টান দিল, ভাসিয়ে নিতে চাইল,

কিন্তু হাতের জিনিসটা শক্ত মুঠিতে চেপে ধরে থাকল র‍্যালফ। ঢেউর তোড় কমতেই র‍্যালফ টের পেল সে আসলে একটা ভারী লোহার চেইন ধরে আছে। 'জিমি চাচা!' চেঁচাল সে।

আবার ঢেউর আরেকটা পাহাড়, আগেরটার চেয়ে অনেক বড়, ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদের ওপর। হাঁপিয়ে উঠল কিশোর, পানির তোড়ে শ্বাস নিতে পারছে না। কোন মতে ক্রল করে এগিয়ে এল বন্ধুর দিকে। 'র‍্যালফ, র‍্যালফ! আমি ভাবলাম ঢেউয়ের টানে তুমি বোধহয় ভেসে গেছ!' জোরে বললেও ঝড়ো বাতাসে ওর কথাগুলো অস্পষ্ট শোনাল।

'দেখো!' উত্তেজিত হয়ে উঠেছে র‍্যালফ। 'দেখো!' ডুবে মরছে সেদিকে খেয়াল নেই, তার সব আগ্রহ হাতের চেইনটার প্রতি।

'জিমি চাচাকে ডাকো!' গলার রগ ফাটাল সে।

'জিমি চাচা…জিমি চাচা!' ফুসফুসের সমস্ত শক্তি জড়ো করে জিমি রজারসকে ডাকতে শুরু করল দুই বন্ধু।

দাঁতে দাঁত চেপে বালু মাটি খুঁড়ে চলেছে জিমি। মেটকাম্বের সৈকতে যদি সত্যি গুপ্তধন থাকে, তা হলে প্রবল ঝড় আর ঢেউ ওটাকে চিরদিনের জন্য সাগরে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে। কিশোর র‍্যালফের কাছ থেকে সরে এল, হাত আর হাঁটুর সাহায্যে ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগোল জিমির দিকে। উড়ে যাওয়ার ভয়ে জিমির হাঁটু খামচে ধরল সে, কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, 'জিমি চাচা! র‍্যালফের কাছে চলেন। ও কী যেন খুঁজে পেয়েছে।'

র‍্যালফের কাছে ফিরে আসতে ভয়ানক কসরৎ করতে হলো ওদেরকে। তারপর তিনজনে মিলে নতুন উৎসাহে খুঁড়তে শুরু করল। হঠাৎ জিমের বেলচা ধাতব কীসে যেন ঠং করে বাড়ি খেলো। আরও দ্রুত বেলচা চালাল সে। আরেকটা বিশাল আকৃতির ঢেউ ওদের খানিকক্ষণ নাকানিচোবানি খাওয়াবার পর জিনিসটাকে দেখতে পেল ওরা। বড় একটা সিন্দুক। নাবিকদের কাছে এ ধরনের সিন্দুক থাকে। 'হুররে! পেয়ে গেছি আসল জিনিস!' উল্লসিত হয়ে উঠল জিমি। আরেকটা ঢেউ এসে অনেকখানি মাটি ধুয়ে নিল। সিন্দুকটার আকৃতি আগের চেয়ে স্পষ্ট হলো। বিগ বিয়ার এসে এবার ওদেরকে সাহায্য করল।

'এটাই সেটা, তাই না?' বাতাস ছাপিয়ে র‍্যালফের উত্তেজিত গলা শোনা গেল।

'ইয়াহ্ হ্ হ্ হ্' আরও জোরে চেঁচাল জিমি।

লরা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখান থেকে সে এতক্ষণ ওদের লক্ষ

করছিল। দেখল ওরা কালো, চৌকোমত কী একটা জিনিস টেনে তুলল গর্ত থেকে। সঙ্গে সঙ্গে শিহরণ খেলে গেল শরীরে। ওরা নিশ্চয়ই গুপ্তধন পেয়েছে।

প্রবল বৃষ্টির অত্যাচার, ভয় ধরানো বাতাসের গর্জন, আর কোমর পানিতে দাঁড়িয়ে সকল প্রতিকূলতাকে সহ্য করেও হাসি ফুটল তার মুখে। অবশেষে ওদের সমস্ত কষ্ট আর পরিশ্রম সার্থক হলো।

ডা. পিলম্যান র‍্যালফদের দিকে আসছিলেন। বাতাসের তীব্র একটা ঝটকা হঠাৎ একটা গাছ উপড়ে ফেলল, দুড়ুম করে আছড়ে পড়ল মাটিতে। আঁতকে উঠলেন ডাক্তার। একটুর জন্য প্রাণে বেঁচে গেছেন তিনি। হঠাৎ ডাক্তারের পেছন দিকের দৃশ্যটা দেখে বুক হিম হয়ে গেল লরার। মুখ হাঁ করল সে, ফুলে উঠল গলার রগ, কিন্তু তার সাবধান বাণী শুনতে পেলেন না ডা. পিলম্যান। একই সঙ্গে চিৎকার করেছিল জিমিও। কিন্তু আকাশ সমান উঁচু, বিশাল প্রাচীরের মত চওড়া, সমুদ্র গর্ভ থেকে উঠে আসা ওটা যেন জল দানব, গিলে খেলো জিমি আর লরার চিৎকার, সগর্জনে ছুটে এল ডা. পিলম্যানের দিকে। পেছন ফিরলেও এখন কোন লাভ নেই, কারণ ডাক্তার লরাদের কাছ থেকে অনেক দূরে, বিশাল দানব তাঁকে আত্মরক্ষার কোন সুযোগই দিল না, আক্ষরিক অর্থেই যেন বুড়ো মানুষটাকে পিষে ফেলল মাটির সঙ্গে। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল অন্যদের ওপর। অন্যরা এক ঝলক শুধু দেখতে পেল ডা. পিলম্যানকে। তারপর ঢেউটার আড়ালে নেই হয়ে গেলেন তিনি।

আরেকটা ঢেউ এল দশতলা বিল্ডিং-এর সমান। ছোট দলটাকে আরেকবার নরকের স্বাদ পাইয়ে দিয়ে চলে গেল। শূন্য সৈকতের দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে রইল ওরা। বিষণ্ণ গলায় জিম বলল, 'কোন লাভ নেই। ওনাকে বোধহয় আর পাব না। এখন জঙ্গলের দিকে চলো সবাই!' দীর্ঘশ্বাস বুকে চেপে কাজে হাত দিল সবাই। ভারী সিন্দুকটা ধরাধরি করে নিয়ে চলল জঙ্গলে। 'তাড়াতাড়ি... তাড়াতাড়ি,' তাড়া দিল জিমি। ভয়ে আছে সে না জানি কখন আবার প্রকাণ্ড একটা ঢেউ এসে কাকে আবার ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

সাগর সৈকতের একটা গাছও অক্ষত নেই। বাতাসের নির্দয় চাবুকে কোনটা ডালপালা ভেঙে ন্যাড়া হয়ে আছে, কোনটা উপড়ে পড়েছে মাটিতে। সতর্ক ভাবে এগিয়ে চলল ওরা গাছপালার আবর্জনা বাঁচিয়ে। কিন্তু বাতাসের অবিরাম চিৎকার ওদের কান যেন ঝালাপালা করে দিল।

হঠাৎ অত্যুজ্জ্বল আলোয় ঝলসে গেল চোখ, দিনের মত সাদা আলোয় ভরে গেল সাগর-সৈকত। একটা লম্বা গাছ দেখতে পেল সবাই। পরক্ষণে বুক কাঁপানো শব্দে একটা বাজ পড়ল ওটার ওপর, দু'ভাগ করে ফেলল। র‍্যালফ এগিয়ে ছিল সবার আগে, বিস্ফারিত চোখে দেখল দ্বিখণ্ডিত গাছটার একটা অংশ আছড়ে পড়তে যাচ্ছে তার ওপর। গলা ফাটিয়ে চিৎকার দিল র‍্যালফ। বিদ্যুৎ খেলে গেল শরীরে, লাফিয়ে পড়ল ঘন একটা ঝোপের ওপর। হাঁচড়ে পাঁচড়ে কোনমতে দাঁড়িয়েই দিল ছুট। উন্মাদের মত দৌড়াচ্ছে র‍্যালফ, যেন কোটর ছিঁড়ে বেরিয়ে আসবে চোখ। হঠাৎ দেখল ভয়ঙ্কর মুখোশ পরা একটা মুখ তাকিয়ে আছে ওর দিকে। এমন ভয়াবহ এবং বীভৎস চেহারা জীবনে দেখেনি র‍্যালফ। 'মাগো!' বলে চিৎকার দিল সে, লাফ দিল পেছন দিকে। সঙ্গে সঙ্গে টের পেল গভীর একটা গর্তে পড়ে যাচ্ছে ও, পড়ছে…পড়ছে… যেন কালো মহাশূন্যের বিশাল এক গহ্বরে ঢুকে যাচ্ছে।

আতঙ্কিত র‍্যালফ অনেকক্ষণ স্থির হয়ে পড়ে থাকল অন্ধকারে। বিদ্যুৎ চমকে উঠতেই বুঝতে পারল, খাদে পড়ে গেছে ও। একই সঙ্গে আঁতকে উঠল। একটা কঙ্কাল, বীভৎস দাঁতের পাটি বের করে নিঃশব্দে হাসছে ওর দিকে চেয়ে। মুখ হাঁ করল র‍্যালফ, চিৎকার করবে। কিন্তু কোন শব্দই বেরুল না গলা থেকে। পাথর হয়ে শুয়ে থাকল র‍্যালফ, হাত নাড়তেই ঘিনঘিনে কীসে যেন আঙুল লাগল। আবারও মুখ হাঁ করল ও, এবার একটার পর একটা খাদ ফাটানো চিৎকার বেরিয়ে আসতে লাগল গলা দিয়ে। ভাইব্রেশনে কেঁপে গেল কঙ্কালটা, ঠাস করে পড়ল র‍্যালফের গায়ে। শুকনো হাড়গুলোর স্পর্শ লাগতেই কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে গেল ছেলেটা, রীতিমত ফোঁপাতে শুরু করল। এত ভয় জীবনে পায়নি সে।

'জিমি চাচা…ওহ্, জিমি চাচা!' ঝরঝর করে কাঁদতে লাগল র‍্যালফ।

ওপরে, জিমি অন্যদের সঙ্গে পাগলের মত খুঁজে চলেছে র‍্যালফকে। জিমি বারবার ডাকল, 'র‍্যালফ…র‍্যালফ…'

'আমি এখানে!'

কান্নার শব্দটা মুহূর্তের জন্য হতবুদ্ধি করে তুলল জিমি রজারসকে। কিন্তু দেরি না করে শব্দ লক্ষ্য করে ছুটে গেল সে। খাদের মত মস্ত একটা গর্ত চোখে পড়ল। গর্তের মুখের ডালপালাগুলো সরিয়ে উঁকি দিল জিমি। বিদ্যুতের আলোয় স্পষ্ট চেনা গেল ভয়ে সাদা র‍্যালফের ‍পাণ্ডুর মুখ। 'আমাকে এখান থেকে বের করো, প্লীজ!' জিমিকে দেখে আরও জোরে

কেঁদে উঠল র‍্যালফ।

গর্তটা আবিষ্কার করে মনে মনে আনন্দিত হলো জিমি। একদিক থেকে ভালই হয়েছে। এই জায়গাটা খোলা প্রান্তরের চেয়ে অনেক নিরাপদ। সবাইকে সে গর্তে ঢুকতে বলল। ঝড় একটু কমুক, তারপর অন্য কিছু ভাবা যাবে।

গাদাগাদি করে গর্তে জায়গা করে নিল সবাই। বিগ বিয়ার প্রথমে এখানে আসতেই চায়নি। কারণ সে দেখেই চিনেছে এটা তাদের প্রধান সর্দারের কবর। সর্দারের কবরে বিদেশীদের অনুপ্রবেশ! সর্দার জ্যান্ত হয়ে ঘাড় মটকে দেয় কিনা এই ভয়ে বিগ বিয়ার অজ্ঞান হতে বাকি রাখল শুধু। সে হাতের ছোট কুড়োলটা দিয়ে কঙ্কালটাকে প্রাণপণে বাতাস করতে লাগল।

ইন্ডিয়ানটার কাণ্ড মুখ হাঁ করে দেখছে লরা। ফিসফিস করে জিমিকে বলল, 'ও কী করছে?'

'ভূত তাড়াবার মন্ত্র পড়ছে।'

বিগ বিয়ার তার সঙ্গীদের দিকে চাইল, 'এটা মেটকাম্ব কুগারদের পবিত্র গোরস্থান!'

জিমি বলল, 'ভূতের চেয়েও ভয় পাচ্ছি জ্যান্ত কুগারদের। যদি আমাদের দেখে ফেলে!'

'ওরা কি আমাদের মেরে ফেলবে?' ভয়ে ভয়ে বলল কিশোর।

বিগ বিয়ার বলল, 'কোন খুনোখুনি নয়। কুগাররা শুধু কোফকাতা বানাতে চায়।'

বিস্মিত হলো লরা। 'কোফকাতা?'

মাথা দোলাল জিমি। 'ক্রীতদাস। শত্রুপক্ষকে ধরতে পারলে ওরা ক্রীতদাস বানায়। ধরা পড়লে আমাদেরকেও সারাজীবন ক্রীতদাস হয়ে থাকতে হবে।'

পরদিন সকালে থেমে গেল ঝড়। লেবু রঙের বিষণ্ন সূর্য উঁকি দিল সাগর-সৈকতে। চারদিকে ধ্বংসের ছড়াছড়ি। ভোরের প্রথম আলোয় জিমি সৈকত চষে বেড়াল ডাক্তার পিলম্যানের খোঁজে। এত কষ্ট করে শেষ পর্যন্ত গুপ্তধনের সন্ধান মিললেও এমন আনন্দের মুহূর্তে সবার প্রিয় মানুষটাই কাছে নেই।

কবরের পাশে, মাটির ওপরে সিন্দুকটাকে ঘিরে বসে আছে র‍্যালফরা। অপেক্ষা করছে জিমির জন্য। জিমি এসে এদিক ওদিক মাথা নাড়ল। ওরা

যা ভেবেছিল ঠিক তাই।

'কোন খোঁজ নেই,' মনমরা গলায় বলল সে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল লরা। হাত বাড়াল সিন্দুকের ডালার দিকে। খুলল। ঝকমকে একটা নেকলেস তুলে নিল সে, আঙুল ফাঁক করল, মিষ্টি শব্দে কয়েকটা স্বর্ণমুদ্রা পড়ল সিন্দুকের ভেতরে। উদ্ভাসিত হয়ে উঠল লরার মুখ, 'সোনা...' উচ্ছ্বসিত গলায় ঘোষণা করল সে...'কিছু সোনার গহনা...বাকি সব স্বর্ণমুদ্রা।' হঠাৎ ডাক্তার পিলম্যানের কথা মনে পড়ল সবার। অশ্রুসজল হয়ে উঠল চোখ।

বিগ বিয়ার কী কাজে যেন জঙ্গলে গিয়েছিল, ফিরে এল দৌড়াতে দৌড়াতে। প্রবল হাঁপাচ্ছে সে, চোখের তারা ঘুরছে, যেন অস্বাভাবিক কিছু একটা দেখে এসেছে। পেছন দিকে হাত দেখাল বিগ বিয়ার। 'জিমি, কুগাররা আসছে!'

'ভাগো সবাই, শিগ্‌গির।' ঝট করে সিন্দুকের ডালা বন্ধ করল জিমি। বিগ বিয়ারের সাহায্যে ওটাকে নিয়ে সৈকতের দিকে এগোতে শুরু করল। লরা আর ছেলেরাও পড়িমরি করে ছুটল। বেশিদূর যেতেও পারেনি, হঠাৎ বাতাসে শিস কেটে এল একটা বুলেট। জমে গেল সবাই। 'সাবধান!' বলেই সিন্দুকটা ফেলে দিয়ে একটা উঁচু কাঠের গুঁড়ির স্তূপের আড়ালে শুয়ে পড়ল। অন্যরাও এটার পেছনে কাভার নিল।

আরেকটা বুলেট একটা গাছের গুঁড়িতে লাগল। সাবধানে মাথা তুলল কিশোর। ভয়ানক বিস্মিত হয়ে বলল, 'আরে, এ তো রিডলার!' সাময়িক উত্তেজনায়, একের পর এক নাটকীয় ঘটনায় ওরা শয়তান লোকটার কথা ভুলেই গিয়েছিল। জিমি চিৎকার করে বলল, 'গুলি বন্ধ করো!'

রিডলার কর্কশ গলায় জবাব দিল। 'আমাদের সোনা চাই, জিমি। সোনা দিয়ে এখান থেকে কেটে পড়ো।'

কালো হয়ে গেল র‍্যালফের মুখ। 'তুমি ওকে সোনা দেবে না তো, চাচা?'

কোন কথা বলল না জিমি। বিগ বিয়ার ফিসফিসিয়ে বলল, 'কুগার গুলির শব্দ শুনলে...এখানে আসবে।'

কী যেন ভাবল জিমি। বলল, 'তা হলে মন্দ হয় না অবশ্য।' একটা বুদ্ধি এসেছে তার মাথায়, কিন্তু অন্যদের বলার মত সময় নেই হাতে।

'আমরা আর অপেক্ষা করতে পারব না,' অধৈর্য গলায় চেঁচাল রিডলার। 'সোনা আমার চাই। এবং এখুনি।'

জিমি লরার দিকে ফিরল। 'তুমি বাচ্চাদের নিয়ে এখান থেকে চলে যাও। লুকিয়ে পড়ো!'

মিনতি করল লরা। 'জিমি, সোনা ওকে দিয়ে দাও।' সোনার জন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়ে লাভ নেই।

'যা বলছি করো!' ধমকে উঠল জিমি। ওর দিকে পেছন ফিরে রিডলারকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'সোনা তোমাকে দেব। তোমার প্রতিশ্রুতিও কিন্তু পালন করতে হবে। নিরাপদে আমাদের এখান থেকে চলে যেতে দিতে হবে।'

লরা, কিশোর এবং র‍্যালফ হামাগুড়ি দিয়ে গাছের একটা সারির দিকে এগুচ্ছে, রিডলারের গলা শুনতে পেল, 'একজন যথার্থ ভদ্রলোক হিসেবে আমি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে থাকি,.জিমি।' খিকখিক করে হাসল কে যেন। যথার্থ ভদ্রলোকই বটে!

জিমি আর বিগ বিয়ার গাছের গুঁড়ির পাঁজার আড়ালে গুটিসুটি মেরে বসে আছে, চেহারায় শঙ্কার ছাপ। এইবার! বিগ বিয়ারকে ইঙ্গিত করল জিমি। ঝট করে উঠে দাঁড়াল, পরপর তিনটে গুলি ছুঁড়ল রিডলারদের উদ্দেশে, তারপর দু'জনে মিলে সিন্দুকটা নিয়ে ছুট দিল জঙ্গল লক্ষ্য করে।

ওদের ধাওয়া করল রিডলার। জিমি ফিসফিস করে বিগ বিয়ারকে বলল সিন্দুকটা কুগার সর্দারের সমাধির ওপর রাখতে। তারপর লরাদের ইশারা করল সমাধির পেছনে চলে যেতে। সবাই গর্তের মধ্যে ঢুকে পড়ল। জিমি গর্তের মুখ ঢেকে দিল ডালপালা দিয়ে। তারপর অন্যদের সঙ্গে যোগ দিল। সবাই শিরদাঁড়া টানটান করে বসে থাকল।

রিডলার আর হোলার সাবধানে জঙ্গলে ঢুকল। ওদের মন বলছে ওরা ফাঁদে পড়তে যাচ্ছে। শত্রুপক্ষের ছায়াও নেই কোথাও। কিন্তু ওরা ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করেনি শীতল কয়েক জোড়া চোখ তাদের অনেক আগে থেকে অনুসরণ করে চলেছে। অনুসরণকারীদের মুখ ঢাকা ভয়ঙ্কর মুখোশে, বেড়ালের মত নিঃশব্দ পায়ে পিছু নিচ্ছে শিকারের।

গাছের ডাল ভেদ করে সূর্যের সোনালী রশ্মি কুগার সর্দারের কবর ছুঁলো। সঙ্গে সঙ্গে সিন্দুকটা চোখে পড়ল রিডলারের, দৌড়ে গেল সে। লোভে চকচক করছে চোখ, রিডলার লাথি মেরে পায়ের নীচের বিভিন্ন তৈজসপত্র, খাবার, যেগুলো মৃত ব্যক্তির আত্মার উদ্দেশে উৎসর্গ করেছে কুগার ইন্ডিয়ানরা, সব ভেঙে তছনছ করে ফেলল। এসবের কোন মূল্যই নেই তার কাছে। এখন তার কাছে একটাই মাত্র সত্য–সোনা! হামলে পড়ল

রিডলার সিন্দুকের ওপর, এক ঝটকায় খুলে ফেলল ডালা। ঝলমলে স্বর্ণমুদ্রাগুলো সূর্যের আলোয় ঝিলিক দিল, ঝলসে গেল তার চোখ। অবশেষে! যে জিনিসটার জন্য সে মানুষ খুনও করেছে, অবশেষে সেই গুপ্তধন তার হাতের মুঠোয়।

হোলার রিডলারের পেছনেই ছিল, সোনা দেখে ঠোঁট চাটল সে। 'খুব ভারী বলে ওরা সিন্দুকটা নিয়ে যেতে পারেনি।' মন্তব্য করল সে।

হাত বাড়াল রিডলার, স্বপ্নের ধন ছুঁলো, হাতড়াতে লাগল পাগলের মত। 'ওহোহোহো...আহাহাহা!' করতে লাগল।

লুকানো, গোপন জায়গা থেকে সবই শুনল জিমিরা। রিডলার হাঁক ছাড়ল, 'নৌকায় ওঠো। সিন্দুকটা ধরো।' রিডলারের লোকেরা উল্লাসে চিৎকার শুরু করল। বিলি বিগস নাচতে নাচতে এগিয়ে এল সিন্দুক বইতে। সন্দেহ নেই, বড় রকমের পুরস্কার আছে তার ভাগ্যে। সিন্দুকটা ধরে ওরা মাটিতে নামাতে শুরু করল। সঙ্গে সঙ্গে ঘটতে শুরু করল ঘটনা।

সাঁৎ করে একটা তীর এসে লাগল সিন্দুকের পেছনে। 'বাবারে মারে!' বলে সিন্দুক ফেলে বিলি আর তার সঙ্গীরা ডাইভ দিয়ে পড়ল মাটিতে। পাঁই করে ঘুরে দাঁড়াল রিডলার আর হোলার, বন্দুক রেডি। কয়েক মুহূর্ত কাটল। চারদিক আশ্চর্য নিস্তব্ধ। একটা অস্বস্তিবোধ ঘিরে ধরল রিডলারকে। শত্রুরা কোথায়? ভাবতে না ভাবতেই বাতাসে ভেসে এল বিষাক্ত দ্বিতীয় তীরটা, গেঁথে গেল গাছের ডালে, হোলারের মাথার কয়েক আঙুল ওপরে। গর্জে উঠল ওদের হাতের বন্দুক। রিডলারের লোকেরা যত্রতত্র গুলি ছুঁড়তে শুরু করল যাতে শত্রুপক্ষ আড়াল থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়। জিমি একটা ডাল সরিয়ে উঁকি দিল। দেখল রিডলার আর তার সঙ্গীরা অদৃশ্য শত্রুর ভয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছে। বিলি একটা গাছের আড়ালে হামাগুড়ি দিয়ে আছে, যেন সুযোগ পেলেই সেঁধিয়ে যাবে ভেতরে। ভয়ে থরথর করে কাঁপছে সে। কারণ জানে পবিত্র ভূমি অপবিত্র করার জন্য রেগে গেছে ইণ্ডিয়ানরা। এবার সবার জান কবচ করে ছাড়বে।

'শয়তানগুলো সব কোথায়?' কাঁপা গলায় চিৎকার করল একটা লোক।

'আমি আর এর মধ্যে নেই!' বলল বিলি। ভয়ার্ত আর্তনাদ করে সে বেরিয়ে এল খোলা জায়গায়, তাড়া খাওয়া ইঁদুরের মত দৌড় দিল।

'থামো!' আদেশ করল রিডলার। কিন্তু থামল না বিলি।

ভয় পেয়েছে হোলার—প্রচণ্ড ভয় পেয়েছে। লুকানো জায়গা থেকে ঝট করে উঠে দাঁড়াল। 'আমিও আর এর মধ্যে নেই,' বলে সেও একটা চিৎকার

দিয়ে বিলির পিছু নিল। ওদের দু'জনকে পালিয়ে যেতে দেখে বাকি লোকগুলোর মধ্যেও একই প্রতিক্রিয়া হলো। জিমি দেখল রিডলারকে ফেলে সবাই ঝেড়ে দৌড়াতে শুরু করেছে সৈকত লক্ষ্য করে।

'ফিরে এসো!' গাঁক গাঁক করে চেঁচাল রিডলার। 'ফিরে এসো হলদে ইঁদুরের দল।' কে শোনে কার কথা। ওরা এখন জান বাজি রেখে ছুটছে।

কাপুরুষ লোকগুলোকে চোখের দৃষ্টি দিয়ে ভস্ম করে রিডলার একাই ভারী সিন্দুকটা নিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে গুড়ুম করে রাইফেলের গুলির আওয়াজ হলো শূন্যে। লাফিয়ে উঠল রিডলার, পিছলে পড়ল মাটিতে, ভয়ানক ব্যথা পেল কাঁধে।

নিঃশব্দে, ঘন জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল লম্বা এক ইন্ডিয়ান, মুখে বিকট মুখোশ। এ কুগারদের সর্দার। রিডলার তার দিকে আতঙ্কিত চোখে তাকাল। কুগাররা, যেন অলৌকিক গতিতে ঘিরে ফেলল রিডলারের লোকদের, বন্দী করল সব ক'জনকে। কুগাররা ওদের ধাক্কাতে ধাক্কাতে নিয়ে এল রিডলারের কাছে। কপালে না জানি কী আছে ভেবে থরথর করে কাঁপতে লাগল সবাই।

বিলি সর্দারের পায়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। নাকি সুরে কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'সর্দার, আমি এই লোকগুলোকে চিনি না। জোর করে ওরা আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে। আমাকে দয়া করুন, সর্দার। আমার মায়ের দিক থেকে আমি মোহাক গোত্রের।'

সর্দারের মুখোশ পরা চেহারায় কোন ভাব ফুটল না। সে বিলির চুল মুঠোতে ধরে বলল, 'ভাল! মোহাকরা খুব ভাল ক্রীতদাস হয়।' ধাক্কা মেরে সে বিলিকে সরিয়ে দিল।

বন্দীদের সরিয়ে নিতে সর্দার তার লোকদের ইঙ্গিত করল। ওরা প্রতিবাদ করার চেষ্টা করল বটে, কিন্তু কোন লাভ হলো না। লাথিগুঁতো দিয়ে ওদের হাঁটিয়ে নিয়ে চলল কুগাররা। শুধু রিডলার সর্দারের পাশে থাকল। সে মুখ বিকৃত করে মাটিতেই বসে রইল।

হঠাৎ, সর্দার ঘুরে দাঁড়াল, এগোল কবরের প্রবেশ পথের দিকে। গর্তের মুখে দাঁড়ানো জিমি সর্দারকে আসতে দেখে তার দলের লোকদের ইঙ্গিত করল কেউ যেন কোন শব্দ না করে। ভয়ে জমে গেল সবাই। মনে মনে প্রার্থনা শুরু করল সর্দারটা যেন ওদেরকে না দেখে। সূর্যের হালকা একটুকরো রশ্মি কবরের ভেতরের অন্ধকার আরও রহস্যময় করে তুলেছে। দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে ছোট দলটা স্থির বসে রইল, যেন কান পাতলে শুনতে

পাবে পরস্পরের হৃৎস্পন্দন। খুব সাবধানে শ্বাস নিচ্ছে সবাই। সর্দার কবরের মুখে এসে দাঁড়াল। হাঁটু গেড়ে বসে কিছুক্ষণ চুপচাপ প্রার্থনা করল তার দেবতাদের উদ্দেশে, তারপর উঠে দাঁড়াল। মুখোশ লাগানো লম্বা একটা লাঠি এবার ছুঁড়ে ফেলল কবরের ভেতরে। সশ্রদ্ধ একটা ভঙ্গি করে আগের জায়গায় ফিরে গেল।

রিডলার উঠে দাঁড়িয়েছে, এক হাত আহত কাঁধের ওপর, চেহারা অবিকল চোরের মত। রিডলারকে ঠেলা দিল সর্দার, বলল, 'চলো, ক্রীতদাস!'

শেষবারের মত করুণ চোখে রিডলার তাকাল সিন্দুকের দিকে, ওটা এখনও খোলা, সূর্যের আলোয় ঝকমক করছে স্বর্ণমুদ্রাগুলো। ধাক্কা খেতে খেতে এগোবার সময় তার এবার ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করল।

দশ

জিমি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল। যখন বুঝল ইন্ডিয়ানরা দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেছে, উঠে এল সে ওপরে। ইশারা করল অন্যদেরকেও চলে আসতে। স্যাঁতসেঁতে, গরম আর নরকের মত অন্ধকার গর্তটা দিয়ে খোলা বাতাসে এসে যেন নতুন জীবন ফিরে পেল সবাই। কুগার ইন্ডিয়ানরা আবার যে কোন সময়ে আসতে পারে, এই ভয় কাজ করছে সবার মনেই। সিন্দুকটা হাত ধরাধরি করে ছোট খাঁড়িটার কাছে গেল ওরা। ওদের নৌকাটা এখনও আগের জায়গাতেই আছে। পানিতে সয়লাব, কিন্তু তেমন কোন ক্ষতি হয়নি।

দৌড়াতে দৌড়াতে এল কিশোর, হাতে ডাক্তার পিলম্যানের বিভার হ্যাট। পালাবার চেষ্টা করার সময় ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে বিলির মাথা থেকে হ্যাটটা ছিটকে পড়ে গিয়েছিল। হ্যাটটার গায়ের বালু ঝাড়ল কিশোর, ওর চোখ ভরে গেল জলে। সিন্দুকের ওপরে সাজিয়ে রাখল ওটাকে। এক মিনিট কেউ কোন কথা বলল না। সবার ভীষণ মনে পড়ছে তাদের সদা হাস্যময় হারানো প্রিয় বন্ধুটির কথা।

নীরবতা ভাঙল জিমি। র‍্যালফের চুলে হাত বোলাতে বোলাতে বলল, 'শেষ পর্যন্ত তোমার বাবার গুপ্তধন পেলে তুমি, র‍্যালফ!'

মাথা দোলাল র‍্যালফ। হ্যাঁ, স্বপ্নের গুপ্তধন পেয়েছে সে। কিন্তু অনেকের ত্যাগের বিনিময়ে। হারিয়েছে সে তাদের প্রিয় চাকর চার্লিকে...নিখোঁজ হয়েছেন ডাক্তার। বিজয়ের মুহূর্তটাকে তাই সে প্রফুল্ল মনে উপভোগ করতে পারছে না। 'এখন আর গ্রাসিকে কেউ আমাদের হাত থেকে কেড়ে নিতে পারবে না,' বিড়বিড় করে বলল র‍্যালফ। 'বাকি টাকা আমরা সবাইকে ভাগ করে দেব, তাই না কিশোর?'

'ঠিক!' সায় দিল কিশোর। তাকাল সাগর সৈকতের দিকে। ওর ভুরু কুঁচকে উঠল। একটা লোক, কুঁজো হয়ে ধীরে ধীরে এদিকেই আসছে। লোকটার জামাকাপড় শতচ্ছিন্ন, একটা লাঠিতে ভর করে খুঁড়িয়ে হাঁটছে। কিশোরই তাকে প্রথমে সনাক্ত করতে পারল, আনন্দে চিৎকার করে উঠল। খপ করে সিন্দুকের ওপর থেকে বিভার হ্যাটটা তুলে নিয়ে সে সৈকতের দিকে দৌড় দিল।

'ডা. পিলম্যান...পিলম্যান...' খুশিতে যেন আত্মহারা হয়ে গেল সবাই, হাত বাড়িয়ে ছুটল লোকটির দিকে। ডা. পিলম্যানকে জড়িয়ে ধরল ওরা একসঙ্গে, চুমোয় চুমোয় অস্থির করে তুলল। শ্বাস নেয়ার জো থাকল না বেচারার।

'আপনি ঠিক আছেন তো?' জিজ্ঞেস করল র‍্যালফ।

জিমি তার হাত ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল, 'আপনাকে আবার দেখব কল্পনাও করিনি, ডক্টর।'

ম্লান হাসলেন পিলম্যান। 'সাগর আমাকে ডুবিয়ে মারতে পারেনি, স্যার। ঢেউয়ের ধাক্কায় আবার তীরে ফেরত এসেছি।'

লরার মুখ খুশিতে ঝলমল করছে। সে বলল, 'আপনাকে দেখে আমার যে কী খুশি লাগছে, ডক্টর!' সে ডাক্তারের চিবুকে চুমু দিল।

লাজুক মুখে ডকশোর সামনে এল, বিভার হ্যাটটা ডাক্তারের হাতে দিল। খুশির চোটে ডা. পিলম্যানের চোখে জল এসে গেল। তিনি শুধু, 'ওহ্, কিশোর, ওহ্ ডকশোর! থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ!' বলতে লাগলেন।

কিশোর ডাক্তারের মুখের দিকে চাইল। 'ডা. পিলম্যান, আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে বলেছিলাম তিনি যদি আপনাকে বাঁচিয়ে রাখেন তা হলে আপনি আমাকে যা করতে বলবেন আমি তাই করব।'

পরম মমতায় ছেলেটাকে জড়িয়ে ধরলেন ডা. পিলম্যান।

ওরা সবাই নৌকায় উঠল। ডা. পিলম্যান কৌতুক করে জানতে চাইলেন, 'তারপর তোমাদের কেমন সময় কাটল, শুনি?'

'বাপরে!' আঁতকে উঠে বলল জিমি।

লরাও শিউরে উঠল। কিন্তু কোন মন্তব্য করল না। ভয়ঙ্কর এই অভিজ্ঞতার কথা বলার প্রচুর সময় পাওয়া যাবে পরে।

'জীবনেও এমন দুর্দশায় পড়িনি আমি,' স্বীকার করলেন ডাক্তার। 'তবে উত্তেজনাকরও ছিল বটে!'

নৌকা ভেসে পড়ল জলে। এবার গন্তব্য বাড়ি।

'আপনি কি সত্যি ইংরেজ, ডা. পিলম্যান?' জানতে চাইল কিশোর।

'কখনও কখনও কিশোর, কখনও কখনও।' মুখ টিপে হাসলেন ডাক্তার।

'আপনি আমাদের বাড়িতে চলুন না ডা. পিলম্যান,' অনুরোধ করল র‍্যালফ। 'আমাদের সঙ্গে থাকবেন।'

'তোমাদের বাড়িতে?' আমন্ত্রণ পেয়ে খুশি হলেন ডাক্তার। বললেন, 'তোমার আমন্ত্রণে আমি নিজেকে সত্যি সম্মানিত বোধ করছি, র‍্যালফ। কিন্তু আমি যে যেতে পারব না, সোনা। আমি গেলে এই গরীব দুঃখীগুলোর চিকিৎসা কে করবে বলো? ওরা প্রতি বছর আমার জন্য অধীর অপেক্ষায় থাকে।' দুষ্টু হাসি তাঁর ঠোঁটে। বললেন, 'তবে জেনে ভাল লাগল তোমাদের বাড়ি সবসময়ই আমার জন্য একটা নিরাপদ আশ্রয়স্থল হয়ে থাকবে।'

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসল জিমি আর লরা। দু'জোড়া চোখে কি গভীর প্রেম! 'তাই' বলে চললেন তিনি, '...আমি আশা করব এই বন্ধুত্ব চিরকাল কামারের হাপরের আগুনের মত ধিকিধিকি জ্বলবে এবং উষ্ণ উত্তাপ কখনোই শীতল হবে না!'

নাক চুলকাল র‍্যালফ, ওকে হতভম্ব দেখাল। কিশোরের দিকে ঘুরল সে, ফিসফিস করে বলল, 'উনি কী বললেন?'

সবাই হা হা করে হেসে উঠল। আর ছোট্ট ক্যানোটা তরতর করে এগিয়ে চলল বাড়ি, বাড়ি, মিষ্টি বাড়ির দিকে।

***

ভয়ের মুখোশ

শামসুদ্দীন নওয়াব

প্রথম প্রকাশ: ২০০৮

এক

'ছুটিটা আমি এভাবে কাটাতে চাইনি!' বলে বাসের জানালা দিয়ে মাথা বের করে দিল কিশোর। বেসবল ক্যাপটা উড়ে যাচ্ছিল প্রায়, মাথায় চেপে বসাল।

বই থেকে চোখ না তুলেই মাথা ঝাঁকাল রবিন।

'আমার ইচ্ছে ছিল বাসায় বসে "ক্রিয়েচার্স অভ দ্য ডিপ" পড়ে শেষ করব।'

'এই বইটার মধ্যে কী এমন আছে?' প্রশ্ন করল কিশোর।

নতুন কেনা বইটা তুলে ধরল নথি।

'এটা পানির দানোদের নিয়ে লেখা। পড়লে তোমারও ভাল লাগবে!'

'নাহ, আমার আপাতত বই-টই পড়ার ইচ্ছে নেই,' সাফ জানিয়ে দিল কিশোর।

'ক্যাম্প লোন উলফে মশার কামড় খাওয়ার চাইতে,' আলোচনায় যোগ দিল মুসা, 'বাসায় বসে বই পড়াও ভাল।'

কিশোরের সামনের জানালা দিয়ে মাথা গলিয়ে দিল ডানা।

'এই ক্যাম্পে যদিও কেউ আসতে চায়নি, তবু আমাদের যতটা সম্ভব এনজয় করার চেষ্টা তো করা উচিত,' বলল ও।

বাস ভর্তি ছেলে-মেয়ে গ্রীনহিলস থেকে কাছের ক্যাম্পটার উদ্দেশে চলেছে। এখানে ওরা আগেও কয়েকবার এসেছে। তাই এবার সঙ্গে বড় কেউ নেই।

'ডানা ভুল বলেনি। আমাদের পজিটিভ অ্যাটিচুড থাকা দরকার,' বলল মুসা।

রবিন এসময় জানালা দিয়ে আঙুল ইশারা করল।

'ওই যে, ক্যাম্প লোন উলফের সাইন। আমরা এসে পড়ছি প্রায়।'

'বাঁচলাম, বাবা!' বলে উঠল মুসা। 'বাসের ঝাঁকুনিতে পেট ব্যথা হয়ে গেছে।'

'তখনই বলেছিলাম বাসে চকোলেট মিল্ক খেয়ো না। তুমি এখন একটা

ধাড়ি মিল্কশেক হয়ে গেছ,' কৌতুক করে বলল গোয়েন্দাপ্রধান।

'খাইছে!' বলে উঠল মুসা, হাসছে।

এসময় জোরাল বাজনার শব্দ কানে এল ওদের। অদ্ভুত ধরনের বাজনা।

'কীসের শব্দ এটা?' কানে হাত চাপা দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল ডানা।

'ব্যাগপাইপ মিউজিক!' পাল্টা চেঁচাল রবিন। হঠাৎ বাজনা থেমে গেল। ফলে ওর চিৎকার প্রতিধ্বনিত হলো গোটা বাসে। সবাই ঘুরে চাইল রবিনের দিকে।

রবিন শ্রাগ করল। মুখের চেহারা লাল।

'এই ব্যাগপাইপ মিউজিক,' স্বাভাবিক স্বরে বলল।

'পাখির ডাক নয় বোঝাই গেছে,' বলল কিশোর। 'স্কটল্যান্ড থেকে এখানে ওটা আমদানী করল কে?'

ডানা জানালা দিয়ে তর্জনী তাক করে ফ্যাকাসে চেহারার রোগা এক মহিলাকে দেখাল। তার পরনে ওয়েট সুট, মুখোশ আর সবুজ ফ্লিপার্স। কাঁধের উপর একটা ব্যাগপাইপ ঝুলছে।

'বাজনাটা ওই মহিলা বাজিয়েছে,' বাস থেমে দাঁড়ালে বলল ডানা।

'এখন সব পরিষ্কার হয়েছে,' চোখ ঘুরিয়ে বলল কিশোর। 'সাগরদানো ব্যাগপাইপ বাজাচ্ছে।'

দুই

ক্যাম্প ডিরেক্টর মি. উলফার ওদেরকে বাসের দরজায় সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। দোহারা গড়নের লম্বা ভদ্রলোক তিনি। সারা গা ভর্তি লোম। গলায় ঝুলছে ডগ ট্যাগ।

'ক্যাম্প লোন উলফে স্বাগতম,' জোরাল গলায় বলে উঠলেন মি. উলফার। ঝনঝন করে উঠল বাসের জানালাগুলো। 'তোমাদেরকে কেবিন অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়ার আগে নতুন সুইমিং ইন্সট্রাক্টরের সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি।'

'সুইমিং?' জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'এই ঠাণ্ডার মধ্যে সাঁতার কাটতে নামলে তো জমে বরফ হয়ে যাব।'

'কথা কম কাজ বেশি,' গর্জে উঠলেন মি. উলফার। পাশে দাঁড়ানো মহিলার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন। 'ইনি লকি, লকি হার্পার। স্কটল্যান্ড

থেকে এসেছেন। তোমাদেরকে শেখাবেন কীভাবে স্নরকেল করতে আর সাঁতার কাটতে হয়।'

'খাইছে! আমার স্নরকেল করার খুব শখ,' বলে উঠল মুসা। রবিনসহ আরও কয়েকটি ছেলে-মেয়ে সায় দিল ওর কথায়।

মি. উলফার লকি হার্পারের বাহু চাপড়ে দিলে তাঁর কথা শোনার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল সবাই।

দু'মুহূর্ত চুপ করে থাকলেন মহিলা। লম্বা, টিঙটিঙে লকি হার্পার মাথায় মি. উলফারকেও ছাড়িয়ে গেছেন। মুখের চেহারা এতটাই ফ্যাকাসে, দেখে মনে হয় কখনও সূর্যের দেখা পাননি বুঝি। আর গলাটা এতখানি লম্বা, ঠিক জিরাফের মত। কালো ওয়েট সুট পরা মহিলার হাতে ধরা ব্যাগপাইপ কাঁপছে। দেখে মনে হলো নার্ভাস।

'ভ-ভদ্রমহিলা ও ভ-ভদ্রমহোদয়দের স্বাগতম,' মৃদু, সুরেলা কণ্ঠে বললেন লকি। কিশোরের মনে হলো যেন অচেনা কোনও দেশের গান শুনল। 'আপনাদেরকে আমি গভীর পানির সৌন্দর্য চেনাতে চাই। এই সুযোগ পেয়ে আমি গর্বিত বোধ করছি।' 'আপনি' সম্বোধন শুনে ওরা পরস্পর মুখ তাকাতাকি করল।

মি. উলফার লকির দিকে চেয়ে মুচকি হাসলেন। তারপর কটমট করে ছেলে-মেয়েদের দিকে চাইলেন।

'তোমাদের কেবিন অ্যাসাইনমেন্ট জেনে নাও। একবার বলব।'

কেবিন গ্রে উলফে থাকবে আটটা মেয়ে। আর সিলভার উলফে নয়টা ছেলে।

'সবাই যার যার গিয়ার রেখে সোজা ডকে চলে যাবে,' গর্জন ছাড়লেন মি. উলফার। ছেলে-মেয়েরা ব্যাগ নিয়ে কেবিনের উদ্দেশে চলল।

'স্নরকেলিং করতে তর সইছে না আমার,' বলল রবিন।

'আমার কেমন ভয়-ভয় করছে,' বলল ডানা।

চোখ ঘুরাল কিশোর।

'ভয় শুধু ঠাণ্ডাকেই।'

খিলখিল করে হেসে ফেলল মুসা। ব্যাকপ্যাক ঠিকঠাক করে নিল।

'বাজি ধরে বলতে পারি ঠাণ্ডা-গরমের তোয়াক্কা করবেন না মিস্টার উলফার। আমার ধারণা তিনি প্রেমে পড়েছেন।'

'প্রেমে? কেন মনে হলো একথা?' সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল কিশোর।

'কীভাবে উনি লকি হার্পারের দিকে তাকাচ্ছিলেন দেখনি?'

মাথা ঝাঁকাল ডানা।

'ব্যাপারটা খুবই রোমান্টিক। মহিলা সেই স্কটল্যান্ড থেকে চলে এসেছেন শুধু মিস্টার উলফারের টানে,' বলল ও।

'তোমাদেরকে নিয়ে আর পারা গেল না,' মাথা নেড়ে বলল কিশোর।

তিন

ছেলে-মেয়েরা ডকে গিয়ে দেখে লকি হার্পার ওখানে আগেই পৌঁছে গেছেন। কাঠের জেটির কিনারে বসে থাকা লিকলিকে এক সিলের মত দেখাচ্ছে তাঁকে। ব্যাগপাইপটা তাঁর পাশে রাখা। কালো ওয়েট সুট চকচক করছে। লম্বা, সবুজ একখানা ফ্লিপার আলতো করে পানি কাটছে।

'ওঁকে দেখে মনে হচ্ছে মহাসাগরের তলা থেকে উঠে এসেছেন,' বলে হেসে ফেলল কিশোর।

'আস্তে, শুনে ফেলবেন। উনি নার্ভাস ফীল করছেন,' বলল ডানা।

'মিস্টার উলফার আমাদেরকে এখানে আপনার সাথে দেখা করতে বলেছেন,' বিনীত সুরে বলল মুসা।

মিস হার্পার গলা খাঁকরে নিয়ে মাথা নাড়লেন।

'নিশ্চয়ই,' সুরেলা কণ্ঠে বললেন। 'আমি আপনাদেরকে সাঁতার কাটতে শেখাব।'

'আমরা তো সাঁতার কাটতে পারি,' বলল মুসা।

'তা পারেন, কিন্তু পানির নীচে গেছেন কখনও? জানেন ওখানে কী সম্পদ লুকানো আছে?'

'গুপ্তধন?' বলে উঠল ডানা।

বিভ্রান্ত দেখাল লকি হার্পারকে।

'এই লকে কোনও গুপ্তধন নেই,' বললেন তিনি।

'লক?' প্রশ্ন করল ডানা।

'লেক,' মৃদু কণ্ঠে জানাল রবিন। 'স্কটল্যান্ডে লেককে লক বলে।'

'সেই স্কটল্যান্ড থেকে আপনি এখানে এলেন কেন?' প্রশ্ন করল মুসা।

লকির মুখের চেহারা টকটকে লাল হয়ে গেল। নিঃশব্দে পানিতে নেমে পড়লেন তিনি। পানির তলায় মুহূর্তের জন্য হারিয়ে গেলেন, তারপর আচমকা ভুস করে মাথা তুললেন ডকের অপর পারে।

'লক ইরিনের পানি ভালবাসি আমি,' বললেন ছেলে-মেয়েদেরকে। 'স্কটল্যান্ডের চাইতে এখানকার পানি অনেক বেশি শান্ত আর নিরাপদ।'

'আমার ধারণা তন্নতন্ন করে খুঁজলে এই লেকে গুপ্তধন পাওয়া যাবে,' বলল কিশোর। 'আমি খুঁজে দেখতে চাই।'

'খাইছে। তুমি না কমপ্লেন করছিলে পানি খুব ঠাণ্ডা,' মনে করিয়ে দিল মুসা।

'গুপ্তধন বলে কথা, গুলি মারো ঠাণ্ডার,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল কিশোর। 'এসো, নেমে পড়া যাক।'

'এখনই নয়,' পিছন থেকে গমগম করে উঠল একটি কণ্ঠ। মি. উলফার। 'কিছুই না জেনে কেউ লেকে নামবে না।'

গুঙিয়ে উঠল কিশোর।

'কিন্তু আমি তো সাঁতার জানি। আমাকে বসে থাকতে হবে কেন?'

'নামো তা হলে,' বলে উঠলেন মি. উলফার।

কোমরে হাত রাখল কিশোর।

'আগে পানিটা পরখ করে নাও,' সাবধান করলেন মি. উলফার।

'মিস লকি হার্পার তো লাফ দিয়ে নেমে পড়েছেন।' কিশোর আঙুল দেখাল মিস হার্পার যেখানে ছিলেন। এখন অবশ্য তাঁকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

'উনি গেলেন কই?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করল ডানা।

'এত নিঃশব্দে কেউ সাঁতার কাটে না,' ফিসফিস করে বলল মুসা।

'পানির জীব ছাড়া,' মৃদু কণ্ঠে বলল রবিন।

'ঠিক বলেছ,' খেঁকিয়ে উঠলেন মি. উলফার। 'সেজন্যেই আগে তোমাদেরকে কিছু ব্যাপার শিখে নিতে হবে। যাও, কিশোর, পানিতে পায়ের পাতা নামাও।'

কিশোর শ্রাগ করে লেকের পানিতে পা ডোবাল। কিন্তু পরমুহূর্তে পানি ছিটিয়ে ছিটকে সরে এল।

'বাপ রে!' বলে উঠল। 'পানিটা তুষারদানোর নাকের মত ঠাণ্ডা! মিস হার্পার নামলেন কীভাবে?'

মি. উলফার মুচকি হাসলেন।

'বসো, তোমাদেরকে এই লেক সম্পর্কে কিছু কথা বলি।'

সূর্য ডুবতে বসেছে এসময় শেখানো শেষ হলো মি. উলফারের। বরফ-ঠাণ্ডা পানিতে ওয়েট সুট পরতে হয় এবং স্নরকেল করার সময়

টিউবের মাধ্যমে কীভাবে শ্বাস নিতে হয় দেখিয়ে দিলেন তিনি।

'এবার পানির তলায় সাঁতরাতে ভাল লাগবে তোমাদের,' বললেন মি. উলফার। 'প্রকৃতিতে দেখার মত অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস আছে। সেজন্যেই ক্যাম্প লোন উলফ বানানো হয়েছে, যাতে এখানে জন্তু-জানোয়ার আর গাছ-পালা নির্ভয়ে বাড়তে পারে।'

'কিন্তু এখানকার জঙ্গলে তো কোনও ইন্টারেস্টিং জানোয়ার নেই,' হোঁতকা ম্যাকনামারা অভিযোগ করল।

চোয়াল ঘষলেন মি. উলফার।

'জন্তু-জানোয়ারেরা যখন জেনে যাবে ক্যাম্প লোন উলফে তারা নিরাপদ তখন ঠিকই এসে হাজির হবে।'

'কোন্ ধরনের জানোয়ার?' ডানার জিজ্ঞাসা।

'সব ধরনের।'

'যেমন নেকড়েমানব,' বলে হেসে ফেলল কিশোর। কিন্তু মি. উলফার কড়া চোখে চাইতে হাসি মিলিয়ে গেল ওর।

'বনের জন্তু,' বলে চললেন মি. উলফার, 'এবং পানির তলার জীব।'

ঠিক এসময় ছলাৎ করে বড় ধরনের এক শব্দ উঠল লেকের মাঝখানে।

চার

'কী ওটা?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠল ডানা।

মি. উলফার লেকের মাঝ বরাবর দৃষ্টি প্রসারিত করলেন। অনেকক্ষণ পর ঘুরে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন।

'ভয়ের কিছু নেই। কেউ মনে হয় শিকার ধরল। যাকগে, পনেরো মিনিটের মধ্যে সবাইকে ডাইনিং হলে চাই।'

মি. উলফার লেকের দিকে আরেক ঝলক চেয়ে গটগট করে কেবিনের উদ্দেশে হাঁটা দিলেন। ছেলে-মেয়েরা তাঁকে অনুসরণ করল।

'চলো,' বলল মুসা। 'খিদে পেয়েছে।'

রবিন হাত বাড়িয়ে ওর বাহু চেপে ধরল।

'এখনই নয়,' বলল ও। 'কথা আছে। আমার কেমন কেমন জানি লাগছে।'

'নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে,' বলল কিশোর।

'খাওয়াটা পরে হলেও চলবে,' বন্ধুদেরকে বলল নথি।

'এতই জরুরী কথা?' বলে উঠল ডানা।

রবিন বন্ধুদের সবার দিকে পালা করে দৃষ্টি বুলিয়ে জবাব দিল।

'ক্যাম্প লোন উলফের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমি চিন্তিত।'

'খাইছে, তার কারণ?' মুসার প্রশ্ন।

'মিস্টার উলফার তো বললেন এটাকে পশু-পাখিদের অভয়াশ্রম হিসেবে গড়ে তুলবেন,' বলল ডানা।

'কিন্তু সেই জানোয়ারগুলো যদি দানব হয়?' হিসিয়ে উঠল রবিন।

'দানব?' একসঙ্গে প্রশ্ন করল তিন জন।

মাথা নাড়ল মুসা।

'ক্যাম্প লোন উলফে কোন দানব-টানব নেই।'

' "ক্রিয়েচার্স অভ দ্য ডীপ" কিন্তু অন্যরকম বলছে,' জানাল রবিন।

'কী আছে ওই বইতে?' ডানার জিজ্ঞাসা।

কাছের এক পাথরের উপর বসল রবিন। বন্ধুরা বসল মাটিতে।

'তোমরা তো সবাই লক নেস মনস্টার, মানে নেসির কথা জানো,' বলল রবিন। 'লেকটা স্কটল্যান্ডে, মিস লকি হার্পার যেখান থেকে এসেছেন।'

'জানি,' বলে শিউরে উঠল ডানা।

'কিন্তু,' বলল কিশোর, 'নেসির কোনও অস্তিত্ব বিজ্ঞানীরা পাননি। এমনকী তার কঙ্কালও পাওয়া যায়নি। লক নেসে প্রচুর কাঠের গুঁড়ি ভেসে আসে, যেগুলোকে দেখে মনে হয় কোন দানব পানিতে মাথা তুলেছে বুঝি। বিজ্ঞানীরা শেষমেশ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, ওগুলোকেই দানব মনে করে মানুষ,' একটানা বলে কথা শেষ করল কিশোর।

'আমার ধারণা,' বলল রবিন, 'মানুষের উৎপাতে লক নেস ছেড়ে পালিয়েছে দানবটা।'

'দেখতে কেমন ওটা?' ডানা জিজ্ঞেস করল।

গভীর শ্বাস টানল রবিন।

'কালো, লিকলিকে। লম্বা গলার ওপর ছোট মাথা।'

হেসে ফেলল কিশোর।

'ঠিক নতুন সুইমিং ইন্সট্রাক্টরের মত।'

'ঠিক তাই!' হিসিয়ে উঠল রবিন। 'আমার ধারণা, লক নেসের দানব স্কটল্যান্ড থেকে পালিয়ে লেক ইরিনে এসে হাজির হয়েছে। এবং তার নাম লকি হার্পার।'

পাঁচ

'যত্তসব ফালতু!' মাথা নেড়ে বলল কিশোর। 'লকি হার্পার নার্ভাস ধরনের মহিলা, কিন্তু তিনি মোটেও দানবী নন।'

'তাঁর নাম লকি, ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগছে না তোমার কাছে?' রবিন প্রশ্ন করল।

'ঠিক লক নেসের মত!' ফ্যাকাসে মুখে বলল ডানা।

'তাঁর উধাও হয়ে যাওয়াটা কিন্তু খুবই রহস্যময়। পানি থেকে আর উঠতে দেখা যায়নি তাঁকে,' ধীরে ধীরে বলল মুসা।

'নিশ্চয়ই উঠেছেন। আমরা যখন মিস্টার উলফারের সাথে কথা বলছিলাম তখনই এক ফাঁকে উঠে পড়েছেন। এখন নিশ্চয়ই বসে বসে সাপার করছেন। চলো, আমরাও যাই,' বলল কিশোর।

'আমি ওঁকে উঠতে দেখিনি,' ফিসফিস করে বলল ডানা

'দেখনি, কারণ লেকের মাঝ বরাবর শব্দটা উনিই করেছিলেন,' বলল কিশোর।

'আমার ভয় করছে,' বলল ডানা।

ওর বাহু চেপে ধরল কিশোর।

'চলে এসো, ডানা। নইলে রবিন আমাদেরকে পানির দানো আর জলকন্যাদের সাথে নাচতে বাধ্য করবে,' বলল ও।

কিশোর আর ডানা লেকের পাশ দিয়ে পা বাড়ালে অনুসরণ করল মুসা আর রবিন। আচমকা ওদের ঠিক পাশেই ঝপাৎ করে শব্দ উঠল হ্রদের পানিতে। আর্তনাদ ছেড়ে দৌড়ে দিল ডানা। এক দৌড়ে গিয়ে ঢুকল ডাইনিং রুমে।

'দৌড় দিলে কেন?' ডাইনিং হলে ঢুকে প্রশ্ন করল কিশোর।

ডানার মুখ টকটকে লাল, হাঁপাচ্ছে।

'দানোটাকে শব্দ করতে শুনে।'

চোখ ঘুরাল কিশোর।

'তোমাকে তো বলেইছি, এখানে কোনও দানো-টানো নেই। রবিন স্রেফ গল্প বানাচ্ছে। ওর উচিত তোমাকে ভয় না দেখিয়ে হরর বই লিখে ফেলা।'

শিউরে উঠল ডানা।

'হয়তো তোমার কথাই ঠিক, কিন্তু আমি পানিতে নামতে সাহস পাচ্ছি না। আমি বাড়ি ফিরে যেতে চাই!'

'মিস্টার উলফার তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে যাবেন না,' মুসা বলল।

কোমরে দু'হাত রাখল ডানা।

'তা হলে মাকে ফোন করব। এসে আমাকে নিয়ে যেতে বলব।' গটগট করে টেলিফোন করতে গেল ও।

'আমি চাই না নেসির কথা গ্রীনহিলসে জানাজানি হোক,' বলল রবিন। 'ডানার মার কাছ থেকে কথাটা ছড়িয়ে যাবে।'

কিশোরকে বিভ্রান্ত দেখাল।

'এখানে সত্যিই যদি কোন দানো থেকে থাকে, তা হলে মানুষকে সাবধান করা উচিত নয়?'

রবিন কিশোর আর মুসার দিকে চাউনি বুলিয়ে গম্ভীর ভঙ্গিতে কথা বলল।

'মিস্টার উলফার ঠিকই বলেছেন। ক্যাম্প লোন উলফ সব ধরনের প্রাণীর শান্তিতে বাস করার জন্যে নিরাপদ জায়গা।'

'খাইছে, এমনকী সেই প্রাণীটা যদি নেসি হয় তাও?' মুসার প্রশ্ন।

মাথা ঝাঁকাল নথি।

'ওটা যতক্ষণ না কারও ক্ষতি করছে, ততক্ষণ আমাদেরও দেখা উচিত ওটা যেন নিরাপদ থাকে।'

এসময় ডানা হেঁটে এল এদিকে।

'মাকে ফোন করেছ?' মুসা জানতে চাইল।

ডানাকে দেখে মনে হলো কেঁদে ফেলবে বুঝি।

'মা আমার একটা কথাও বিশ্বাস করেনি।'

মুসা ওর পিঠ চাপড়ে সান্ত্বনা দিল।

'আমি বলছি, এখানে ভয়ের কিছু নেই।'

ডানা জবাব দেওয়ার সুযোগ পেল না, কেননা তার আগেই মি. উলফার হাঁক ছাড়লেন, যার যার সাপার ট্রে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

'কই হে, খাবার তো ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে!'

হাসি ফুটল মুসার মুখে।

'এত খিদে পেয়েছে, মনে হচ্ছে আস্ত হাতি সাবড়ে দিতে পারব।'

'শুধু হাতি? তিমি পারবে না?' গর্জে উঠে ট্রে ধরিয়ে দিলেন মি. উলফার।

ট্রে দেখে গুঙিয়ে উঠল ডানা।

'এহহে, মাছ!'

মি. উলফার ওর দিকে চাইলেন।

'মাছ স্বাস্থ্যের জন্যে ভাল। খেয়ে দেখো ভাল লাগবে। আমরা তো সারা সপ্তাহ ধরে খাচ্ছি।'

'আমার খিদে নেই,' বলে বন্ধুদের সঙ্গে টেবিলে বসে পড়ল ডানা।

ডানা, কিশোর আর রবিন খাবার একটু-আধটু মুখে তুললেও গোগ্রাসে গিলছে মুসা। মিনিট খানেক পরে আরও আনতে গেল।

খাওয়া সেরে, ছেলে-মেয়েরা ক্যাম্পফায়ার ঘিরে বসল। মিস হার্পার ওদেরকে নানা ধরনের মাছের ছবি দেখিয়ে বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করলেন।

'আমি আগে এরকম মাছ দেখিনি,' বলে কাঁটাওয়ালা এক মাছের ছবি দেখাল ডানা।

মৃদু হাসলেন মিস হার্পার।

'খুব কম মানুষই চমৎকার এই মাছটা দেখেছে। গভীর পানিতেও প্রায় বিরল এই মাছ।'

পরে ছেলে-মেয়েরা যখন কেবিনের উদ্দেশে হাঁটা ধরল, দূর থেকে ব্যাগপাইপের শব্দ শুনতে পেল।

'বাজনাটা শুনলে আমার বুক কেঁপে ওঠে,' বলল ডানা।

'খাইছে, আমার মনে হয় ওই বাজনার সাথে মিস হার্পারের দানবীতে পরিণত হওয়ার কোনও সম্পর্ক আছে,' মৃদু কণ্ঠে বলল মুসা। কেউ কোন কথা বলল না, শুধু ডানার হাঁটার গতি বেড়ে গেল।

আঁধার ঘনাচ্ছে। আকাশে তারা ফুটছে। ম্লান আলোয় ওরা দেখতে পেল, মি. উলফার ডাইনিং হল থেকে পেল্লায় এক প্যান হাতে বেরিয়ে আসছেন।

'ওই প্যানে সাপার ছিল,' বলল কিশোর।

'খাইছে, উনি কী করবেন ওটা দিয়ে?' মুসার প্রশ্ন।

'লেক ইরিনে নিয়ে যাচ্ছেন। চলো, ফলো করি,' বলল রবিন।

নিঃশব্দে মি. উলফারের পিছু নিল চারজন। ভদ্রলোককে লেকের পানিতে এঁটো-কাঁটা ফেলতে দেখল ওরা।

'লেকটাকে নোংরা করছেন উনি!' বলে উঠল ডানা।

'শশশ, শুনে ফেলবেন!' সাবধান করল মুসা।

'আমার মনে হয় না নোংরা করছেন,' বলল রবিন।

মাথা নাড়ল ডানা।

'দেখে কিন্তু তা-ই মনে হচ্ছে।'

'উনি আসলে দানোটাকে খাওয়াচ্ছেন,' বলল নথি।
ওদের চোখের সামনে অগুনতি বুদ্বুদ্ উঠল পানিতে।
'হায় খোদা! দানোটা এসে পড়েছে!' আর্তনাদ ছাড়ল ডানা।

ছয়

পরদিন সকালে ব্যাগপাইপের সুর শুনে ঘুম ভাঙল ছেলে-মেয়েদের।

ডাইনিং হলে দেখা হলো ওদের।

ডানাকে হাই তুলতে দেখে রবিন বলল, 'তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে সারা সপ্তা ঘুমাওনি।'

'অনেকটা সেরকমই। মিস হার্পারের ব্যাগপাইপ আমাকে সারা রাত ঘুমাতে দেয়নি।'

'বাজনাটা আমিও শুনেছি, কিন্তু উনি তো রাতভর বাজাননি,' বলল নথি।

'হয়তো খানিকটা ঘুমিয়ে নিয়েছেন,' বাতলে দিল মুসা।

'কিংবা হয়তো পানিতে নেমেছিলেন,' বলল রবিন।

'তোমরা কী বলাবলি করছ বলো তো?' জবাব চাইল কিশোর।

'শশশ,' বলে চারধারে নজর বুলাল রবিন। 'নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ আমরা আশপাশে থাকলে মিস হার্পার ব্যাগপাইপটা বাজান না?'

শ্রাগ করল ডানা।

'লাজুক মানুষরা অন্যের সামনে বাজাতে চায় না,' বলল।

'হয়তো তোমার কথাই ঠিক। তবে আমার ধারণা লক নেসের জন্যে মন কেমন করে বলে বাজনা বাজান মিস হার্পার। হোমসিক হয়ে পড়লে দানো হয়ে যান তিনি, পানিতে ডুব দিয়ে শান্তি পান!' বলল রবিন।

জোরে হেসে উঠল কিশোর।

'লকি হার্পার মোটেও নেসি নন। তিনি স্রেফ ভাল ব্যাগপাইপ বাজান।'

'কিন্তু আমরা তো গতরাতে দানোটাকে দেখেছি!' বলে শিউরে উঠল ডানা।

কিশোর মাথা নেড়ে প্যানকেকের প্লেট তুলে নিল।

'আমরা কোনও দানোকে দেখিনি। শুধু বুদ্বুদ্ দেখেছি। ছোট মাছের জটলার কারণেও ওরকম হতে পারে।'

'তা হতে পারে,' বলে সায় জানাল মুসা।

'কাজেই নেসির কথা মন থেকে মুছে ফেলো। বরং লেকে গুপ্তধন পাওয়া যায় কিনা সেটা ভেবে দেখো,' বলল কিশোর।

প্যানকেক খাওয়া হয়ে গেলে ছেলে-মেয়েরা তড়িঘড়ি লেকে চলে এল। কিন্তু পানিতে নামার আগেই থমকে দাঁড়াল রবিন।

'দেখো!' চেঁচিয়ে উঠল ও।

চারধারে চোখ বুলাল কিশোর।

'কই, কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না।'

'গুপ্তধন পেয়েছ নাকি?' জিজ্ঞেস করল ডানা।

রবিন মাথা নেড়ে মাটিতে আঙুল তাক করল।

'না, নেসির পায়ের ছাপ পেয়েছি।'

ডানার চোখজোড়া বিস্ফারিত হয়ে গেল। কিশোর আর মুসা বালির বুকে বিশাল পদচিহ্ন দেখে চুপসে গেল। সাইকেলের টায়ারের মত চওড়া আর ফ্যানের মত আকার পায়ের ছাপগুলোর।

'সাগরদানো এখানে এসেছিল,' বলে পিছু হটে গেল ডানা।

কিশোর ঝুঁকে পড়ে পরখ করল।

'অসম্ভব। এর পিছনে নিশ্চয়ই কোনও ব্যাখ্যা আছে।'

গভীর এক ছাপের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিল নথি।

'একটাই ব্যাখ্যা আছে। এবং তার নাম লকি হার্পার।'

'লক নেসের দানো এখানেই আছে!' চেঁচিয়ে উঠল ডানা। 'এখন কী হবে?'

সাত

'ক্যাম্প লোন উলফে নেসি কী করছে?' প্রশ্ন করল মুসা।

'হয়তো এ জায়গাটাকে নিরাপদ মনে হয়েছে তার,' বলল রবিন।

বেণী ধরে টানল ডানা।

'কিন্তু সাগরদানোরা তো মহাসাগরে থাকে!'

'হ্যাঁ, তারা ছোটদের ক্যাম্পে থাকে না এবং লেকের পাড়ে হেঁটে বেড়ায় না,' সায় জানিয়ে বলল কিশোর।

'কিন্তু নেসির কথা আলাদা,' বলল রবিন। 'আর মনে রেখো, রেড রিভারের মাধ্যমে লেক ইরিনের সাথে মহাসাগরের যোগাযোগ আছে। বাজি

ধরে বলতে পারি বিজ্ঞানীদের ভয়ে স্কটল্যান্ড থেকে পালিয়ে এখানে চলে এসেছে নেসি। নিরাপদ আস্তানা গেড়েছে ক্যাম্প লোন উলফে।'

'আমি বাড়ি যাব,' ফুঁপিয়ে উঠল ডানা।

রবিন লেকের দিকে চেয়ে মৃদু স্বরে কথা বলল।

'লোকে যখন জানবে লেক ইরিনে নেসি আছে তখন দলে দলে এসে হাজির হবে।'

ওর কথা শুনে হেসে ফেলল কিশোর।

'তোমাকে কতবার বলব এখানে নেসি নেই। ব্যাগপাইপ বাজান বলেই মিস লকি হার্পার লক নেসের দানব হতে পারেন না,' বলল কিশোর। 'এবং নেসি কখনোই স্কুবা ডাইভ করে না।'

'তোমার কথাই যেন ঠিক হয়,' সভয়ে ঢোক গিলে বলল ডানা। 'ওই যে উনি আসছেন!'

ট্রেইলের দিকে মুখ তুলে চাইল ওরা চারজন। মিস লকি হার্পারের পরনে কালো স্কুবা সুট, গা থেকে পানি ঝরছে। মি. উলফার অন্যান্য ক্যাম্পারদের সঙ্গে তাঁর পাশে পাশে হাঁটছেন। দলটির পিছনে যোগ দিল তিন গোয়েন্দা আর ডানা। কাঠের ডকের উদ্দেশে চলেছে সবাই।

কিশোর এগিয়ে গেল সামনে।

'আমরা কখন পানিতে নামব?' মিস হার্পারকে জিজ্ঞেস করল ও।

কানের পিছনে ভেজা চুলের গোছা সরাতে গিয়ে কেঁপে উঠলেন নতুন সুইমিং ইন্সট্রাক্টর।

'প্রপার গিয়ার ছাড়া পানিতে নামলে ঠাণ্ডায় জমে যাবেন। মিস্টার উলফার আপনাদের জন্যে ওয়েট সুট কিনেছেন।'

ছেলে-মেয়েরা কাছের বোটহাউসে দৌড়ে গিয়ে কালো আউটফিট পরে নিল। ডকে ফিরে এলে ওদেরকে একঝাঁক লিকলিকে পেঙ্গুইনের মত দেখাল।

মুসাকে মাস্ক আর স্নরকেল পরতে দেখে ওর বাহু চেপে ধরল ডানা।

'আমার ভয় করছে,' মিনমিন করে বলল।

'ভয়ের কী আছে,' বলল মুসা। 'লেকের তলায় হয়তো ধন-রত্ন রয়েছে। সেটা খুঁজে বের করতে হলে এ ছাড়া উপায় কী?'

অন্যদের সঙ্গে থপ-থপ করে পানিতে নেমে পড়ল মুসা। চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। আর হোঁতকা ম্যাকনামারা ঝপাৎ করে পানিতে আছড়ে পড়ল।

মিস লকি হার্পার কানে হাত চাপা দিলেন। মুখের চেহারা ফ্যাকাসে।

'শশশ, শব্দ করবেন না প্লিজ,' হিসিয়ে উঠলেন।

ছেলে-মেয়েরা চুপ করে গেলে নার্ভাস ভঙ্গিতে শ্বাস নিলেন মিস হার্পার।

'পানির নীচে সব শব্দই অনেক জোরাল শোনায়,' ব্যাখ্যা করলেন।

'শুনলে?' রবিনকে প্রশ্ন করল ডানা।

'হ্যাঁ, একটুও অবাক হইনি। নেসি তো জোরাল শব্দকে ভয় পাবেই।'

'মিস্টার উলফারকে আমাদের এখুনি জানানো উচিত। নইলে সাগরদানোর পেটে যেতে হবে,' বলল ডানা।

মাথা নাড়ল রবিন।

'তার আর সময় নেই।'

আট

রবিন আর ডানা বাদে সবাই মিস হার্পারকে ঘিরে দাঁড়ানো। মাস্ক আর স্নরকেল ব্যবহার করে শ্বাস নেওয়ার কায়দা শেখাচ্ছেন তিনি। একটু পরেই, ছেলে-মেয়েরা পাড়ের কাছাকাছি সাঁতরাতে শুরু করল।

গুপ্তধন খুঁজতে খুঁজতে কিশোর কখন লেকের মাঝখানে চলে গেছে টেরও পায়নি। এক সময় ক্লান্ত হয়ে পড়ল ও। ভেসে থাকার জন্য দু'হাত চাপড়াচ্ছে।

'হায়, হায়, কিশোর ডুবে যাচ্ছে!' চেঁচিয়ে উঠল ডানা।

সঙ্গে সঙ্গে পানিতে লম্বা গলাটা ডুবিয়ে দিলেন মিস হার্পার। পরক্ষণে লেক ইরিনের ঘোলা পানিতে হারিয়ে গেলেন তিনি।

একটু পরে, ভুশ করে মাথা তুললেন কিশোরের পাশে।

'আমি কাউকে এত দ্রুত সাঁতরাতে দেখিনি,' বলল রবিন। 'আর ওঁর ডাইভের ভঙ্গিটা দেখেছ?'

'তোমার দানোর কথা এখন বাদ দাও তো,' খেঁকিয়ে উঠল ডানা। 'কিশোরকে উদ্ধার করেছেন বলে ওঁর প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।'

কিশোরকে নিয়ে তীরের দিকে আসছেন মিস হার্পার। ছেলে-মেয়েরা কিশোরকে টেনে পাড়ে তুলল। ওর ঠিক পিছনেই রয়েছেন মিস হার্পার।

মাস্ক আর স্নরকেল খুলে ফেলল কিশোর।

'তুমি ঠিক আছ তো, কিশোর?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানতে চাইল মুসা।

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল গোয়েন্দাপ্রধান।

মিস হার্পার তাঁর মুখোশটা মাথায় তুলে কিশোরের কাঁধ চাপড়ে দিলেন।

'এরপর থেকে তীরের কাছাকাছি থাকবেন।'

ঘাড় কাত করে সম্মতি দিল কিশোর। মিস হার্পার আবারও ঝাঁপ দিলেন পানিতে। উনি ডকের ওপাশে চলে গেলে রবিনের দিকে চাইল কিশোর।

'কীভাবে বলব বুঝতে পারছি না, কিন্তু মনে হয় তোমার কথাই ঠিক,' বলল ও।

'কোন্ কথা?'

'লক নেস মনস্টার।'

'খাইছে, আবার সেই কথা!' বলে উঠল মুসা।

'আমি দেখেছি বলেই বলছি।'

'কী দেখেছ?' ডানা জবাব চাইল।

'পানির নীচে বিশাল, কালো, ডাইনোসরের মত একটা প্রাণী।'

'কী বলছ এসব!' আঁতকে উঠল ডানা।

'ঠিকই বলছি। আমার মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে,' জানাল কিশোর।

'কী প্ল্যান?' সমস্বরে প্রশ্ন করল তিনজন।

'আমরা নেসিকে ধরব,' রহস্যময় হেসে বলল কিশোর।

নয়

পরদিন সকালে দেখা গেল আকাশে কালো মেঘের ঘনঘটা। মি. উলফার তাই ঠাণ্ডা পানিতে সাঁতার কাটার বদলে হাইকিঙের সিদ্ধান্ত নিলেন। ছেলে-মেয়েরা সবাই যখন বনভূমির উদ্দেশে চলেছে, তিন গোয়েন্দা আর ডানা সন্তর্পণে বোট ডকের উদ্দেশে পা বাড়াল। কিশোর এক বোটে উঠে গায়ে লাইফ জ্যাকেট চাপাল।

'চলো, আজ সাগরদানো ধরব,' বলল।

'মিস হার্পার সম্পর্কে তুমি এমন কথা বলো কী করে? উনি না তোমার জীবন বাঁচিয়েছেন?' বলল ডানা।

'প্রথম কথা আমি মোটেই ডুবে যাচ্ছিলাম না। এবং যেহেতু তোমাদের সবার ধারণা উনি নেসি, তারমানে বিপজ্জনক। কাজেই আমাদের উচিত নেসিকে আটক করা।'

'উনি যদি সাগরদানোও হন, তবু আমি চাই সবার মত উনিও শান্তিতে থাকুন,' বলল ডানা।

মাথা ঝাঁকাল রবিন আর মুসা।

কিন্তু কিশোর চেঁচিয়ে উঠল।

'তোমরা কি চাও ওটা মানুষকে আক্রমণ করুক আর আমরা বসে বসে দেখি?'

মুসা, রবিন আর ডানা মুহূর্তের জন্য চুপ করে গেল।

শেষমেশ শ্রাগ করে মৃদু গলায় বলল নথি, 'ঠিক আছে, একটু খুঁজে দেখতে ক্ষতি কী?'

'এই তো, তিন গোয়েন্দার মত কথা,' উৎসাহ জোগাল কিশোর।

লাইফ জ্যাকেট পরে ওরা চারজন উঠে বসল রোবোটে। গতকাল যেখানে বিশাল শব্দটা উঠেছিল, অর্থাৎ লেকের মাঝখানের উদ্দেশে বৈঠা বাইতে লাগল।

'আমার মনে হয় এটাই সেই জায়গা,' মাঝখানে চলে এসে বলল মুসা। নিঃশব্দে নৌকায় বসে পানির দিকে চেয়ে রইল ওরা।

'কিছু দেখতে পাচ্ছ?' একটু পরে নার্ভাস গলায় প্রশ্ন করল ডানা।

'নাহ, হয়তো টোপ দিতে হবে,' জানাল কিশোর।

'কী ধরনের টোপ দিতে চাও?' মুসার জিজ্ঞাসা।

'মাছ!' ফস করে বলে বসল ডানা।

'ঠিক,' বলে রবিন জিন্সের পকেট থেকে দোমড়ানো একটা পুঁটুলি বের করল, মাছ আকৃতির কিছু বিস্কুট ছড়িয়ে দিল নৌকায়।

'এগুলো মাছ নয়,' বলে উঠল কিশোর।

শ্রাগ করল রবিন।

'আমার কাছে এ-ই আছে। দানোটা হয়তো এগুলোকেই সত্যি মনে করবে।' কয়েকটা বিস্কুট পানিতে ফেলল ও।

'একটা দানো এরমধ্যেই টোপ গিলেছে,' বলে খিলখিল করে হেসে উঠল ডানা। আঙুল দেখাল।

কয়েকটা বিস্কুট মুখে চালান করেছে মুসা।

'খামোকা সময় নষ্ট,' বিস্কুট চিবাতে চিবাতে বলল মুসা। 'আর তার উপর মিস্টার উলফার হাইকে যাইনি বলে আমাদের এক হাত দেখে নেবেন।'

রবিন মাথা ঝাঁকিয়ে বৈঠা তুলে নিল।

'ঠিক বলেছ। আমাদের এখুনি ফিরে যাওয়া উচিত। বাতাস কেমন জোরে বইছে দেখছ না? শীঘ্রি বৃষ্টি নামবে।'

'দাঁড়াও!' গর্জে উঠল কিশোর। পানিতে কালো এক ছায়া ভেসে উঠেছে। সোজা ওদের নৌকার উদ্দেশে এগোচ্ছে।

'নৌকার তলায় ঢুকছে!' চেঁচিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল ডানা।

'বসে পড়ো!' চিৎকার ছাড়ল মুসা, কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে, নৌকা গেল উল্টে আর ওরা চারজন ছিটকে পড়ল উত্তাল পানিতে।

দশ

পানির উপরে ডানার মাথা যখন উঠল, উল্টানো নৌকাটা দেখতে পেল ও। তিন গোয়েন্দা ইতোমধ্যে নৌকা আঁকড়ে ধরেছে, কিন্তু ডানা তখনও অনেকটা দূরে। ক্রমেই বন্ধুদের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে ও।

'সাঁতরে চলে এসো!' চেঁচাল মুসা।

'আমি সাঁতার জানি না।'

'চেষ্টা করো,' হাঁক ছেড়ে বলল রবিন।

চেষ্টা করল ডানা। কিন্তু হাত-পা ছুঁড়েও সুবিধা করতে পারল না।

'আমাকে হেলপ করো। আমি আসতে পারছি না।'

'তুমি ডুববে না! লাইফ জ্যাকেট আছে। হাত-পা ছুঁড়ে আসার চেষ্টা করো!' অভয় দিল মুসা।

'আমি যাই,' বলল কিশোর। কিন্তু ও ওদিকে এগোনোর আগেই পানি কেটে তরতর করে বন্ধুদের দিকে আসতে দেখা গেল ডানাকে। একটু পরেই, মুসা ওর লাইফ জ্যাকেট চেপে ধরে নৌকার কাছে নিয়ে আসতে পারল। ডানা এতটাই জোরে নৌকা আঁকড়ে ধরল, ওর আঙুলগুলো সাদা হয়ে গেল।

'খাইছে, তুমি না বললে সাঁতার জানো না!' মুসা বলে উঠল।

চোখ বিস্ফারিত ডানার।

'জানি না-ই তো।'

'তা হলে এখান পর্যন্ত এলে কীভাবে?' কিশোর জবাব চাইল।

'কে যেন ঠেলে নিয়ে এসেছে। বড় ধরনের কিছু।'

মুসা চাপড় মেরে পানি ছিটাল ডানার গায়ে।

'ধ্যাত, তুমি আসলে স্রোতের টানে ভেসে এসেছ,' বলল।

মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

'এটা নেসির কাজ। লক নেসের দানো।'

'আমি পাড়ে যেতে চাই!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল ডানা।

'পাড়ে আমরা সবাই যেতে চাই,' বলল রবিন। 'ঝড়ের মধ্যে লেকে

থাকা খুবই বিপজ্জনক।'

'নেসি থাকলে আরও,' যোগ করল ডানা।

'আমরা চিৎকার করলে হয়তো কেউ না কেউ শুনতে পাবে,' বলল মুসা।

মাথা ঝাঁকাল রবিন।

'দেখো! দেখো!' হঠাৎই বলে উঠল কিশোর। 'ডকে কে যেন।'

'মিস হার্পারের মত লাগছে!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা।

'আমি আর ধরে থাকতে পারছি না,' বলল ডানো। 'উনি হয়তো আমাদেরকে সাহায্য করবেন!'

তীরের দিকে আবারও চাইল ওরা। এখন কেউ নেই ওখানে।

'হায়, হায়, সবাই বোধহয় লাঞ্চে গেছে?' হাহাকার করে উঠল ডানা।

'খাইছে, দানোটা না আবার আমাদের দিয়ে লাঞ্চ সারে!' সভয়ে চিৎকার ছাড়ল মুসা।

হঠাৎই, নৌকাটা চলতে শুরু করল। মনে হলো পানির তলা দিয়ে কেউ ওটাকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে।

'সাগরদানো!' চেঁচিয়ে উঠল রবিন।

'শক্ত করে ধরে থাকো!' বন্ধুদের উদ্দেশে বলল কিশোর।

এগারো

ছেলে-মেয়েরা শক্ত করে আঁকড়ে রয়েছে, নৌকাটা তীরের দিকে এগোতে লাগল। কিন্তু ওরা পায়ের নীচে যেই বালি পেল অমনি থেমে গেল নৌকা।

চার বন্ধু পাড়ে নামতেই একদল নারী-পুরুষ টিভি ক্যামেরা হাতে ঝোপ-ঝাড় ভেদ করে এগিয়ে এল। বৃষ্টি পড়ছে, কাজেই সবার মাথার উপরে ছাতা ধরা।

'খাইছে, ডানার মা বোধহয় সবাইকে সাগারদানোর কথা বলে দিয়েছেন!' বলে উঠল মুসা।

মি. উলফার জনতার ভিড় ঠেলে ওদের দিকে এগিয়ে এলেন।

'এরকম ওয়েদারে কেউ পানিতে নামে?' গর্জে উঠলেন ভদ্রলাক। 'তোমরা হাইকিঙে যাওনি কেন?'

ভারী বৃষ্টিতে দাড়ি-গোঁফ থেকে টপাটপ পানি পড়ছে ওঁর।

'দোষ আমাদের নয়, নেসির!' ব্যাখ্যা করল কিশোর।

'ও, এখানে তা হলে সত্যিই সাগরদানো আছে?' বলে এক টিভি রিপোর্টার মি. উলফারকে এক পাশে সরিয়ে দিয়ে এগিয়ে এল। কিশোরের মুখের সামনে মাইক্রোফোন ধরল সে। এক মহিলা ক্যামেরা তাক করল। কিশোর ক্যামেরার দিকে এক ঝলক চেয়ে রবিনের দিকে তাকাল।

'ওরা নেসিকে খুঁজে পেলে বেচারীর শান্তি নষ্ট করে ছাড়বে,' ফিসফিস করে বলল গোয়েন্দাপ্রধান।

'ও আমাদের জীবন বাঁচিয়েছে,' যোগ করল ডানা। 'সবারই শান্তিতে থাকার অধিকার আছে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল রবিন আর মুসা।

মি. উলফার কিশোরের পাশে এসে দাঁড়িয়ে কটমট করে রিপোর্টারদের দিকে চাইলেন।

'আপনারা ক্যাম্পে ঢুকে ক্যাম্পারদেরকে বিরক্ত করছেন কেন? আমি তো বলেছি এখানে কোনও দানো-টানো নেই,' কড়া গলায় বললেন।

'কথাটা কি সত্যি?' রিপোর্টার প্রশ্ন করল কিশোরকে। 'এই লেকে কোনও দানো আছে কিনা জান কিছু?'

বন্ধুদের দিকে চাইল কিশোর। মি. উলফারের দিকেও তাকাল। এ সময় মিস হার্পার মি. উলফারের পাশে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর কাঁধে হাত রাখলেন। মহিলার পরনে ওয়েটসুট। পানি ঝরছে তাঁর চুল আর সুট থেকে। কিশোরের উদ্দেশে মৃদু হাসলেন।

পাল্টা হাসল কিশোর। এবার গভীর শ্বাস টেনে কথা বলল মাইক্রোফোনে।

'আপনারা ভুল খবর শুনে এখানে এসেছেন। এসব ফালতু কথা আমরা, মানে ছোটরা রটিয়েছি।'

ডানা কিশোরের পাশে এসে দাঁড়াল। যেসব ক্যান আর কাগজের কাপ টিভির লোকেরা মাটিতে ফেলেছে, আঙুল তাক করে সেগুলো দেখাল।

'যারা যেখানে সেখানে ট্র্যাশ ফেলে তারাই আসল দানো!' বলে উঠল ও।

মুখের চেহারা লাল হয়ে গেল রিপোর্টারের। মাইক্রোফোন ঝটপট সরিয়ে নিল।

'ক্যামেরা বন্ধ করো। চলো এখান থেকে।'

ওদেরকে রওনা দিতে দেখে মুসা খিলখিল করে হেসে ফেলল।

'উচিত কথা বলেছ! আমি আগেই জানতাম এই লেকে কোনও দানো নেই।'

'অবশ্যই নেই,' মৃদু কণ্ঠে বললেন মিস হার্পার। 'কিন্তু একজন অনেক বড় হিরো আছে।'

ঝুঁকে পড়ে চুমু খেলেন কিশোরের গালে।

শ্রাগ করল অপ্রস্তুত কিশোর।

'যাই, শুকনো কাপড় পরিগে,' বলল। মুসা, রবিন আর ডানা ওকে অনুসরণ করল।

'নেসি চুমু দিলে কী হয় বলতে পারো?' প্রশ্ন করল ও।

হেসে ফেলল মুসা।

'সেজন্যে পাঁচ-সাত বছর অপেক্ষা করতে হবে।'

'কেন?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'তখন দেখা যাবে কিশোর কোন গার্লফ্রেন্ড পায় কিনা!'

হেসে উঠল রবিন আর ডানা। কিশোর হাসল না। মুসাকে ধাওয়া করে গেল কেবিন পর্যন্ত।

***

এ-মাসের তিন গোয়েন্দা

কিশোর– তৌহিদুল ইসলাম
বাড়ি: মতিউল্লাহ্ পাটওয়ারী বাড়ি, গ্রাম: পশ্চিম শোশালিয়া
পোস্ট: শাহাপুর, চাটখিল, নোয়াখালী।

মুসা– প্রীতম রাহা
শান্তিকুঞ্জ
১৭, দাসপাড়া, বত, বয়রা, খুলনা।

রবিন– মোঃ আবদুল আজিজ (তানভীর)
প্রযত্নে: নুরুল ইসলাম সাহেবের বাড়ি, কফিলুদ্দিন পাড়া, দিলালপুর
পাবনা সদর, পাবনা।

জিনা– মর্জিনা আক্তার
প্রযত্নে: আবদুল মমিন (B.D.R) পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন
সদর হাসপাতাল রোড, টেকনিক্যাল, ফেনী।

কিশোর থ্রিলার
ভলিউম-১০৩

তিন গোয়েন্দা

শামসুদ্দীন নওয়াব

মাদক-রহস্য: শামসুদ্দীন নওয়াব

ভ্যাঙ্কুভারে কিশোরের মামার বাড়িতে বেড়াতে গেছে তিন গোয়েন্দা। জানতে পারল অবৈধ ড্রাগ ব্যবসা চলছে শহরটিতে। পানিতে ভেসে উঠেছে একজন পুলিস এজেন্টের লাশ। ক্রমেই জটিল হয়ে উঠল রহস্য।

গুপ্তধনের নকশা: শামসুদ্দীন নওয়াব

কিশোরের বন্ধু র‍্যালফ রজারসের বাবা মৃত্যুর আগে বিশ্বস্ত ভৃত্য চার্লি পেকারকে একটি নকশা দিয়ে গিয়েছিলেন। গুপ্তধনের নিশানা আছে ওই নকশায়। কিন্তু ওটা যে দস্যু সর্দার রিডলারেরও চাই। চার্লি নকশাটা র‍্যালফের হাতে তুলে দেওয়ার পরেই নৃশংসভাবে খুন হলো। নকশা নিয়ে পালাল কিশোর আর র‍্যালফ। তারপর?

ভয়ের মুখোশ: শামসুদ্দীন নওয়াব

ক্যাম্পিং করতে এসেছে তিন গোয়েন্দা। এখানে পরিচয় হলো নতুন সুইমিং ইন্সট্রাক্টর মিস লকি হার্পারের সঙ্গে। লম্বা, লিকলিকে চেহারার মহিলা স্কটল্যান্ড থেকে এসেছেন। এক পর্যায়ে রবিনের ধারণা হলো, তিনি লক নেসের দানব নেসি। তাঁর কাছ থেকে সাবধান থাকা উচিত। ইতোমধ্যে ঘটতে শুরু করল অদ্ভুত সব ঘটনা।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০